নিম্নদামোদরের

লোক-গল্প

ডঃ রফিকুল ইসলাম
সংগৃহীত ও সম্পাদিত

পরিবেশক
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

প্রকাশক ঃ
ডঃ রফিকুল ইসলাম,
মধুবন, ডাকঘর—তেয়াণ্ডুল, জেলা—বর্ধমান।

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমতী মহামায়া রায়
সনেট প্রিণ্টিং হাউস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

যাঁদের কাছে পেয়েছি অনেক
কিন্তু দিতে পারিনি প্রায় কিছুই
তাঁদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

হুগলী ও বর্ধমান জেলার নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চল বাংলা লৌকিক গল্পের খনি বললে অত্যুক্তি হয় না। বাংলা প্রচলিত গল্পের প্রথম সংকলন পাদ্রী উইলিয়ম কেরী সম্পাদিত ইতিহাসমালা (১৮১২) গ্রন্থটিতে এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত খুব চমৎকার কয়েকটি গল্প আছে। কেরী কোথাও তাঁর সংগৃহীত গল্পগুলির প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ করেন নি। পরে আমি নানা উপাদান থেকে বুঝতে পেরেছি যে, এই গল্পগুলি নিম্নদামোদর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। সে যাই হোক্, পাদ্রী লালবিহারী দে তাঁর সুবিখ্যাত 'ফোক্ টেলস্ অব্ বেঙ্গল' বইটিতে এই অঞ্চলের কয়েকটি লৌকিক গল্প সংকলন করে এবং তা ইংরেজীতে পরিবেশন করে বিশ্ববাসীর কাছে নিম্নদামোদর অঞ্চলকে স্মরণীয়তা দিয়ে গেছেন।

পাদ্রী দে'র পর একশ বছর কেটে গেছে। তারপরে তাঁর অনুবর্তন করতে নেমে এসেছেন এই অঞ্চলেরই অধিবাসী সুপণ্ডিত ডক্টর রফিকুল ইসলাম। এ অঞ্চল থেকে উনি অনেকগুলি চমৎকার গল্প উদ্ধার করেছেন। তার কয়েকটি এই পুস্তকে প্রকাশিত হল। গল্পগুলির মূল্য সম্বন্ধে আমি কিছু না বলে পাঠকদের রসবোধের উপর ছেড়ে দিলুম।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা ঃ ডঃ সুকুমার সেন		
লোক-কাহিনী ও তার বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা	...	১
বাংলার লোক-কাহিনী সংগ্রহের পথিকৃৎ	...	৬
লোক-কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথ	...	১০
নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের জীবনধারায় বিবর্তন	...	১৮
নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের লোক-গল্প সংগ্রহ সম্পর্কে বক্তব্য	...	২৬

লোক-গল্প

দৈব-কাহিনী

১. পাথর আর লাঠি	...	২৯
২. শালপুন রাজার স্বপ্ন	...	৩৩
৩. মায়ের পরিত্রাণ	...	৫০
৪. মনিষ্যি জন্ম	...	৫৫
৫. ধার্মিক রাজা	...	৬১
৬. পেয়ে হারানো হারিয়ে পাওয়া	...	৬২
৭. বিবি তো গোরুজা	...	৬৫

পশু-পক্ষী-কাহিনী

৮. চিংড়ি ও কাক	...	৬৯
৯. মোড়ল ও শেয়াল	...	৭২
১০. তাঁতি ও কাক	...	৭৬
১১. বাঘের বিয়ের ঘটকালি	...	৭৮
১২. চিংড়িরাণী ও কাক	...	৮১
১৩. খেঁকশেয়ালের মরণ	...	৮২
১৪. কাঁকড়া ও শেয়াল	...	৮৩
১৫: এক আশি একশো	...	৮৩
১৬. হাতী ও শেয়াল	...	৮৫
১৭. ছোটই বড়	...	৮৬
১৮. শেয়াল ও ছাগল	...	৮৮
১৯. শোকার্ত বক	..	৮৯
২০. বাঘ ও বক	..	৯২

ভূত-প্রেত-কাহিনী

২১. কুণি আর বুনি	..	৯৫
২২. শাঁকের ঘণ্ট	..	৯৭
২৩. মাণকে ভূতের দুর্দশা	..	৯৮
২৪. দুষ্টু জিন	..	১০১

রাক্ষস-খোক্কস-কাহিনী

২৫. বোষ্টমীর ছেলে ও রাক্ষসীর ছেলে	...	১০৫
২৬. রাক্ষস ও দুই বন্ধু	...	১০৮

হাস্যরসাত্মক-কাহিনী

২৭. কিছুমিছু	...	১০৯
২৮ তিনতা	...	১১৪
২৯. গানের দাম	...	১১৫
৩০. চোরের সঙ্গী	...	১১৭
৩১. দুই চোর	...	১১৭
৩২. চার গাঁজাখোর	...	১১৮
৩৩. এই আর সেই	...	১২০
৩৪. চালাক স্ত্রী ও বোকা স্বামী	...	১২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রেমমূলক-কাহিনী	
৩৫. রাজকুমার ও বাঁদর কনে	১২৯
৩৬. দুবরাজ পাখী	১৩৬
৩৭. মুড়ি মুড়কি এক দর	১৪০
বিবিধ-কাহিনী	
৩৮. জ্ঞানবান্ নাতি	১৪৩
৩৯. সোজা পথ বাঁকা পথ	১৪৭
৪০. চালাক তাঁতি	১৪৯
৪১. একথা বলি কারে	১৫১
৪২. ছোটরাণীর হিংসা	১৫৬
৪৩. জন্ম-বার্তা	১৫৭
৪৪. আজ বড়া ধূপ	১৬০
৪৫. বুদ্ধিমান মূর্খের জয়	১৬২
৪৬ মনের গুণে ধন	১৬৫
৪৭ ষোল আনা চুরি	১৬৯
৪৮. সাত পেয়াদা	১৭৩
৪৯. বন্ধুর ঠকামি	১৭৬
৫০. বোন বসমাতা	১৮৫
৫১. লোভের মার	১৯০
৫২. চার বর এক কন্যা	১৯৩

লোক-কাহিনী ও তার বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

লোক-কথা বা লোক-কাহিনী সমগ্র পৃথিবীর লোক-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ও বিস্তৃত স্থান দখল ক'রে আছে। সমাজ-সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর গণ্ডী ছাড়িয়ে লোক-কথার সীমানা সুদূরপ্রসারী। তাই লোক-কাহিনীগুলি উপস্থাপন করার আগে লোক-কাহিনীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি।

মৌখিক ও লিখিত—এই দুই প্রকার পদ্ধতিতেই লোক-সাহিত্য সর্ব দেশে, সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। তবে লিখিত সাহিত্যের অনেক আগে থেকেই মৌখিক ধারাটি সমাজ ও জাতির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অপ্রতিহতগতিতে চ'লে আসছে। জনশ্রুতি ধারায় আগত এই লোক-কাহিনী লোক-সাহিত্যের একটি অংশ। সুতরাং তাদেরও গতিধারাটি সমাজ ও দেশের অন্তরের আবেগ ও আবেদন নিয়ে কোন্ সুদূর অতীতকাল থেকে মানুষের জীবন-প্রবাহে প্রকৃতির ঝরণাধারার মতো ব'য়ে চ'লে আসছে। এর যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

লোক-কাহিনী সম্পর্কে অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—'গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনী প্রকাশ করা হয়, ইংরেজিতে তাহাকেই সাধারণভাবে Folk-tale বলা হয়।'[১]

এই সব লোক-কাহিনী দীর্ঘদিন ধ'রে শুধু যে মানুষের মনের খোরাক দান করে এসেছে তাই নয়, এ-সকল কাহিনীর মধ্যে দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক দিকটির সন্ধানও মেলে। এ-সম্পর্কে ডক্টর হীনজ মোদে ব'লেছেন—'Folktales have to be taken as most Valuable materials for the rediscovery of the cultural Strata of a nation and not merely to be considered as pleasant and entertaining narratives to be enjoyed by young and old in evening spare time.'[২]

সুতরাং লোক-কাহিনীগুলির মধ্যে আমাদের বিরাট ঐতিহ্য বিদ্যমান। তাই কাহিনী আলোচনায় এদের বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য দিক ও কাঠামোগুলি নিয়ে আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

লোক-কাহিনী বা লোক-গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রেই সমগ্র পৃথিবীতে সংগ্রাহকগণ যেমন সেদিকে আকৃষ্ট হ'য়েছেন, তেমনি অন্যদিকে এ-গুলি সংগ্রহ ও আলোচনার সুবিধার কথা অনেকেই চিন্তা ক'রেছেন। এ-বিষয়ে

একটি আন্তর্জাতিক নীতি গ্রহণ করা যে দরকার একসময়ে তা' বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই চিন্তার যথেষ্ট সুরাহা ক'রে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক অধ্যাপক স্টীথ্ থম্পসন্। তিনি এ-সম্পর্কে যে নীতি প্রচলন ক'রেছেন তা' Aarne Thompson-এর-Index of Tale Types ব'লে পরিচিতি লাভ ক'রেছে। তিনি লোক-কথাগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করলেন। যথা—(১) পশুপক্ষীর কথা (২) সাধারণ লোক-কথা (৩) হাস্যরসাত্মক ও অন্যান্য কাহিনী।

লোক-কথার মেজাজ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে এক একটিকে টাইপ বা ছাঁচে ফেলা হ'ল। কিন্তু প্রচলিত লোক-কাহিনীর প্রত্যেকটির একটি নিজস্বতা আছে। সুতরাং অধ্যাপক স্টীথ্ থম্পসন্ প্রত্যেক লোক-কাহিনীকে আবার এক বা একাধিক অংশে ভাগ করলেন। প্রত্যেক অংশকে বলা হ'ল Motif বা অভিপ্রায়। কাহিনীর মটিফ্ বা অভিপ্রায় সম্বন্ধে তিনি সংজ্ঞা দিলেন—

'A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have Something unusual and Striking about it.'[৩]

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির জীবনধারাকে লক্ষ্য রেখে এই শ্রেণী-বিভাগ করা হ'ল ব'লে লোক-কথা আলোচনায় এই শ্রেণী-বিভাগকে সকলেই প্রায় গ্রহণ ক'রে নিলেন। এ-সম্পর্কে Motif Index of Folk Literature নামে ছয়টি খণ্ডে এই বিভাগ-তালিকা প্রকাশ করা হ'য়েছে। ফলে লোক-কথার গবেষণায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। স্টীথ্ থম্পসনের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

আনন্দ ও সৃষ্টির মধ্যেই লোক-কাহিনীর সার্থকতা যেমন দেখা যায় তেমনি এর মধ্যে থেকে যায় মানুষ, সমাজ ও কালের সুস্পষ্ট ছাপ। এইভাবেই লোক-কাহিনী-ধারার গতি অব্যাহত র'য়েছে। তাই লিখিত বা মৌখিক যাই হোক লোক-কথার সাহিত্য-ধারা মানব-সমাজে অমরত্ব লাভ ক'রেছে। আর তা' দেশ থেকে দেশান্তরে প্রচারের পক্ষে বাধা মানে নি। সেইহেতু প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা এই লোক-কথার মধ্যেও বিরাজমান। সুতরাং এগুলির প্রাণশক্তি অপরিমেয়, অদম্যও বটে।

এবার আমাদের এই বাংলার লোক-কথা বা লোক-কাহিনী সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন মনে করি।

বিষয়বস্তু অনুসারে বাংলার লোক-কথাকেও প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) রূপকথা, (২) উপকথা, (৩) ব্রতকথা।

লোক-সাহিত্যের পণ্ডিত-মহলে এই শ্রেণীবিভাগ নিয়ে সামান্য কিছু মতানৈক্যও দেখা যায়। তবুও বাংলার লোক-কাহিনীগুলির বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রে এদের উক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। কিন্তু এই শ্রেণী-বিভাগও আবার সবসময় ঠিক থাকে না। সাহিত্যের অন্যান্য অনেক বিভাগেই এরকম মেশা-মিশির

ব্যাপারটি আমাদের নজরে পড়ে। ব্রতগীত—পাঞ্চালীর কথা ব'লতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন ব'লেছেন—'গ্রাম্যদেবীর মাহাত্ম্যখ্যাপন উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাহিনী ও রূপকথা একত্রিত হইয়া যে গেয় আখ্যায়িকা কাব্যগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাকেই ব্রতগীত-পাঞ্চালী বলিতেছি।'[৪] কাজেই বিষয় ঠিক রেখে কাহিনীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যে কোথাও-কেমন পাল্টে যেতে পারে সে-সম্পর্কে অধিকাংশ লোক-শ্রুতিবিদ্ মনে করেন।

এখন রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। লোক-কাহিনীর মধ্যে রূপকথাগুলিতে সাধারণতঃ প্রেম-বিষয়ক বিষয়বস্তু থাকে। সেইহেতু এ-গুলিকে অনেক বিদেশী পণ্ডিত Romantic Tales ব'লেছেন। আবার কেউ বলেছেন Wonder Tales। অনেকে বলেন রূপকথা হচ্ছে Fairy Tales, Marchen. অর্থাৎ পরী ইত্যাদির কাহিনী। যাই হোক রূপকথায় কাহিনী সাধারণতঃ কিছু দীর্ঘ হয়। এর উদাহরণ আছে রূপকথা-সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' (১৯০৭) গ্রন্থে। রাজকুমার, রাজকন্যা, রাক্ষস, ডাইনী, রাজা-রানী ইত্যাদি নিয়েই রূপকথা। সেখানে যে জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষীর প্রবেশ একেবারে নিষেধ থাকে তা নয়, তবে তাদের ভূমিকা নগণ্য।

উপকথা লোক-কথার আর একটি বিষয়। উপকথাকে Animal Tales বা Humorous Tales বলা হয়। এর বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকে পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি। রূপকথার তুলনায় উপকথা আকারেও ছোট হয়। এগুলিকে আকারে আধুনিক ছোট গল্পের সঙ্গে অনেকে তুলনা ক'রেছেন। এগুলির চরিত্রগত দিক থেকে এ-মত সমর্থন করা চলে। উপকথার মধ্যে পশু-পক্ষীর রূপকের ভেতর দিয়ে মানুষেরই কথা বলা হ'য়ে থাকে। এর বড় উদাহরণ উপেন্দ্র কিশোর রায়-চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' (১৩১৭)।

ব্রতকথা লোক-কথায় একটি প্রধান স্থান দখল ক'রে আছে। এগুলি যেমন সাহিত্যের দিক থেকে মূল্যবান সম্পদ, তেমনি আচারগত দিক থেকেও এদের মূল্য অপরিসীম। ব্রতকথা সাধারণতঃ স্ত্রী-সমাজে যতখানি প্রচলিত, পুরুষ-সমাজে ঠিক ততখানি নয়। অনেক সময় এগুলির ভাষার মধ্যেও আঞ্চলিক মেয়েলী ভাষার ছাপ বেশ সুস্পষ্ট থাকে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার ব্রতকথা প্রসঙ্গে ব'লেছেন—'বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জীবন এবং চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কিছুর মধ্যেই প্রকাশ পায় নাই। বিশেষত ইহারা নানা বিষয়ে রক্ষণশীল বলিয়া বাঙ্গালীর সমাজ ও আচার জীবনের এক অতি প্রাচীন রূপ ইহাদের মধ্য দিয়াই সার্থকতমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতার কথা ইহাদের মধ্যে অবান্তর মাত্র। সমাজ এবং মানুষই ইহাদের মধ্যে মুখ্য।'[৫] ব্রতাচার আশ্রয় ক'রে ব্রতকথার বিকাশ ঘ'টেছে ব'লে একদিক থেকে এগুলির গণ্ডী সীমিত। তাছাড়া আরও একটি দিক হ'চ্ছে—অনুষ্ঠান বা পাল-পার্বন উপলক্ষ্যে এগুলি সাধারণতঃ বলা হ'য়ে

থাকে। তবুও বাংলা লোক-সাহিত্যে ব্রতকথার মূল্য খুব বেশি। ব্রতকথার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দক্ষিণারঞ্জনই সংকলন ক'রে বাংলার ব্রতকথাকে মর্যাদা দিয়েছিলেন। সে গ্রন্থটির নাম 'ঠানদিদির থলে' (১৯১৯)।

রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথা সংকলনের অনেক গ্রন্থই বাংলা-লোক-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তবুও সন্দেহাতীতভাবে এ-কথা বলা যায় যে, এখনো দেশের পল্লীর সাধারণ অশিক্ষিত সমাজের বুকে অনেক লোক-কাহিনী সঞ্চিত হ'য়ে আছে। লোক-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধিতে যেগুলির সন্ধান আজ অপরিহার্য এ-কথা ব'ললে বোধ করি বাড়িয়ে বলা হবে না।

আমাদের সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি লোক-সাহিত্যের কাছে ঋণী অনেক গবেষক এরকম মন্তব্য ক'রেছেন। তাই মনে হয় লোক-সাহিত্যের পারিপাট্য ও অপূর্ব বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটায় তা' মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের সাহিত্যে স্বাভাবিক কারণেই এসে গেছে। পৃথিবীর অনেক দেশের সাহিত্যেও তাই দেখা গেছে। মহাকাব্যগুলির উৎপত্তি ও গাঁথুনিতে লোক-সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। মহাকাব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিদগ্ধ সমালোচক ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায় ব'লেছেন,—'সুপ্রাচীন কাল হইতে যে বিভিন্ন লোকগাথা, কিম্বদন্তী, নীতিগল্প, রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী দেশের আকাশে বাতাসে ধূলিকণায় অস্পষ্ট নীহারিকার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইত, সেই গল্পকথার নীহারিকাগুলি একদিন সংহত হইয়া মহাকাব্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দীপ্তি পাইয়াছে।'[১] সুতরাং অনেকদিক থেকেই লোক-কথা আজ শুধু অবসর বিনোদনের উপকরণ নয়, আমাদের মূল্যবান সম্পদও বটে। কোন্ সুদূর অতীতের ঐতিহ্যকে বহন ক'রে যে লোক-সাহিত্য নিরক্ষর ও পল্লী মানুষের মাঝে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে বিকশিত হয়েছে এবং স্তরে স্তরে আধুনিক কালের সীমানায় এসেও উজ্জ্বল ও ভাস্বর হ'য়ে বর্তমান, এবং যা'কে আশ্রয় ক'রে বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণময় বুকে রূপালি পাতা ও মুক্তাফলের ন্যায় বিরাজ ক'রছে আজ তা অবহেলার সম্পদ নয়। তাই আমাদের এই জাতীয়-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ-কাজকে আমরা যদি আমাদের একান্ত কর্তব্য ব'লে আন্তরিক-ভাবে গ্রহণ করি তবে একদিকে যেমন আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠবে, অন্যদিকে চিরকালের অবহেলিত মানুষ, সমাজ ও তার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও জানানো হবে।

---

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড-আলোচনা,

২. Heinz Mode, Folktales of Bengal—A Study, appeared

৩. Stith Thompson, The Folktale, New york, 1951, P.-415

৪. ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড-পূর্বার্ধ, ষষ্ঠ সং,

৫. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য,

৬. ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কাব্য,

বাংলার লোক-কাহিনী সংগ্রহের পথিকৃৎ

নিম্নদামোদর উপত্যকা অঞ্চলের লোক-কাহিনী বা লোক-গল্প আলোচনাকালে বাংলার লোক-কথা সংগ্রহের পথিকৃৎদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে তাঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকে খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকগণ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে বাংলা লোক-সাহিত্যের উপকরণ প্রবাদ সংগ্রহের কাজে লাগেন। ইউরোপীয় মিশনারীদের অবদান যেমন বাংলা গদ্য-সাহিত্যে তেমনি এদেশের লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ-কাজে তাঁদের প্রচেষ্টা স্মরণীয় ঘটনা। ধর্ম-প্রচারক ছাড়া আর একজন ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদের কথা আমাদের মনে পড়ে। তিনি জন্ গ্রীয়ারসন। গীতিকা প্রকাশ ক'রে তিনি লোক-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। এ-প্রসঙ্গে উইলিয়ম্ কেরি-র নামও স্মরণ করি। 'ইতিহাস মালা' (১৮১২) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। কিন্তু বাংলার লোক-কথা সংগ্রহে যাঁর কথা আমাদের সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি হ'লেন রেভাঃ লালবিহারী দে (১৮২৪—১৮৯৪)। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ ক'রেও বাংলা ও বাঙালীর প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ ছিল তা' বুঝতে পারা যায় তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি থেকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে—খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত হ'য়ে তিনি এই দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের নিকটবর্তী বর্ধমান জেলার কালনায় 'অরুণোদয়' পত্রিকার সম্পাদনা ক'রে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হ'য়েছিলেন। রেভাঃ লালবিহারী দে বাংলার লোক-কাহিনী সংগ্রহ ক'রে ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যে গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রেছিলেন তার নাম Folk-Tales of Bengal। সে-সময়ের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি প'ড়ল বাংলার অমূল্যসম্পদ লোক-কাহিনীর দিকে। লালবিহারী দে-র ভাষা চমৎকার। একদিকে ইংরেজী ভাষায় গভীর জ্ঞান অন্যদিকে এ-দেশের জন-জীবনের প্রতি তাঁর গভীর পরিচিতি, এ-দুই বৈশিষ্ট্য তাঁর গ্রন্থটিকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছে। কাহিনীগুলির সংগ্রহ ও অনুবাদ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—'None of my authorities knew English, they all told the Stories in Bengali, and I translated them into English when I came home'[১]

রেভাঃ লালবিহারী দে-র 'ফোক্-টেল্‌স অব্ বেঙ্গল' গ্রন্থে মোট ২২টি কাহিনী আছে। এই কাহিনীগুলি দেশ-বিদেশে প্রচার ও সমাদর লাভ করার ফলে কিছুকালের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় আরও কয়েকজনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশিত হয়। রামসত্য মুখোপাধ্যায়ের Indian Folklore (১৯০৪), কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের Popular Tales of Bengal (১৯০৫), ম্যাককালক্-এর Bengali Household Tales (১৯১২), রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়া শোভনা দেবীর The Orient Pearls (১৯১৫),

ব্রাডলি-বার্ট সংকলিত Bengali Fairy Tales (১৯২০), দীনেশচন্দ্র সেন-এর The Folk-literature of Bengal (১৯২০), সুনীতি দেবীর Indian Fairy Tales (১৯২৩) প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনকে অধ্যাপক Heinz Mode 'The great Bengali Scholar' ব'লে উল্লেখ ক'রেছেন।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হ'ল। তার আগেই বহুযুগের মর্মবাণী নিয়ে সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিও লোক-সাহিত্যের আসরে এলেন। কবি ছেলে ভুলানো ছড়া এবং গ্রাম্য গীতি সংগ্রহ করার কাজে মন দিলেন। তাঁর রচিত ছড়া সম্পর্কে অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন ব'লেছেন, "কড়ি ও কোমলের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর' ও 'সাত ভাই চম্পা' কবিতা দুইটিতে কবির শৈশব কল্পনার সার্থক প্রকাশ।"[২]

রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য আলোচনাকালে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ব'লেছেন —'রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যেও লোক-সাহিত্যের স্বাক্ষর বর্তমান রহিয়াছে।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে আমাদের দেশে অনেকেই লোক-সাহিত্য সংগ্রহের কাজে নেমেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মনীষী বাংলা লোক-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ ক'রেছেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার উলাইল গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। যৌবনে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কোলকাতায় এসে হাজির হ'লেন। দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের পরিচয় আমাদের লোক-সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধতর ক'রে তুলল। আমরা পেলাম দক্ষিণারঞ্জনের সেই বিখ্যাত 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' (১৯০৭) তারপরে 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯), 'ঠানদিদির থলে' (১৯০৯) 'দাদামহাশয়ের থলে' (১৯১৩) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেই ভূমিকা এই গ্রন্থটিকে আর একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রল। দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখেছিলেন— 'তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবুও তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে।' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সার্থক লোক-কাহিনী-সংগ্রহ হিসেবে দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমা'র ঝুলি' বাংলা লোক-সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছে।

রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথা—এই তিনটি প্রধান বিভাগ আছে লোক-কথায়। লালবিহারী ও দক্ষিণারঞ্জন দু'জনেই যা' সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ ক'রেছিলেন তা' রূপ-কথা। কিন্তু উপকথাও যে বাংলার লোক-সাহিত্যে বিশেষ স্থান ক'রে নিতে পারে তা' দেখালেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৮—১৯১৬)। এই বিরাট প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব উপকথা সংগ্রহ ক'রে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে 'টুনটুনির বই'

প্রকাশ ক'রলেন। পূর্ববাংলার মৈমনসিংহ অঞ্চল যেখানে তাঁর জন্মভূমি সেখান থেকে কাহিনী সংগ্রহ ক'রে তিনি শুধু লিখলেন না, কাহিনীর মাঝে মাঝে তাঁর নিজেরই আঁকা চিত্র কাহিনীর মাধুর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই উপকথার বলিষ্ঠ রূপকারের মর্যাদা নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর আমাদের লোক-সাহিত্যে স্মরণীয় হ'য়ে রইলেন। উপেন্দ্রকিশোরের কাজে যিনি উৎসাহ দিয়ে আন্তরিকভাবে সাহায্য ক'রেছিলেন তিনি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। লোক-কথা আলোচনায় তাঁর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা স্মরণ করি।

বাংলার লোক-কথা সংগ্রহে আরও অনেকের অবদান আছে। এ-প্রসঙ্গে কালীমোহন ভট্টাচার্যের 'ঠাকুরদাদার রূপকথা' (১৯২২), ইন্দুমতী দেবীর (১২৭৬—১৩৩৪) 'বঙ্গ নারীর ব্রতকথা' (১৩৩৩) উল্লেখ করা চলে। বাংলার লোক-সাহিত্যের ইতিহাসে আর একজনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন। তাঁর রচিত 'দি ফোক্ লিটারেচার অব বেঙ্গল' (১৯২০) গ্রন্থটি লোক-সাহিত্যচর্চায় দেশ-বিদেশের গুণী-জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পরবর্তীকালে লোক-কথা সংগ্রহে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। এ-প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ও লোক-সাহিত্য প্রেমিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ ডক্টর ভেরিয়র এল্উনের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

অধুনা বাংলাদেশে লোক-সাহিত্য নিয়ে অনেকেই গবেষণা করছেন। 'হারামণি' গ্রন্থ-প্রণেতা ও লোকশ্রুতিবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর আশরাফ্ সিদ্দিকী এবং আরও অনেকে দীর্ঘ-দিন লোক-গল্প সংগ্রহ করে চ'লেছেন। লোক-সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনাও আছে তাঁদের রচিত একাধিক গ্রন্থে।

অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ ও সংযোজন বাংলা লোক-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল ক'রেছে। তাঁর রচিত 'বাংলার লোক-সাহিত্য' ছয়টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড—আলোচনা, দ্বিতীয় খণ্ড—ছড়া, তৃতীয় খণ্ড—গীত ও নৃত্য, চতুর্থ খণ্ড—কথা, পঞ্চম খণ্ড—ধাঁধা, ষষ্ঠ খণ্ড—প্রবাদ। চতুর্থ খণ্ডটি লোক-গল্প সংগ্রহ ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য লোক-কথা গবেষকদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য হ'য়ে আছে।

অধুনা লোক-কাহিনী নিয়ে অনেকেই তুলনামূলক আলোচনা ক'রেছেন এবং ক'রে চ'লেছেন। তাঁদের অনেকের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতগণের অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করবো। তবুও দেখা গেছে, —পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মহলের অনেকেই বাংলার লোক-কথাকে পূর্ণ মর্যাদা দেন নি। কিন্তু যিনি সে-মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ব'লেছেন—'সম্প্রতিকালে পাশ্চাত্ত্য গবেষকদিগের মধ্যে বাংলার লোক-কথা বিষয়ে যিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আলোচনা করিতেছেন, তিনিই ডক্টর হীনজ্

মোদে। তাঁহার আলোচনার মধ্য দিয়া বাংলা লোক-কথাগুলির মূল সূত্রটি ধরিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। ইহা বাংলা লোক-কথার পক্ষে একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।' (বাংলার লোক-সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড—কথা, পৃঃ ৫২)। এই বক্তব্যে স্বদেশপ্রীতি এবং বাংলার লোক-সাহিত্যের প্রতি যেমন মর্যাদা দান করা হ'য়েছে তেমনি উৎসাহী লোক-কাহিনী সংগ্রাহকদেরও তিনি উৎসাহ দান করেছেন। এই সুচিন্তিত ভাবনাই আমাদের পথ-নির্দেশ ও প্রেরণা দেবে। বাঙালীর অমূল্য সম্পদ বাংলার লোক-কাহিনী সংগ্রহে নামী, অনামী সকল পথিকৃৎ-এর ভাবনা-চিন্তা ও প্রচেষ্টাকে স্মরণ রেখেই কাজের ভেতর দিয়ে আমরা তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাবো।

---

১. L. B. Day, Preface of 'Folk-tales of Bengal' Mac. & Co. Ltd, London, 1881.

২. ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০২

৩. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২।

লোক-কাহিনী ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ কবি। তাঁর যুগান্তকারী ও কালজয়ী যে-সাহিত্যকে আমরা পেয়েছি সে-সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচ্ছুরণ বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের অমর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে পাই কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, গান, ছড়া, প্রবন্ধ ইত্যাদি। সাহিত্যের বহু শাখা-প্রশাখায় রবীন্দ্র-প্রতিভার ভাস্বর পরিচয় বর্তমান। বিশ্বকবির কবিমানস বিশ্বপ্রসারী। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে এই বাংলার মাটি, জল, প্রকৃতি থেকেই তিনি রস সংগ্রহ ক'রেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের কথা ব'লতে গিয়ে চমৎকার মন্তব্য ক'রেছেন—'Rabindranath is not only the poet of modern Bengal but he is equally the poet, in a special sense of ancient and medieval Bengal, a poet of Folk Bengal. Rabindranath above all, a Bengali' (Golden Book of Tagore, ed. Ramananda Chatterjee, Calcutta, 1931).

বঙ্গভূমির মোহময় সুন্দর প্রকৃতি-পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি যেন সমগ্র বিশ্ব-মানবের অন্তরের অব্যক্ত কথার বাণীরূপ। তাঁর জীবন, মনন ও অনুভূতি দিয়ে তিনি যেন বিশ্বকে ভালবেসেছেন। কবি 'চৈতালি' কাব্যের 'প্রভাত' কবিতায় ব'লেছেন—

'পাখির আনন্দ গান দশ দিক হতে
দুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে।
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।'

বাংলার প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন ভালবেসেছিলেন তেমনি বাংলার সমাজ ও সাধারণ মানুষের প্রতিও ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। তাই বাংলার লোক-কথা আলোচনা ক'রতে গেলে সাহিত্যের জ্যোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথের কথা আমাদের স্মরণে আসা অতি সঙ্গতকারণেই অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথের যৌবন ও প্রৌঢ়কালের সুদীর্ঘ সময় কেটেছে পদ্মাতীরে জন-জীবনের মাঝে। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য ক'রেছেন—'জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল—মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন।' (রবীন্দ্রজীবনী-১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২)। ১৮৮৭ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবি তাঁর পত্রাবলীতে এই জীবনের বিচিত্র পরিচয় রেখেছেন। এই সময়েই তিনি সোনার ফসল তুলেছেন। তাঁর ছোটগল্পের এটিই স্বর্ণযুগ। রূপকথা ও ছড়ার বিচিত্র শব্দ ও পরিবেশকে

তিনি কাব্যে ও গানে যেমন পরিবেশন ক'রেছেন তেমনি ছোটগল্পের মধ্যেও তা' আমরা দেখতে পাই। 'গল্পগুচ্ছে'র 'সুভা' গল্পে পাই—'মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত, আস্তে আস্তে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত। প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছ ধরা রাখিয়া সেই মাণিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে—কে বসিয়া?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা।' রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্পের মধ্যেই রূপ-কথার এ-রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ছোটগল্পের সমালোচনায় বিদগ্ধ সমালোচক মন্তব্য ক'রেছেন—'রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প পর্যালোচনা করিয়া আমরা তাঁহার প্রসার ও বৈচিত্র্যে চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারিনা। আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা ও অতীত জীবনযাত্রার সমস্ত রসধারা অগস্ত্যের মত তিনি এক নিঃশ্বাসে পান করিয়াছেন—বাংলার জীবন ও বহিঃপ্রকৃতি তাহাদের সৌন্দর্যের কণামাত্রও তাঁহার আশ্চর্য স্বচ্ছ অনুভূতির নিকট হইতে গোপন করিতে সমর্থ হয় নাই।'[১]

জীবনের প্রথম দিক থেকেই লোক-সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি ঝোঁক ছিল। লোক-সাহিত্য সংগ্রহের প্রতিও তিনি মন দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য সংগ্রহ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'তিনি যে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ কার্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি কিছু ছড়া ও গ্রাম্য-গীতি সংগ্রহ করিলেও কোন লোক-কথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি লোক-কথার প্রেরণাও যে তাঁহার সমগ্র জীবনের কাব্য-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কাব্য-রচনার ধারা অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।'[২]

বাংলার লোক-সাহিত্য আলোচনার একরকম সূত্রপাত হ'য়েছিল ১৩০১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকেই। 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। সে-প্রবন্ধের নাম 'ছেলে ভুলানো ছড়া'। আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের নানা জায়গায় ছড়া সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ছড়া-সংগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন নি। একজন মিশনারী অবশ্য খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রবাদ সংগ্রহ ক'রেছিলেন। তাঁর নাম উইলিয়ম্ মর্টন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রবাদ ছেড়ে ছড়া সংগ্রহে মন দিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ছড়াগুলি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা স্মরণ করা যেতে পারে, 'আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে, সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।' লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার অনুসন্ধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ গভীর-ভাবে চিন্তা ক'রেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে এ-দেশের সংগৃহীত জাতীয়

সম্পদকে রক্ষা করবে সে ভরসাও ক'রেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি সভায় তিনি 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ ব'লেছিলেন, 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থান ভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুতঃ দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য পরিষদ্ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন। আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুরোধ পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি।'[৩] লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ সেদিন ব্রতী হয়েছিলেন। ফলে তখনকার দিনে সুধী সমাজের দৃষ্টি পড়ল এ-সাহিত্যের ওপর। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রকাশের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়া এবং গান সংগৃহীত হ'য়ে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ছাপা হ'তে লাগল। অনেকেই এ-কাজে লেগে গেলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অবদানই এ-ব্যাপারে বড় কথা।

'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের সর্বমুখী প্রতিভার একটি বিশেষ অবদান। ১৩০১ সাল থেকে ১৩০৫ সাল পর্যন্ত লোক-সাহিত্যের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হ'য়েছিল। সেই সময়েই তিনি 'সোনার তরী' এবং 'চিত্রা' কাব্য রচনা করেন। এই সময়টিই 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পগুলির রচনাকাল। এই সময়ে বাংলা লোক-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর মধ্যে দেখা গেলেও তার আগেই 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) কাব্যের সময় থেকেই কবির মধ্যে লোক-সাহিত্যের অল্প প্রভাব নজরে পড়ে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের যুগ থেকে কবি যখন 'মানসী'র যুগে এলেন তখনই তাঁর মধ্যে বাংলার প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি বেশি আকর্ষণ এল। লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ কার্যে তখন তিনি ব্যস্ত। 'মানসী' কাব্যের 'বধূ' কবিতার মধ্যে রূপকথার স্পর্শ অনুভব করা যায়—

'উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!'

মায়ের কাছে রূপকথা শোনা যেন বাঙালী-জীবনে এক আনন্দ-স্বাদ হিসেবে দেখা দেয়। বাঙালী-জীবন থেকে রূপকথাকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন করে দেখেননি।

'সোনার তরী' কাব্যে 'বিম্ববতী' কবিতাটি বাংলার রূপকথার আধুনিক রোমান্টিকধর্মী সৃষ্টি। সর্বকালের জীবন-সত্যকে এখানে অনুভব করা যায়। ইংরেজ কবি কীট্স-এর মতো রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন অলিখিত সাহিত্য থেকে উপকরণ নিয়ে তাকে আধুনিক কালের পাঠককে উপহার দিলেন। এ-কবিতার বিশেষ একটি অংশকে উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে।—

'দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি—
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মতো।
চীৎকারি কহিল রাণী কর হানি বুকে
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।'

রূপকথার এমন সুন্দর অভিযোজন আমাদের সাহিত্যের অমর সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী। তাই রূপকথাকে আধুনিক রসে জারিত ক'রে পাঠকের সামনে তুলে ধ'রলেন।

'সোনার তরী' কাব্যের 'নিদ্রিতা' কবিতাটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার-এর 'ঘুমন্ত পুরী'[৪] লোক-কথার সঙ্গে বেশ মিল দেখা যায়। ঘুমন্ত পুরীর কাহিনী মুগ্ধচিত্তে আমরা শুনতে পাই—

'সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে,
প্রাসাদমাঝে পশিনু সাবধানে,
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণীমাতা,
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা ;
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।'

'নিদ্রিতা' কবিতার মতো 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাটিতেও সুন্দর বর্ণনা আছে। সেখানে রাজকন্যা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তারপর তার গলার মালা দেখে সে অবাক হয়—

'শয়ন শেষে রহিল বসে
ভাবিল রাজবালা,
আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু
কে পরালে মালা।'

এ-প্রসঙ্গে আর একটি কবিতার কথা আমাদের স্মরণে আসে। সে কবিতার নাম 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে'। এই কবিতায় রাজার মেয়ে গলা থেকে মোতির

মালা খুলে খেলা করতে করতে পথে ফেলে গেল। রাজার ছেলে সেটি তুলে নিলে। এ-বর্ণনা রূপকথার বিষয়বস্তুকে আধুনিকতার সুন্দর কাঠামোতে এনে দিয়েছে—

'রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,
আপন মণিহার মনোভুলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।'

'কণিকা' কাব্য গ্রন্থেও কোন কোন কবিতায় রূপকথার ছোঁয়া লেগেছে। নীতি-কাহিনী রচনা ক'রতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রূপকের মাধ্যমে কবিতা লিখেছিলেন। এরকমই একটি কবিতা হ'চ্ছে—'চুরি-নিবারণ'। সেখানে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা মেলে—

'সুয়োরাণী কহে, রাজা, দুয়োরাণীটার
কত মৎলব আছে বুঝে ওঠা ভার।
গোয়াল-ঘরের কোণে দিল ওরে বাসা,
তবু দেখো অভাগীর মেটে নাই আশা।'

লোক-কথায় পাওয়া যায় যে রাণীকে রাজা বা অন্য কোন রাণী দেখতে পারে না, তাকে হয় বনবাসে নতুবা গোয়ালঘরে থাকতে দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের এ-কবিতায় সেটিও লক্ষ্য করা যায়।

'চিত্রা' কাব্যের 'সিন্ধুপারে' কবিতাটির মধ্যে লোক-কথার-স্পর্শ বেশ ভালভাবেই অনুভব করা যায়—

'পথের দুধারে রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধসারি
ঘরে ঘরে হায় সুখশয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জনপথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে—
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে—
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদশিখরে প্রহরঘণ্টা বাজে।'

'শিশু' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 'খোকা' কবিতায় রূপকথার উল্লেখ ক'রেই ব'লেছেন—

'শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে

দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা
সেখান থেকে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া-আসা।'

'সাত ভাই চম্পা' কবিতায় বাংলা লোক-কথার ছাপ বেশ স্পষ্ট—

'সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
সাতটি চাঁপা ভাই,
রাঙা-বসন পারুলদিদি,
তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে
সাতটি সোনা মুখ,
পারুলদিদির কচি মুখটি
করতেছে টুক্‌টুক্‌।'

'শিশু' কাব্য গ্রন্থের 'সমালোচক' কবিতায় শিশু বলে—

'ঠাকুর মা কি বাবাকে কখ্‌খনো
রাজার কথা শুনায় নিকো কোনো।'

দুঃসাহসিক অভিযানের ভেতর দিয়ে 'শিশু' কাব্যের 'বীরপুরুষ' কবিতা আগাগোড়া রূপকথার আবরণে মোড়া—

হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাঁদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া, খবরদার!
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, 'হারে, রে রে রে রে।'

'নৌকাযাত্রা' কবিতায় শিশুর ইচ্ছের মধ্যেও রূপকথার ছাপ ফেলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

'পেরিয়ে যাব তিরুপুণির ঘাট
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ
গল্প বল্‌ব তোমার কোলে এ'সে।
আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।'

রূপকথাকে আশ্রয় ক'রেই 'শিশু' কাব্যের 'ছুটির দিনে' কবিতাটিতে সাগর, পাহাড়, রাজপুত্তুর, রাজকন্যার কথা পাই—

'কোন্ সাগরের তীরে মা গো,
কোন্ পাহাড়ের পারে,
কোন্ রাজাদের দেশে মা গো,
কোন্ নদীটির ধারে।'

আবার দেখতে পাই—

'গজমোতির মালাটি তার
বুকের 'পরে নাচে—
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে।'

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নানা শাখায় বাংলার লোক-সাহিত্যের অবদান ছড়িয়ে আছে। ছড়া, রূপকথা ইত্যাদির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মমত্ববোধ ছিল অসীম। এ-প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় কবি যা ব'লেছেন তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা চলে—'এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে।' রবীন্দ্রনাথও তাই তাঁর জীবনে বাংলার এই মাতৃস্নেহের মধ্যে লালিত-পালিত হ'য়ে তার মাটি, প্রকৃতি, গাছ-পালা, মানুষ সবকিছুর মধ্যেই নিজের অস্তিত্বকে মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিলেন। গ্রাম্য-সাহিত্যের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন তার তুলনা বিরল। তাই রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য-ভাবে লোকায়ত বাংলার কবি-প্রতিভা। সাহিত্যের গতিধর্মকে তিনি অস্বীকার করেন নি। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—'গতিধর্মে বিশ্বাসী হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের মনন-জমিতে নানাবিধ ফসল ফলিয়াছে—কোথাও জমাট বাঁধিয়া নাই।'[২]

রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোর ছটা সুদূর-প্রসারী। সে-প্রতিভা শুধু যে চমক লাগায় তাই নয়, সে-প্রতিভা কৌতূহল জাগায়। বিদগ্ধ সমালোচকের মতে—'বহুশ্রুত রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার মত সজাগ সংবেদনশীল কৌতূহলী ও সুদূরপ্রসারী মন লইয়া আর কেহ আমাদের দেশে লেখনীধারণ করেন নাই।'[৬]

ফোকলোর আলোচনা ক'রতে গিয়ে ফোকলোরবিদ্ ডক্টর হীন্‌জ মোদে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যসৃষ্টি প্রসঙ্গে ব'লেছেন—'...in Bengal it is but unnecessary to remind of the creative activity of a genious like Rabindranath, who fully utilised this traditional art.'[৭]

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনায় বাংলার গ্রামীন সংস্কৃতির বহু মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। সেইসব উপকরণের তিনি যথাযথ ও সুন্দর বাণীরূপ দান ক'রেছিলেন। গ্রাম-বাংলার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল গভীর। পল্লীর নিপীড়িত ও নিরক্ষর

অসহায় মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা যেমন তিনি ভাবতেন, তেমনি সেই মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা সাহিত্যের প্রতিও তাঁর ভাবনা-চিন্তার শেষ ছিল না। তাই লোক-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান আমাদের মনে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ হয়। তাঁর প্রচেষ্টা ও সৃষ্টির ভেতর দিয়েই আমাদের লোক-সাহিত্যের লিখিত রূপের একরকম সূচনা। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে, মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন। সে-ভালবাসার প্রকাশ তাঁর নিজেরই লেখায় ফুটে উঠেছে—

'অবজ্ঞা করিনি তোমার মাটির দান,
আমি যে মাটির কাছে ঋণী—
জানায়েছি বারম্বার।'

---

১. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৫ম সং, কলিকাতা,

২. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড-কথা, কলিকাতা,

৩ শিক্ষা, রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, প. ব. সরকার,

৪. ঠাকুরমা'র ঝুলি (১৯০৭), মিত্র ঘোষ, প্রথম সুলভ সং,

৫. ডঃ শচীন সেন, রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়, ৩য় সং,

৬. ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ,

৭. Dr. Heinz Mode, 'Folktales of Bengal—A Study', appeared

নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের জীবনধারায় বিবর্তন

আদিকাল থেকে এই পৃথিবীতে ভূ-প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘ'টে আসছে, তেমনি বিভিন্ন জাগতিক পরিবেশে জীবের নানা বিবর্তনও সংঘটিত হ'য়ে চ'লেছে। ভূ-প্রকৃতির গঠন বা পুনর্গঠনের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষের দেহ-মনের বিবর্তনেও। এ-কথা বিজ্ঞানের দিক থেকে যেমন সত্য, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এ-সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস আলোচনায় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য ক'রেছেন—'প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্যাচারী অনার্যজাতি হিংস্র বন্যপশু ও অপরিজ্ঞাত-রহস্য বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে সর্বদা আতঙ্ক ও বিভীষিকাই লাভ করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য সেই যুগ হইতেই তাহারা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকিতে গিয়া তাহাদের অপেক্ষা শক্তিমান জীবসমূহ হইতে সর্বদা দূরে সরিয়া রহিয়াছে।'[১] প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানুষকে কখনো যুদ্ধ করতে হ'য়েছে আবার কখনো কোন শক্তির কাছে মাথা নত করতে হ'য়েছে। ফলে মানুষের দেহ-মন ক্রমবিবর্তন-বাদের ইতিহাসে দেখতে পাই প্রকৃতির শক্তির দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হ'য়েছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে মানুষের চেহারা ও প্রকৃতির মধ্যে যেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তেমনি স্থান বিশেষে সেই মানুষের সৃষ্টি ও কৃষ্টির রূপে এবং আকারে বৈচিত্র্য আমাদের নজরে পড়ে। তাই নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের লোক-কাহিনী আলোচনার পূর্বে দামোদর নদের প্রভাব এ-অঞ্চলের মানুষের জীবন-ধারায় কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রেছে এবং সাধারণ পল্লী-মানুষের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক অবস্থার কতখানি পরিবর্তন এনেছে—সেকথা আলোচনা করা কিছু প্রয়োজন।

দামোদর নদ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমিঅঞ্চল থেকে উৎপন্ন হ'য়ে বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে হুগলী নদীতে মিশেছে। নদী-বহুল এই বাংলাদেশে দামোদর নদের খরস্রোতের পরিচিতি আছে। এই নদের সঙ্গে রাঢ়ভূমির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন,—'রাঢ়াভূমি দক্ষিণে দামোদর এবং সম্ভবত রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'[২] আর একজন শিক্ষাবিদ দামোদরের প্রবাহপথ সম্পর্কে বলেছেন—'বর্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন খুব বেশি হইয়াছে। ফানুডেন ব্লোকের নক্‌শায় (১৬৬০) দেখা যায় বর্ধমানের দক্ষিণ-পথে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তর—

পূর্ববাহী হইয়া অম্বোনা (Ambona)-কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ দাসের (কেতকাদাস) মনসামঙ্গলে (১৬৪০ আনুমানিক) এই শাখাটিকেই বুঝি বলা হইয়াছে "বাঁকা দামোদর"। এই বাঁকা নদীর তীরে তীরে যে-সব স্থানের নাম কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ করিয়াছেন তাহার তালিকা : কুঝাটি বা ওঝাটি, গোবিন্দপুর, গঙ্গাপুর, দেপুর, নেদায়া বা নর্মদাঘাট, কেজুয়া, আদমপুর, গোদাঘাট, কুকুরঘাটা, হাসানহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর ও গহরপুর। গহরপুরের পরেই বাঁকা দামোদর "গঙ্গার জলে মিলি"য়া গেল।'[৩]

সুতরাং দামোদরের পরিচিতি দীর্ঘকালের। এই নদীতে এককালে গ্রীষ্মে জল প্রায় থাকত না। কিন্তু বর্ষায় ভরপুর। সময় সময় দুকূল ছাপিয়ে যেত। মাঝে মাঝে বন্যার ভয়ংকর রূপ নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের মানুষের জীবনধারাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিত। গ্রামের পর গ্রাম জলে প্লাবিত হ'ত। এবং অসংখ্য মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রাণহানি ঘ'টত, মাঠের সোনার ফসল নষ্ট হ'য়ে যেত। মানুষের কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকত না। দুর্গাপুর ব্যারেজ হওয়ার পূর্বে প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে দামোদরের বন্যার তাণ্ডব লীলা কম বেশি দেখা যেত। অবশ্য ব্যারেজ হওয়ার পরে দুরন্ত দামোদরকে আয়ত্বে বা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হ'লেও বিগত বাং ১৩৮৫ সালের ১০ই আশ্বিন দেশ জুড়ে অতিবর্ষণের ফলে দুর্গাপুর ব্যারেজের কিছু অংশ ভেঙে যায়। ফলে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এ-বন্যা প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। একদিকে যেমন মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রভূত ক্ষতি হয় অন্যদিকে ঘর-বাড়ী ও মাঠের ফসল ধ্বংস হ'য়ে যায়। বর্তমানে অবশ্য দুর্গাপুর ব্যারেজের সংস্কার হ'য়েছে এবং দামোদর নদের জলধারাকে পুনরায় সুনিয়ন্ত্রিত করাও সম্ভব হয়েছে।

ইং ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫০ সালে দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মান করা হয়। কিন্তু ব্যারেজ হওয়ার পূর্বে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা ছিল বিক্ষিপ্ত ও অনিশ্চিত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীকে কৃষিকার্যের ওপর এখনো নির্ভর করে থাকতে হয়। বর্ষা ও শরৎকালে প্রায় প্রতি-বৎসর দামোদরের বন্যা মাঠের ফসল নষ্ট ক'রে দিত। কিন্তু বন্যার জল প্রচুর পলিমাটি বহন করে এবং সেই পলিমাটি নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের জমিতে জমা হ'য়ে জমি উর্বর ক'রে তুলত। ফলে কৃষককে জমিতে একরকম সার দিতেই হ'ত না। সার প্রয়োগ না করেও তখনকার দিনে জমিতে ধান, গম, সরষে, তিল, পাট, তরমুজ কাঁকুড়, ঝিঙে, পটল, উচ্ছে, আলু প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন হ'ত। কিন্তু বর্ষায় বন্যা আসায় ধানের ক্ষতি হ'ত বেশি। এজন্য প্রধান ফসল ধান সব বৎসর না পাওয়ায় মানুষের অভাব-অনটন থেকেই যেত। মাঝে মাঝে আকাল বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

প্রায়ই বান-বন্যা হওয়ার জন্য এ অঞ্চলে রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না। গ্রামান্তরে যেতে গেলে মানুষের কষ্টই হ'ত। বর্ষাকালে নৌকা বা ডোঙা ছিল এক গ্রাম থেকে

অন্যগ্রামে যাতায়াত করার একমাত্র উপায়। নদী পার হ'য়ে কোথাও যেতে গেলে দামোদর নদের ওপর নৌকা চ'ড়ে যেতে হ'ত। অনেক সময় তীব্র স্রোতে প'ড়ে খেয়া নৌকা ডুবি হ'তে দেখা গেছে। এখনো নৌকা চ'ড়েই পারাপার করতে হয় তবে পূর্বের সে-আশংকা আর নেই।

প্রায় প্রতিবৎসর দামোদরের বন্যার ফলে পল্লী অঞ্চলের বাড়ী-ঘর ধ্বংস হ'য়ে যেত। সেইজন্য কেউই মাটির ভাল বাড়ী তৈরী করতেন না। পল্লী অঞ্চলে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ইটের পাকাবাড়ী করিতেন। মধ্যবিত্ত ও পল্লীর গরীব মানুষ বাঁশের ছিটেবেড়া দিয়ে ঘর করতেন। সে-ঘরের সুবিধা এই যে, বন্যার জলে মাটি ধুয়ে গেলেও বাঁশের দেওয়াল যেমনকার তেমনি থেকে যায়। বন্যার জল কমে গেলে পুনরায় কাদা লাগিয়ে দেওয়াল ঠিক করে নেওয়া হয়।

তখনকার দিনে বর্ষাকালে উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। ম্যালেরিয়া রোগ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এ অঞ্চলেও ব্যাপক ছিল। এখনকার মতো তখন চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, টোটকা ইত্যাদিতে চিকিৎসা করার প্রচলন থাকায় মৃত্যু-হার বেশি ছিল।

নিম্ন-দামোদর অঞ্চলে তখনকার দিনে সাধারণ পল্লী-মানুষের অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও অনেক লৌকিক উৎসবের আধিক্য ও আড়ম্বর ছিল। ভাদ্রমাসে ভাদুগান এ-অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানের তুলনায় বেশিই শোনা যেত। বন্যার প্রকোপে জীবন-হানি হ'ত অনেক। সেই কারণে এ-অঞ্চলের হিন্দুরা ভাদ্রমাসে 'জলকুমারী পূজা' ও মুসলমান সম্প্রদায় 'ভেলার পরব' ক'রে থাকেন। তবে বর্তমানে ভেলার পরব অনেক স্থানে বন্ধ হ'য়ে গেছে। পৌষ-সংক্রান্তিতে দামোদর নদের চড়ায় ময়ূরপঙ্খীগান এ-অঞ্চলের সুদীর্ঘকালের উৎসব। আজও কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। তুষু ও মকরস্নান উৎসব এ-অঞ্চলে আজও অপ্রতিহত গতিতে চ'লেছে। চৈত্রমাসে শিবের গাজন প্রায় প্রতিটি হিন্দুপল্লীতেই দেখা যায়। তবে আগেকার দিনের থেকে এখন জাঁক-জমক কমেছে। ধর্ম-ঠাকুরের উৎসব, মনসাপূজা, ইতুপূজা প্রভৃতি উৎসবগুলি এখনো সাধারণ সরল পল্লী-মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকেন। এই অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি গ্রামে পূজা বা উৎসব বেশ ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় অর্থাৎ নৃসিংহ চতুর্দশীতে রায়না থানার বোরো গ্রামে বলরামের 'চক্ষুদান' উৎসব ও নারুগ্রামের নারেশ্বরের গাজন এ-অঞ্চলে বিখ্যাত। দামোদরের কিনারায় জানকুলি গ্রামে বনবিবির উৎসব এ-অঞ্চলের আরও একটি আকর্ষণ। পয়লা মাঘ সদর ঘাটের মেলা ও নদীর চড়ায় অন্যান্য অনেক মেলাই দীর্ঘদিন ধ'রে এখানের মানুষের মনে আনন্দ দিয়ে আসছে।

দুর্গাপুর ব্যারেজ হওয়ার পূর্বে যখন বন্যার প্রকোপ ছিল বেশি তখন বন্যাকে কেন্দ্র ক'রে এ-অঞ্চলের নিরক্ষর পল্লীকবি যেসব গান রচনা করতেন সে-গান এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়ত। এখনো বয়স্ক কিছু মানুষের কণ্ঠে সে-গান শোনা যায়। এ-

গানে তখনকার দিনে বন্যার বিধ্বংসী চিত্র পাওয়া যায়। এ-অঞ্চলে সহজপুর গ্রামের দ্বিজ হরিপদ ১৩২০ সালের বন্যায় ভেঙে পড়া চালের ওপর ব'সেই গান রচনা করেছিলেন। বন্যায় নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের কেমন অবস্থা হ'য়েছিল তার কিছু সংকেত মেলে—

'বান দেখে প্রাণ চম্‌কে ওঠে ভয়ে বাঁচি না,
তাল খেয়ে কাল কেটে গেল চোঁয়া মুড়ি পেলে না।
বন্‌তির কয়রাপুর
এদের বুক করে দুর্‌দুর্‌
তোবা তাল্‌লা খেঁচিয়ে দিলে বল্লা, বলেরপুর,
তেয়াঁড়ুল আর মধুবন এদের মধু কিছু রাখলে না।
বোরো, দক্ষিণকুল
এরা ভয়েই আকুল
আস্তিকপুরের ভেতর দিয়ে ঢুকল আনগুণা।
মুগুরার বৈদ্যনাথ
জগতে বিখ্যাত
পলি না ধুলে কোথায় ফুল দেবে তার ঠিক পেলে না।
সহজপুরের জয়দুর্গা, রশুইখণ্ডের লোচনেশ্বর
এঁরা চক্ষু মেলেও চাইলে না।
প্রাণের ভয়েতে
ধরলে ভাসুরের হাতে
ডুব দিয়ে পার হ'য়ে যেয়ে লজ্জায় বাঁচে না।
পোয়াতি প্রসব হ'ল চালের উপরে
ধাত্রী অভাবে তার নাড়ী কাটা হ'ল না।
দ্বিজ হরিপদ কয়
ঘর-দুয়ার হ'ল লয়
চালের উপর বসি করি গানের রচনা।'

এরকম আরও অনেক গান আজও ছড়িয়ে আছে এ-অঞ্চলের বিরাট এলাকা জুড়ে। বাউল ফকিরের কণ্ঠে গান আগেকার দিনে প্রায়ই শোনা যেত। এখন আর তেমনটি শোনা যায় না

দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মানের পূর্বে এ-অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার তেমন ছিল না। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের খুব কম সংখ্যক মানুষের মধ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রচলন ছিল। তিন চারটি গ্রাম নিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এক-একটি থানার মধ্যে দু'তিনটি কোথাও বা চারটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় সাধারণ মানুষ তাঁদের ছেলেদের দূরবর্তী গ্রামের বিদ্যালয়ে

পড়াতে অক্ষম ছিলেন। ফলে শিক্ষালাভের সুযোগ সবার ভাগ্যে জোটেনি। যাত্রা-গান, কবিগান, লেটোগান, পালাকীর্তন প্রভৃতির আসরে মানুষ যেতেন এবং সেখান থেকে শিক্ষালাভ করতেন।

দুর্গাপুর ব্যারেজ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে সারাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিস্ফুলিংগ ছড়িয়ে পড়ে। নিম্ন-দামোদর অঞ্চলেও সংগ্রামের ব্যাপকতা দেখা গেছে। বিপ্লবী রাসবিহারী বোস এই অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। ব্রীটিশের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এ-অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ঐক্য ছিল। অঞ্চলটি বন্যাপীড়িত এলাকা ব'লে বিপ্লবীদের কাজকর্মের যথেষ্ট সুবিধা হ'ত।

রেডিও, সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রচলন তখনকার দিনে তেমন বেশি না থাকায় সাধারণ কর্মক্লান্ত মানুষ প্রতি সন্ধ্যায় বিশেষ বিশেষ স্থানে জমায়েত হ'তেন। কোথাও গান-বাজনা, কোথাও আলোচনা, কোথাও রামায়ণ-মহাভারত পাঠ আবার কোথাও লোক-কথা শোনার রেওয়াজ বা ঝোঁক প্রভূত দেখা যেত। গ্রামের বিশেষ কোন বয়স্ক পুরুষ বা বয়স্কা মহিলা লোক-কথা বলতেন আর শ্রোতারা তা শুনে আনন্দ পেতেন। অনেকে সেই গল্প শিখেও নিতেন। এইভাবে তখনকার দিনের লোক-কথাগুলি বিক্ষিপ্তভাবে আজও ছড়িয়ে আছে এ-অঞ্চলের সাধারণ অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত-নিরক্ষর মানুষের মধ্যে।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বলা যায় তখনকার দিনে এ-অঞ্চলের সাধারণ পল্লী-মানুষের মন ছিল সরল ও সাদাসিদে। জীবনযাত্রার সরল পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসিকতাও বজায় থাকত। অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও মনের সম্পদে এ-অঞ্চলের মানুষ ছিল সমৃদ্ধ।

এবার দুর্গাপুর ব্যারেজ হওয়ার পরে এ-অঞ্চলের পরিবর্তনের কথা কিছু আলোচনা করা যাক। স্বাধীনতার পরে দেশকে নতুনভাবে গ'ড়ে তোলবার জন্য সরকারীভাবে সারা দেশে বিভিন্ন পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া হ'ল। এরকম পরিকল্পনার মধ্যে দামোদর নদের ওপর ব্যারেজ প্রস্তুত একটি।

১৯৫০ সালে দুর্গাপুরে যে ব্যারেজ হ'ল তার উদ্দেশ্য অনেক। একটি হ'চ্ছে দামোদরের বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করা, আর একটি হ'ল জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সেই বিদ্যুৎকে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো। তাছাড়া ব্যারেজের জলকে সারা বৎসর বিভিন্ন ক্যানেলের মাধ্যমে নিম্নদামোদর এলাকায় সরবরাহ ক'রে পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন করা।

সুতরাং দুর্গাপুর ব্যারেজ প্রস্তুত হওয়ায় নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের প্রভূত পরিবর্তন ঘটে গেছে।

দামোদরের বন্যার আগেকার সেই ভয়ংকর এবং বিধ্বংসী রূপ আর নেই। গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুতে নদীতে জল থাকা বা না থাকা নির্ভর করে দুর্গাপুর ব্যারেজের নিয়ন্ত্রণের ওপর। দুর্গাপুরে জল ছাড়লে নদীর জল বাড়ে, আবার ব্যারেজের দরজা

বন্ধ করে দিলে নদীর জল কমে যায়। বিহারের উপত্যকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক হ'লে ব্যারেজকে রক্ষা করবার জন্য ব্যারেজের জল কমিয়ে দেওয়া হয়, তখন নদীর জল বাড়ে। নৌকা চলে। মানুষের নদী পারাপারে কিছু অসুবিধা হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সারা বৎসর নিম্ন-দামোদর এলাকার মানুষের অসুবিধা ব্যারেজ নির্মাণের পূর্বের মতো নেই। দামোদরেরও আজ আর তেমন খরস্রোত নেই—অনেকখানি সে শান্ত। ফলে নিম্ন-দামোদরে বালি জমে নদীর গভীরতা যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি বিভিন্ন স্থানে চড়াও পড়ছে। সেই নদী-চড়ে নানারকম রবিফলস উৎপন্ন হ'চ্ছে। দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নিম্ন-দামোদর এলাকার পল্লীতে পল্লীতে বাঁশের ছিটে বেড়া দেওয়া ঘরের সংখ্যা কমে সেখানে মাটির ভাল বাড়ী তৈরী হ'য়েছে। মানুষকে আর বর্ষাকালে অনিশ্চিত অবস্থায় ঘরে থাকতে হয় না অথবা বন্যার আতংকে সংসারের আসবাবপত্র নিয়ে ছুটোছুটি করতেও হয় না। ফলে মানুষের কাছে গৃহবাস অনেকখানি নিশ্চিত হ'য়ে উঠেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে,—বিগত বাং ১৩৮৫ সালের ১০ই আশ্বিন অতিবৃষ্টির ফলে দুর্গাপুর ব্যারেজের একাংশ ভেঙে যাওয়ায় দামোদরের দক্ষিণতীরে প্রবল বন্যা হয়। সে বন্যায় নিম্ন-দামোদর এলাকার প্রভূত ক্ষতি হ'য়েছিল। পরে অবশ্য ব্যারেজ সংস্কার করা হ'য়েছে এবং দামোদরের বন্যাকে পুনরায় সুনিয়ন্ত্রিত করা হ'য়েছে। ফলে নিম্ন-দামোদর এলাকার জন-জীবন ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হ'য়ে এসেছে।

দামোদরের বন্যা কমে যাওয়ায় এই এলাকায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হ'য়েছে এবং হ'চ্ছে। ফলে পল্লীতে পল্লীতে এবং শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হ'য়েছে। নিম্ন-দামোদর এলাকার পল্লীর বুকের ওপর দিয়ে এখন বাস, লরী, মোটর চলাচল করে। এই যোগাযোগ এ-অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংহতি এনে দিয়েছে। তদুপরি বর্ধমান, আরামবাগ প্রভৃতি ছোট খাটো সহরগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ায় চিকিৎসা, শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা লাভের সুযোগ হ'য়েছে। এই অঞ্চলের রায়না থানার দামুন্যা গ্রামটি কবিকঙ্কণের জন্মভূমি। রাঢ়ের এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-ধারার প্রতিচ্ছবি কবিকঙ্কণের কাব্যে উল্লেখ পাওয়া যায়—

'অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়॥'

বর্তমানে রাঢ়ের এই অঞ্চলের উক্ত অপবাদ অনেকখানি কেটেছে। দুর্গাপুর ব্যারেজের অবদান এ-ব্যাপারে যথেষ্ট—সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে দুর্গাপুর ব্যারেজের অবদান অনেক। নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। এখানের মাটি খুব উর্বর। ধান ছাড়া পাট, গম এবং অন্যান্য অনেক রবিফসল জন্মে। দুর্গাপুর ব্যারেজ হওয়ার আগে এ-অঞ্চলে বৎসরে মাত্র একবার ধান উৎপন্ন হ'ত। সেই আমন ধান আবার সব বৎসরে ভালভাবে পাওয়া যেত না। বন্যায় মাঠের ধানগাছ পচিয়ে দিত অথবা পলিচাপা

প'ড়ে ধান নষ্ট হ'য়ে যেত। ফলে অন্নের অভাব মাঝে মাঝে প্রকট হ'য়ে উঠত। এখন আর সে-ভয় তত নেই। আমন ধান ভালই জন্মায়। দুর্গাপুর ব্যারেজ কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ক্যানেলে জল সরবরাহের দরুণ বৎসরে দুবার কোথাও তিনবারও ধান হ'চ্ছে। দেশের অন্যান্য অংশের মতো উচ্চফলনশীল ধানের চাষও এ-অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সুরু হ'য়েছে। তবে এখন জমিতে সার দিতে হয়। পূর্বে পলিমাটিতে তরমুজ, কাঁকুর, ফুটি প্রচুর হ'ত। দামোদরের নিম্ন-অঞ্চলের তরমুজ এককালে বিখ্যাত ছিল। আজ আর তেমন ঐ ফসল হয় না। তবে পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, বেগুন, আলু এখনও ভাল হয়। চাষীরা পাকারাস্তার ধারে কোন বাজারে সে ফসল নিয়ে গিয়ে বিক্রী করেন সুতরাং ফসল উৎপন্নের দিক থেকে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'– একথা জানলেও আক্ষরিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বাংলার পল্লী-অঞ্চল দীর্ঘদিন প্রায় বঞ্চিত ছিল। আজও পল্লীর বুক থেকে নিরক্ষরতার অন্ধকারকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সরকারী প্রচেষ্টার বিরাম নেই। নিম্ন-দামোদর অঞ্চল আগে বন্যা-পীড়িত ছিল ব'লে রাস্তাঘাট ভাল ছিল না। যোগাযোগের অভাব ছিল। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তখন খুবই কম ছিল। বর্তমানে বন্যা না থাকায় রাস্তাঘাট হ'য়েছে, এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কিছু উন্নতিও ঘটেছে, সরকারী প্রচেষ্টাও আছে। ফলে গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং চার-পাঁচটি গ্রাম নিয়ে একটি ক'রে মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে। ছাত্র-সংখ্যাও বেড়েছে। শ্যামসুন্দর মহাবিদ্যালয় এই অঞ্চলেই অবস্থিত। রাস্তাঘাট প্রস্তুত হওয়ায় বহু ছাত্র-ছাত্রী এখন বাড়ী থেকে যাতায়াত করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে। মোটের ওপর শিক্ষার প্রসার বর্তমানে ভালর দিকেই - একথা বলা চলে।

জন-স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে বর্তমানে এই অঞ্চলে কয়েকটি সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। দামোদরের বন্যা বন্ধ হ'য়ে রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে ব'লেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সুবিধা হ'য়েছে এবং প্রয়োজনে সহরের বড় হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হ'য়েছে। বন্যা না হওয়ায় বর্ষায় অনেক রোগের উপদ্রবও বর্তমানে কমেছে। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর হারও কম হ'য়েছে। সরকারী চিকিৎসার সুযোগও হ'য়েছে। সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী ও সরকারী অন্যান্য বিভাগের কর্মীগণ বর্তমানে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এ-অঞ্চলের জনগণের অসুবিধার কথা শুনে তা' প্রতিকারের চেষ্টা করেন। দুর্গাপুর ব্যারেজ হওয়ার আগে যা সহজে সম্ভব হ'ত না।

এ-অঞ্চলের সামাজিক জীবনধারায় দুর্গাপুর ব্যারেজের প্রভাবও লক্ষ্য পড়ে। পূর্বে এ-অঞ্চল বন্যাপীড়িত ছিল ব'লে যোগাযোগের অভাবহেতু মানুষে মানুষে দেখা-সাক্ষাৎ কম হ'ত। সেজন্য জন-জীবনের সামাজিকতায় স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বিচ্ছিন্নতা ছিল। সুতরাং আলাপ-আলোচনা, আদান-প্রদানের বিস্তার ছিল সীমিত।

সামাজিক গণ্ডীও তাই সুবিস্তৃত ছিল না। বর্তমানে চেনা-জানা, আলাপ-পরিচয় সহজতর হ'য়ে ওঠায় সে-গণ্ডীর পরিধি নিঃসন্দেহে বেড়ে গেছে।

বর্তমানে লোক-উৎসবগুলির মধ্যে পৌষপার্বন, নবান্ন, গাজন, বারোয়ারী শীতলাপূজা, মেলা প্রভৃতি উৎসব উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। তবে সহরের সঙ্গে যোগাযোগ বেশি হওয়ায় উৎসবের আঙ্গিকে আধুনিকতার ছোপ নজরে পড়ে। তবুও বলা চলে বান-বন্যা কমে যাওয়ায় উৎসব-আনন্দের দিক থেকে এ-অঞ্চলের মানুষের সম্প্রীতির পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানুষে মানুষে মেলামেশা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ আসায় হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রীতি ও আদান-প্রদান বেড়েছে। সেই সঙ্গে এ-অঞ্চলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গোঁড়ামি বা রক্ষণশীল মনভাব অনেক শিথিল হ'য়ে প'ড়েছে।

বন্যার প্রকোপ কম হওয়ায় জনবসতির স্থায়িত্ব এসেছে বলেই অন্যান্য অঞ্চল থেকে মানুষ এসে এখানে বসতি আরম্ভ করেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে সাঁওতাল ও. বাউরী সম্প্রদায়ের লোকেরা জন-মজুরী করতে এসে এখানে বর্তমানে অনেকেই স্থায়ী-ভাবে বসবাস শুরু করে দিয়েছে। পূর্ববাংলা থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু খুব বেশি সংখ্যক না এলেও অনেকে এসেছেন। এ-অঞ্চলে বসবাস করে এখানের মানুষের সঙ্গে মিশে গেছেন ব'ললে—বাড়িয়ে বলা হবে না। সকলের মধ্যেই মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। দামোদর তীরবর্তী সহর বর্ধমান আধুনিক সভ্যতার আলোকে আগের তুলনায় উন্নত, এবং এই সহরের সঙ্গে নিম্ন-দামোদর এলাকার পল্লী-অঞ্চলগুলির যোগা-যোগ হওয়ার ফলে অনেক কিছুর উন্নতির সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে। দুর্গাপুরের পরিচিতি ঘটেছে শিল্প-নগরী হিসেবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মানুষের মধ্যে সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই অঞ্চলের লোক-কাহিনীর চরিত্রেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রথমতঃ আগের মতো লোক-কাহিনীর আর তেমন আলোচনা হয় না। যা' হয় তাও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বয়স্ক মানুষের মধ্যে। বর্ণনাকারীর ভাষারও পরিবর্তন হ'য়েছে। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অশিক্ষিত মানুষ শিক্ষিত বা মার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে কাহিনী বর্ণনায় মার্জিত ভাষা প্রয়োগ ক'রে থাকেন। কাহিনীর পরিবর্তন অপেক্ষা বলার ভঙ্গিতেই পরিবর্তন এসেছে বেশি। সামাজিক বিবর্তনই এ-পরিবর্তন এনে দিয়েছে ব'লেই ধারণা করা যেতে পারে। সুতরাং নিম্ন-দামোদর উপত্যকার মানুষের জীবন ধারায় বিবর্তন এসেছে অনিবার্য কারণেই,—একথা বলা চলে।

---

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (৩য় সং

২. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীনযুগ,

৩. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব,

নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের লোক-গল্প সংগ্রহ সম্পর্কে বক্তব্য

লোক-কথা বা লোক-গল্প, লোক-সংগীত, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদি ফোকলোর বা লোকশ্রুতির বিষয়গুলি সংগ্রহ-কাজে সংগ্রাহককে কতকগুলি দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়। সরজমিনে লোক-কথা সংগ্রহকালে যে-দিকগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা হ'য়েছে তা' সংক্ষেপে এই—(১) সংগ্রহের স্থান ও পরিবেশ, (২) সংগ্রহের তারিখ, (৩) বর্ণনাকারীর ঠিকানা, (৪) বয়স, (৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (৬) পেষা, (৭) মানসিক অবস্থা, (৮) আর্থিক সংগতি, (৯) বাচনভঙ্গি, (১০) বর্ণনাকারী কোথায় এবং কার কাছে কাহিনীটি শুনেছিলেন ইত্যাদি। এ-গুলির দিকে বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সরাসরি বর্ণনাকারীর কাছে তাঁর বাড়ীতে ব'সেই কাহিনীগুলি সংগৃহীত হ'য়েছে। তাছাড়া সংগ্রহকালে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হ'য়েছে যাতে বর্ণনাকারী যেন বুঝতে না পারেন, শ্রোতা কাহিনীটি সংগ্রহ ক'রছেন। মুগ্ধ শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থেকে এবং কাহিনীর গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে বর্ণনাকারীর উৎসাহকে বজায় রাখার দিকে খেয়াল রাখা হ'য়েছে। বর্ণনাকারীর মেজাজকে লক্ষ্য রেখেই কাহিনী সংগ্রহের তারিখ দেওয়া হ'লেও সময় দেওয়া হয়নি। কারণ লোক-কাহিনীর বর্ণনা এবং তা' শ্রবণ করার সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় সন্ধ্যার পরে। কাহিনীগুলি সে-পরিবেশেই সংগৃহীত হ'য়েছে। কারণ অধিকাংশ বর্ণনাকারী নিরক্ষর। কেউ কেউ খুব সামান্যই লেখাপড়া জানেন। এই সব পল্লীর সহজ-সরল মানুষ রাতে ছাড়া কাহিনী বলার সুযোগ ও সময় ক'রে উঠতে পারেন না। তাই দীর্ঘ সময় ধ'রে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের পল্লীর সাদাসিদে মানুষের কাছে এই কাহিনীগুলি সংগ্রহে খুবই পরিশ্রম ক'রতে হ'য়েছে, কিন্তু শ্রমের তুলনায় সাধারণ পল্লীমানুষের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে মিশে যে-আনন্দ পাওয়া গেছে তা'তে কষ্ট বা পরিশ্রমের ক্লান্তি ভুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হ'য়েছে।

বর্ণনাকারীর ভাষার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হ'য়েছে। তিনি যেমন যেমন কাহিনী-বর্ণনা ক'রেছেন, ঠিক সেরকমই রাখবার চেষ্টায় কোনরূপ ত্রুটি করা হয়নি। কাহিনী-গুলির প্রত্যেকটির সংগ্রহের তারিখ, বর্ণনাকারীর পরিচয় এবং শেষে মন্তব্য দেওয়া হ'য়েছে। বর্ণনাকারীর পরিচয়ের মধ্যে কাহিনীর উৎস সম্বন্ধেও বলা আছে। এ-ব্যাপারে যতটুকু পাওয়া সম্ভব হ'য়েছে ঠিক ততটুকুই দেওয়া হ'য়েছে।

'মন্তব্য' সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় প্রত্যেকটি কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা করা হ'য়েছে। বাংলাদেশের ও অন্যান্য অঞ্চলের সংগৃহীত কাহিনীর সঙ্গে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলে সংগৃহীত কাহিনীগুলির কোন মিল থাকলে তা' আলোচনা ক'রে

'মন্তব্যের' শেষে টীকায় উল্লেখ করা হ'য়েছে। এজন্য যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য নিতে হ'য়েছে সেগুলির নাম গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হ'ল। উপভাষার সন্ধান যেখানে যেটুকু পাওয়া গেছে তা পাদটীকায় দেওয়া হ'য়েছে।

কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনায় অধ্যাপক ষ্টীথ থম্পসনের প্রবর্তিত 'Index of Tale Types' ও Motif Index অনুসরণ করা হ'য়েছে। Motif বা অভিপ্রায়-গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টায় কোনরূপ অবহেলা করা হয়নি। তবে এ-কাজটি অত্যন্ত কঠিন। ষ্টীথ থম্পসনের শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত ব্যাপক। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবন ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র ক'রেই লোক-কথা আলোচনার জন্য এই টাইপ্ ও মটিফ্ ইন্ডেক্স পরিকল্পিত হ'য়েছে। লোক-কথার শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সুন্দর মন্তব্য ক'রেছেন—'…জাতির রস-সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত ইহার নিজস্ব রীতি। এই প্রণালীটি অনুসরণ করিলে লোক-কথা বর্ণনায় অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রকাশের পরিবর্তে ইহার রস-বিচার অব্যাহত থাকিতে পারে।'[১] তাই 'অহেতুক পাণ্ডিত্য' প্রদর্শনের দিকে ঝোঁক না দিয়ে অভিপ্রায়গুলিকে আলোচনা করা হ'য়েছে। দেশের ও বিদেশের বহু কাহিনী মিলে-মিশে নতুন নতুন কাহিনী তৈরী হ'য়েছে। কোথাও বা জটপাকিয়ে গেছে। এ-সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক মন্তব্য ক'রেছেন—'অনেক বিচিত্র ও ভিন্নধর্মী কাহিনী একত্র সন্নিবেশিত হ'য়ে যুগে যুগে বিচিত্র কলেবর কাহিনীর জন্ম দিয়েছে।'[২] এই বিচিত্র কাহিনীগুলিকে যথাযথ ধ'রে রাখার প্রচেষ্টার প্রতিই নজর দেওয়া হ'য়েছে বেশি। কাহিনী শুনতে শুনতে অনেক সময় কাহিনীর গতি প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে রেভাঃ লাল-বিহারীদে-র মন্তব্য মনে প'ড়েছে—'…the tail of one story being joined to the head of another, and the head of a third to the tail of a fourth.'[৩] কিন্তু বর্ণনাকারীর চমৎকার বাচনভঙ্গি কাহিনীকে বিশেষ মর্যাদায় পূর্ণত্ব দান ক'রেছে। আরও মনে হ'য়েছে পল্লীর সাধারণ সহজ-সরল মানুষের মধ্যে লোক-সাহিত্যের কত মূল্যবান সম্পদ ছড়িয়ে আছে। সেই মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহের টানে নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে দীর্ঘদিন ঘুরতে হ'য়েছে। এ-অঞ্চলেই বর্তমান সংগ্রাহকের জন্মভূমি ও কর্মস্থল। তাই বর্ষা বাদল, রাতের অন্ধকার, সাপ-খোপের ভয় সবকিছুই উপেক্ষা ক'রে এ-কাজ করতে হ'য়েছে। গ্রামের সরল মানুষ কাহিনী শোনাতে বিরক্ত-বোধ করেন নি বরং উৎসাহের সঙ্গেই তা' শুনিয়েছেন। তবে গরীব মানুষের মাটির বাড়ীতে হারিকেন বা লম্পর আলোর সামনে ব'সে কাহিনী শুনতে শুনতে মনে হ'য়েছে আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যে থেকেও মনের সম্পদে এঁরা অনেক সমৃদ্ধ।

এ-গ্রন্থের লোক-গল্পগুলি যেখান থেকে সংগৃহীত হ'য়েছে তার আঞ্চলিক সীমা—নিম্ন-দামোদরের দক্ষিণ-তীরে রায়না, জামালপুর ও খণ্ডঘোষ থানা। এ-অঞ্চল বর্ধমান জেলার ও দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত।

নিম্ন-দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের লোক-কাহিনীর সংগ্রহ, আলোচনা ও গবেষণার

কাজে দীর্ঘদিন নির্দেশ ও উৎসাহ দান ক'রেছেন পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়। তাঁর পৈতৃক বাসভূমি রায়না থানার গোতান গ্রামে।

শ্রদ্ধেয় ডঃ সেনের অফুরন্ত স্নেহ লাভ করে নিজে যেমন ধন্য হ'য়েছি তেমনি তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টা না থাকলে আমার পক্ষে শুধু লোক-গল্প নয়, লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়েও গবেষণা করা অসম্ভব ছিল—একথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। এই দেশবরেণ্য আচার্যের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন ক'রে গল্প-সংগ্রহ সম্পর্কে বক্তব্য শেষ করছি।

---

১. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সাহিত্য,

২. ডঃ মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি···,

৩. Rev. Lalbehari Dey, Folk-Tales of Bengal (1883), Mac. & Co, London, Preface P. Viii.

পাথর আর লাঠি

কোনো গাঁয়ে এক গরীব বামুন ছিল। বামুনের দু'চার জন শিষ্য ছিল। শিষ্যদের বাড়ী থেকে কিছু বৃত্তি পেতো। আর দু'এক ঘরে পুজোটুজো ক'রে অতি কষ্টে তার দিন চ'লত।

এমনি ভাবে চ'লতে চ'লতে এমন এক সময় এল—যখন বামুনের দিন আর চলে না। অভাব-অনটনের জ্বালা সহ্য ক'রতে না পেরে বামুন মনে মনে ভাবলে—বেঁচে আর লাভ নেই, এরকম অভাবের যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে আমার মরণই ভাল। এই ভেবে সে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়ল।

পথে যেতে যেতে খিদের জ্বালায় আলান্ত হ'য়ে এক গাছতলায় ব'সে প'ড়ল। ব'সে ব'সে শিব আর দুগ্‌গাকে ডাকতে লাগল। ব'লতে লাগল—'বাবা তারকনাথ, বাবা বিশ্বনাথ, হে মা দুগ্‌গা, আমার পেটের জ্বালা আমি তো আর সহ্য করতে পাচ্ছি না!'

ঐ সময় আকাশ দিয়ে শিব আর দুগ্‌গা উড়ে উড়ে যাচ্ছিলেন। বামুনের কান্নার শব্দ মা দুগ্‌গার কানে গেল। দুগ্‌গা শিবকে ব'ললেন, 'ওগো শুনছো, আমাদের এক ভক্ত যে ডাকাডাকি করছে। তুমি একবার চলো ওর কাছে।' শিব বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন, 'আরে দুর্, এরকম কত ভক্ত বিপদে প'ড়ে ডাকাডাকি করেই থাকে। পথের মাঝে বাজে সব ঝামেলা করো কেন? এ জন্যেই বলে—মেয়েছেলে নিয়ে পথে বেরুতে নেই। যে কাঁদছে কাঁদুক, আমাদের চলো।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুগ্‌গা আবার ব'ললেন, 'ওগো শুনছো, বামুন যে বড্ড ডাকাডাকি করছে। লোকটা হয়ত মরে যাবে। চলোই না একবার ওর কাছে।'

বারবার দুগ্‌গার অনুরোধে শিব বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন, 'ঘ্যান্-ঘ্যানানি আর সহ্য হয় না। চলো, দেখি তোমার বামুন কী ব'লছে?' এই ব'লে শিব দুগ্‌গাকে সঙ্গে নিয়ে গাছতলায় সেই বামুনের কাছে এসে হাজির হলেন। দুগ্‌গাকে শিব ব'ললেন, 'যা' জিজ্ঞেস করার তুমিই করো। আমার মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করছে। আমি একটু তফাতে অপেক্ষা করছি।' বামুনের কাছে এসে দুগ্‌গা বললেন, 'কী হ'য়েছে বাবা, অমন ছট্‌ফট্ করছো কেন?'

বামুন কাঁদতে কাঁদতে তার অভাব—অনটনের কথা ব'ললে। সব শুনে মা দুগ্‌গা সেই বামুনকে একটা ছোট পাথরের ফলা দিলেন। পাথরের ফলাটার ওপর লেখা ছিল—'ফল, পাথর ফল'। দুর্গা বামুনকে ব'লে দিলেন, 'যখন তোমার কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে তখন এই পাথরটার কাছে 'ফল, পাথর ফল' একথা ব'ললেই তুমি তা পাবে। যদি কথাটা ভুলে যাও তাই পাথরটার গায়ে লেখাও রইল।' তারপর শিব আর দুগ্‌গা সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

পাথর-ফলা পেয়ে বামুনের খুবই আনন্দ। ফল-টল, মিষ্টি-টিষ্টি যখন যা দরকার হ'তে লাগল তখনি বামুন সেই পাথরটার কাছে মনে মনে 'ফল, পাথর ফল' ব'লতেই তা' পেতে লাগল। বামুনের অভাব আর রইল না।

একদিন বামুন তার এক শিষ্যবাড়ি গেছে। সঙ্গে থলের মধ্যে সেই পাথরের ফলা। শিষ্য গুরুকে খুব যত্ন করছে। শিষ্যকে খাবার ব্যবস্থা করতে দেখে বামুন ব'ললে, 'না বাবা, আমার খাবার আয়োজন তোমাকে করতে হবে না। সে আমি নিজেই ক'রে নোব।' শিষ্য অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'সেকি গুরুদেব, তা' কি হয়? আমার বাড়িতে এসেছেন—তা' আমি হ'তে দোব না।'

বামুন হেসে শিষ্যকে ব'ললে, 'আরে ব্যাটা, এই দেখ্।'—এই ব'লে থলে থেকে পাথর ফলাটা বার করলে। মনে মনে অনেক ভাল খাবারের কথা চিন্তা করে—'ফল, পাথর ফল' ব'লতেই একরাশ খাবার বামুনের সামনে। তা দেখে শিষ্য তো অবাক; সেখানে যারা ছিল এ খাবার তাদের সবাইকেই বামুন দিলে। নিজেও খেলে।

শিষ্য সব দেখে মনে মনে গুরুদেবের পাথরের কথা চিন্তা করতে লাগল। রাতে তার ঘুমই হ'ল না।

ওদিকে রাতে খেয়েদেয়ে বামুন ভোঁ ভোঁ শব্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। শিষ্য নিজের ঘর ছেড়ে পা টিপে টিপে গুরুদেবের বিছানার পাশে যেয়ে দেখলে—গুরুদেব গভীর ঘুমে অচেতন। সে বামুনের থলে থেকে পাথরটা চুরি ক'রে নিলে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বামুন দেখলে তার পাথর নেই—চুরি হ'য়ে গেছে। মনের দুঃখে শিষ্যবাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার সেই গাছতলায় যেয়ে ব'সে ব'সে কাঁদতে লাগল, আর শিবদুর্গাকে ডাকতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দুর্গা এলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিব এলেন।

বামুনের পাথর হারানোর সব কথা শুনে রাগে শিব দুর্গাকে বললেন, 'যার তার ওপর দয়া দেখাতে যাও কেন বল দিকিন্? তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

দুর্গাও একটু রেগে ব'ললেন, 'কেন, তা'তে হ'য়েছেটা কী?'

শিব বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন, 'কী হ'য়েছে শুনতেই তো পেলে। মেয়ে-ছেলের কাজের কোন দাম আছে? না, এবার দেখছি আমাকেই ব্যবস্থাটা করতে হবে।'

দুর্গা ব'ললেন, 'বেশ, কী করবে করো।'

শিব তখন সেই বামুনকে হাত দেড়েক একটা খেঁটে দিলেন। চমৎকার লাঠি। লাঠিটার মাথা সোনা দিয়ে বাঁধানো। তা'তে বেশ বড় বড় ক'রে লেখা আছে 'মার, লাঠি মার'। আর লাঠির ডগায় খুব ছোট্ট ক'রে লেখা আছে, 'থাম, লাঠি থাম'। এ-লেখা সহজে কারো নজরে পড়বে না। শিব বামুনকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। ব'ললেন, 'লাঠির যে লেখা যখনই যে-কেউ প'ড়বে, লাঠি তাই করবে।'

বামুনকে লাঠি দিয়ে শিব-দুর্গা চ'লে গেলেন। লাঠি নিয়ে বামুন অনেক

কিছু ভাবতে ভাবতে আবার সেই শিষ্যের বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল। বামুনকে দেখে শিষ্য বললে, 'গুরুদেব, আবার কী মনে করে এলেন?' বামুন বললে, 'এই এনু একবার।'

শিষ্য তার গুরুদেবকে যত্ন-আত্তি ক'রে বসালে। বামুন বিছানার ওপর বসে লাঠিটা পাশে রেখে দিলে। শিষ্যের নজরে প'ড়ল। সে লাঠিটা হাতে নিয়ে বললে, 'বাঃ, বেশ চমৎকার লাঠি তো; মাথাটা ভারি সুন্দর। আবার লেখাও রয়েছে—'মার, লাঠি মার'।' যেই একথা বলা অমনি লাঠিটা ধরা-ধম্ ধরা-ধম্ শব্দে শিষ্যের পিঠে, মাথায় পড়তে লাগল। 'বাবারে, মারে, মরে গেনুরে' ব'লে শিষ্য চীৎকার করতে লাগল। লাঠি আর থামেনা। দুড়দাড়্ ঘা প'ড়েই যায়। গুরুদেবের পায়ে এসে শিষ্য পড়ল। ব'ললে, লাঠি থামান, বাবা।' বামুন বললে, 'আমার সেই পাথরটা বার ক'রে দাও, নাহলে লাঠি থামাবো না।'

মারের চোটে 'বাবাগো, মাগো, দিচ্ছি গো, দিচ্ছি গো' ব'লতে ব'লতে শিষ্য পাথর বার করে দিতেই বামুন লাঠির কাছে যেয়ে আস্তে করে বললে, 'থাম, লাঠি থাম'। লাঠি থেমে গেল। পাথর আর লাঠি নিয়ে বামুন শিষ্য বাড়ি থেকে নিজের গাঁয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এলো।

পাথরের গুণে অল্পদিনের মধ্যে বামুন বিরাট ধনী হ'য়ে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ি। বহু লোকজন। তার নামও ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বামুন খুব বড়লোক হ'য়েছে শুনে ঐ দেশের রাজার খুব হিংসে হ'ল। রাজা তার লোক দিয়ে বামুনকে একদিন রাজবাড়িতে ধরে আনলে। পরের দিন সকালে রাজবাড়ির পাশে চণ্ডী-মন্দিরের সামনে বলি দেবার হুকুম দিলে রাজা। বহু লোকজন নরবলি দেখতে এলো। রাজা মন্ত্রী সবাই উপস্থিত। বামুনকে যখনই বলি দেবার জন্য মন্দিরের সামনে দাঁড় করানো হ'ল তখন তার বগলে সেই লাঠি। বামুন জোড় হাত করে রাজাকে বললে, 'মহারাজ, মরবার আগে মা চণ্ডীকে আমি একবার পেননাম করতে চাই।'

রাজা বলল, 'তা তুমি করতে পার।'

রাজার অনুমতি পেয়ে বামুন লাঠিটা পাশে রেখে ভূমিষ্ট হ'য়ে অনেকক্ষণ ধ'রে মা চণ্ডীকে পেননাম করলে। এই সময় বামুনের লাঠিটা অনেকের নজরে পড়ল। একজন ব'ললে, 'রাজামশাই, দেখুন, দেখুন, ব্যাটা বামুনের লাঠিটা কি সুন্দর!'

রাজা একটু এগিয়ে যেয়ে লাঠিটা দেখে ব'ললে, 'তাই তো বটে; লাঠিটার মাথায় আবার লেখাও রয়েছে দেখছি—'মার লাঠি মার'।' যেই একথা বলা অমনি রাজার ওপর লাঠির ঘা পড়তে লাগল ধরা-ধাম্ ধরা-ধাম্। লাঠির ঘায়ে রাজা চীৎকার করতে করতে বামুনকে বললে, 'তোমার লাঠি থামাও। কোন ক্ষতি করবো না তোমার। তোমাকে অনেক টাকাকড়ি দোব।'

বামুন রাজাকে ব'ললে 'এই চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে সব বলছো, মনে রেখো।'

রাজা ব'ললে, 'হ্যাঁ, তুমি লাঠি থামাও।'

বামুন লাঠির কাছে যেয়ে আস্তে ক'রে ব'ললে, 'থাম, লাঠি থাম।'

লাঠি থেমে গেল। রাজা বাঁচল।

তারপর রাজা বামুনকে প্রচুর টাকাকড়ি দিলে। পাথর, লাঠি আর টাকাকড়ি নিয়ে বামুন বাড়ি ফিরে গেল এবং সুখে বাস করতে লাগল।

—০—

শালপুন রাজার স্বপ্ন

কোন দেশে শালপুন নামে এক রাজা ছিল। শালপুন রাজার কোন ছেলে-পিলে ছিল না। এজন্যে রাজার মনে খুবই অশান্তি। খাওয়া-দাওয়ায়, কাজকর্মে, চলাফেরায় সবসময়েই রাজা মনমরা হ'য়ে থাকত।

একদিন মন্ত্রী রাজাকে বললে, 'রাজামশাই, আপনার কি কোন অসুখ-বিসুখ ক'রেছে?'

রাজা ব'ললে, 'কেন বলুন তো?'

মন্ত্রী ব'ললে, 'আপনাকে রোগা রোগা লাগছে। মুখে হাসি নেই। মনটাও যেন ভারি ভারি হ'য়ে আছে। কী হ'য়েছে আপনার?' মন্ত্রীর কথার জবাব সেদিন আর শালপুন রাজা দিলে না। চুপ ক'রে রইল।

পরের দিন মন্ত্রী রাজাকে আবার ঐ একই প্রশ্ন করলে। রাজা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললে, 'কী আর ব'লবো মন্ত্রী, আমার এই বিশাল সম্পত্তি কে ভোগ ক'রবে? আমার তো কোন সন্তান হ'ল না! তাই সব সময় ভাবি—এসব কী হবে!' মন্ত্রী রাজাকে ব'ললে, 'এজন্যেই আপনার এত অশান্তি? তা অবশ্য হবারই কথা। আপনি এক কাজ করুন মহারাজ। আবার আপনি বিবাহ করুন।'

শালপুন রাজা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ব'ললে, 'আমার তো স্ত্রী আছে। তার কি মত হবে?'

মন্ত্রী ব'ললে, 'আপনি রাণীমার সম্মতি নিয়েই বিবাহ করুন। বুঝিয়ে ব'ললে নিশ্চয়ই রাজি হবেন।'

মন্ত্রীর কথায় শালপুন রাজা রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর রাণীকে ব'ললে, 'ওগো শুনছো, এই বিশাল ধন-সম্পত্তি আর রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে মন্ত্রী আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রতে ব'লছে। তোমার কী মত তুমি বল।'

একথা শুনে রাণী কিছুক্ষণ রাজার মুখের পানে চেয়ে রইল। তারপর রাজাকে ব'ললে, 'আমাদের দু'জনেরই বয়স হয়েছে। এই বয়সে বিবাহ ক'রলে তোমার যে আবার সন্তান হবে এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় না। আচ্ছা, আমার মতামত আমি দিন দু'য়েক বাদে জানাবো।'

পরেরদিন রাজা মন্ত্রীকে রাণীর বক্তব্য জানালে। মন্ত্রী ব'ললে 'মহারাজ, যেন ভুলে যাবেন না। ঠিক দুদিন পরে আপনি রাণীমার মতামত অবশ্যই জেনে নেবেন।'

শালপুন রাজা দু'দিন অপেক্ষা ক'রলে। তারপর রাতে রাণীকে ব'ললে, 'কই গো, তোমার মতামত আজ জানতে পারবো?'

'রাণী ব'ললে, 'আমার মত আছে। তুমি বিবাহ ক'রতে পার।' রাজা মনে মনে কিছু খুশি হ'য়ে ব'ললে, 'তুমি আবার ঠাট্টা ক'রছো না তো?'

রাণী ব'ললে, 'ঠাট্টা ক'রবো কেন ? তবে কমবয়সী মেয়েকে বিয়ে ক'রতে হবে। তা হ'লে হয়ত সন্তানাদি হ'তেও পারে। আর একটি শর্ত আছে আমার।'

রাজা জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কী তোমার শর্ত ?'

রাণী ব'ললে, 'তোমার বিবাহের পরে যখন এবাড়িতে নতুন রাণী আসবে তখন আমি এ বাড়িতেই যেন থাকতে পাই। আমার বাসস্থান যেন ঐ ঘোড়াশালে না হয়। এমন কথা তুমি আমাকে দাও।'

রাজা জিব্ কেটে ব'ললে, 'ছি ছি, কী সব ব'লছো তুমি ! চিরকাল যেমন ভাবে আছ ঠিক তেমনি অন্দর মহলেই তুমি থাকবে। তোমার কোন অসুবিধে আমি হ'তে দোব না।'

রাণীর অনুমতি পেয়ে পরেরদিন রাজা মন্ত্রীকে সব ব'ললে। রাজার কথা শুনে মন্ত্রী ব'ললে, 'মহারাজ, আমি তাহ'লে চারদিকে ঘটক পাঠিয়ে দিই ? তারা সন্ধান এনে দিলে পর মেয়ে দেখা। তারপর দিনস্থির করা হবে।' রাজা মন্ত্রীকে ব'ললে, 'তাই করুন মন্ত্রী, আপনার পরামর্শ মতোই সব কাজ হোক।'

মন্ত্রী সন্ধান ক'রে গরীব ঘরের একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে রাজার বিবাহ স্থির ক'রলে।

বুড়ো বর শুনে মেয়েটি প্রথমে রাজি হয়নি। শেষে বাবার সংসারের কষ্ট ঘুচবে জেনে রাজি হ'ল। তার সঙ্গে রাজার বিয়ে হ'য়ে গেল।

সতীনকে দেখে বড়রাণী খুশিই হ'লো। তারা দু'জনে দুটি পাশাপাশি ঘরে বাস ক'রতে থাকল।

কিছুদিন পরে ছোটরাণীর পেটে ছেলে এল। বড়রাণী, রাজা সবাই খুব খুশি।

যথাসময়ে ছোটরাণী একটি টুকটুকে ফর্সা সুন্দর বেটাছেলে প্রসব ক'রলে।

পুত্র-সন্তান লাভ ক'রে রাজার আনন্দ হ'ল খুব। রাজবাড়িতে আবার আনন্দ-উৎসব শুরু হ'য়ে গেল। রাজপুত্রের অন্নপ্রাশনে বহু লোকজন এসে রাজবাড়িতে খেয়ে গেল। তারপর একদিন ছোটরাণীকে ডেকে বড়রাণী ব'ললে, 'তোর ছেলেকে এনে দে। আমি তাকে একবার কোলে করি।' ছেলে তখন ঘুমোচ্ছিল। ছোটরাণী ঘুমন্ত ছেলেকে নিয়ে এসে বড়রাণীর কোলে দিলে। বড়রাণী ছেলেকে কোলে তুলে অনেক চুমু খেলে। আর আশীর্ব্বাদ ক'রলে। ছোটরাণী দাঁড়িয়ে সব দেখলে।

রাতে ছোটরাণী রাজাকে ব'ললে, 'দেখ, আজ আমার ছেলেকে দিদির কোলে দিয়েছিনু।'

রাজা ব'ললে, 'বেশ, বেশ। ভালই ক'রেছ।'

ছোটরাণী ব'ললে, 'কিন্তু আমাদের ছেলের দিকে দিদি এমন তাকাচ্ছিল, আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছিল।'

রাজা বললে, 'কী মনে হ'চ্ছিল তোমার ?'

ছোটরাণী বললে, 'মনে হ'চ্ছিল, 'দিদির দৃষ্টিতে আমার ছেলের ক্ষতি হবে।'

রাজা ব'ললে, 'ছি ছি, ও কথা মুখে এনো না। আর যেন ও কথা ব'লনা কোনদিন।'

ছোটরাণী কিন্তু চুপ ক'রলে না। ব'ললে, 'আমার কিন্তু মন ব'লছে,--হিংসেয় হয়ত দিদি কোন্‌দিন আমার ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে।'

শালপুন রাজা অবাক হ'য়ে ছোটরাণীর মুখের দিকে চাইলে। কিন্তু কোন কথা ব'লতে পারলে না।

ছোটরাণী ব'ললে, 'আমার ছেলেকে আলাদাভাবে রাখবার ব্যবস্থা করো। আমি কিছুতেই দিদির ধারে কাছে থাকবো না।'

রাজা ব'ললে, 'কী ব্যবস্থা ক'রতে পারি, বল।'

ছোটরাণী ব'ললে, 'আমি রাজবাড়িতে যেমন আছি তেমনি থাকবো। আর দিদিকে তুমি ঘোড়াশালের ওদিকটায় রাখবার ব্যবস্থা করো। যদি তুমি তা না করো তবে আমি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ি চ'লে যাবো। সেখানেই আমরা মা-বেটায় থাকবো।'

ছোটরাণীর কথা শুনে রাজা স্তম্ভিত। বিয়ের ঠিক আগে বড়রাণীর শর্তের কথা তার মনে প'ড়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে রাজা ছোটরাণীকে ব'ললে, 'কাল তোমাকে একথার জবাব দোব।'

পরের দিন ছোটরাণী সেকথা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিলে। রাজা মনে মনে ভীষণ ব্যথা পেলে। কিন্তু বাইরে প্রকাশ ক'রলে না। ছোটরাণীর কথা ঠেলতে না পেরে রাজা ঝিকে ডেকে পাঠালে। ঝি রাজার কাছে আসতেই রাজা তাকে ব'ললে, 'ঝি, তুমি বড়রাণীকে ব'লে এস—সে যেন ঘোড়াশালে বাস করবার জন্যে তৈরী হয়।'

ঝিয়ের মুখে সব শুনে বড়রাণী ঘোড়াশালে যাবার জন্যে তৈরী হ'তে লাগল।

দু' একদিন বাদে বড়রাণী ঘোড়াশালে চ'লেও গেল। সেখানে বড়রাণী খুব সাদাসিদে ভাবে দিন কাটাতে লাগল। আর নারায়ণের ধ্যানে রত রইল।

এদিকে রাজা ও ছোটরাণী ছেলেকে নিয়ে রাজবাড়িতে থাকে। ছোটরাণীর আরও তিনটি পুত্র-সন্তান হ'ল। রাজার চারটি ছেলে ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে উঠছে। তারা লেখাপড়াও শুরু ক'রেছে।

চার ছেলের বাপ হ'য়েও রাজার মনে শান্তি নেই।

একদিন শালপুন রাজা বড়রাণীকে খবর পাঠালে যে, রাজা পরের দিন সন্ধ্যেয় ঘোড়াশালে যাবে আর সেখানেই খেয়ে-দেয়ে রাত কাটাবে।

এই খবর পেয়ে বড়রাণী মনে মনে খুশি হ'য়ে ঝিকে ঘর-দুয়ার বেশ ক'রে পরিষ্কার ক'রতে ব'ললে। আর নিজে নানারকম খাবার তৈরী ক'রে রাখলে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রাজা বড়রাণীর কাছে গেল। যাবার আগে ছোটরাণীকে ব'লে গেল যে, বিশেষ কাজে তাকে এক রাত্তিরের জন্যে বাইরে যেতে হ'চ্ছে।

রাজা খুব গোপনে ঘোড়াশালে বড়রাণীর ঘরে যেতেই বড়রাণীর দু'চোখ জলে ভ'রে গেল। অনেকদিন পরে দু'জনের দেখা। রাজাও কাঁদে, রাণীও কাঁদে। এভাবে কিছুক্ষণ গেল। তারপর বড়রাণী স্বামীকে পরিবেশন ক'রে নানা রকম খাবার খাওয়ালে।

রাজা তৃপ্তি ক'রে খেতে খেতে বড়রাণীকে ব'ললে, 'জানো, এমন ক'রে অনেক দিন আমাকে কেউ খাওয়ায়নি।'

খাওয়া-দাওয়ার শেষে দু'জনে গল্প-গুজবে রাত কাটালে। ভোর ভোর উঠে রাজা রাজবাড়িতে চ'লে গেল। আর বড়রাণীও বিছানা ছেড়ে উঠে স্নান সেরে নারায়ণের পুজো ক'রলে।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। বড়রাণী একটি অপূর্ব সুন্দর পুত্র-সন্তান প্রসব ক'রলে। এ খবর এককান দু'কান ক'রে রাজার কানেও পৌঁছে গেল। রাজার মনে খুবই আনন্দ হ'ল। ছোটরাণী রাজাকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'বড়রাণীর ছেলে হ'য়েছে শুনছি। কী ব্যাপার বলতো ?'

রাজা একটু গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, 'বড়রাণী নারায়ণের পুজো করে। তাই হয়ত তিনি অনুগ্রহ ক'রে তাকে সন্তান দিয়েছেন।'

ছোটরাণী আর কিছু ব'লতে সাহস ক'রলে না।

নারায়ণের অনুগ্রহেই তার সন্তান হ'য়েছে ভেবে বড়রাণী ছেলের নাম রাখলে—'নারায়ণ'।

দেখতে দেখতে নারায়ণ বড় হ'য়ে উঠল। পাঠশালায় লেখাপড়া ক'রতে লাগল। নারায়ণ জানত না যে রাজাই তার বাবা। আর সে রাজপুত্র।

কিন্তু একথা কি আর বেশীদিন চাপা থাকে ? ক্রমে ক্রমে নারায়ণ জানতে পারলে সে রাজার ছেলে। এবং তার মা রাজার বড়রাণী।

একদিন সে তার মাকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'মা, আমি এই রাজারই ছেলে ?'

মা ব'ললে, 'ওসব মিথ্যে কথা। তোর বাবা নেই।'

নারায়ণ মাকে আর কোন কথা ব'ললে না।

এদিকে শালপুন রাজা প্রতিদিন রাতে স্বপ্ন দেখে—কে যেন তাকে ডেকে ব'লছে,—

'ওহে শালপুন রাজা,
প্রাণ যায়, প্রাণ রক্ষে কর।
আমাকে বাঘে খেলে।
রুপোর গুঁড়ি, সোনার ডাল,
হীরের পাতা, মুক্তো ফল।
ময়ূরে নৃত্য ক'রছে
রাক্ষসী ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

প্রতিদিন রাতে রাজা ঐ একই স্বপ্ন দেখে। ছ' মাস কেটে গেল। রাজা মন্ত্রীকে একদিন স্বপ্নের কথা ব'ললে। 'ওসব বাজে স্বপ্ন' ব'লে মন্ত্রী উড়িয়ে দিলে।

রাজা কিন্তু জেদ ছাড়লে না। রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা ক'রে দিতে ব'ললে,— যে রাজার স্বপ্ন ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে অথবা দেখিয়ে দিতে পারবে তা'কে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। রাজার একথা মন্ত্রীর পছন্দ হ'ল না। মন্ত্রী রাজাকে ব'ললে, 'আপনার তো চার চারটে উপযুক্ত ছেলে আছে। আপনি আগে তাদের ডেকে জিজ্ঞেসা করুন। তারা না পারলে তখন ঘোষণা দেওয়া হবে।' মন্ত্রীর যুক্তিতে রাজা তার চার ছেলেকে ডেকে পাঠালে। ছেলেরাও বাবার সামনে এসে হাজির হ'ল।

রাজা ছেলেদের ব'ললে, 'আমি প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি—কে যেন বলছে,—

'ওহে শালপুন রাজা,
প্রাণ যায়, প্রাণ রক্ষে কর।
আমাকে বাঘে খেলে।
রুপোর গুঁড়ি, সোনার ডাল,
হীরের পাতা, মুক্তো ফল।
ময়ূরে নৃত্য ক'রছে,
রাক্ষসী ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

এই স্বপ্নের অর্থ যে আমাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে আমি তাকে পুরস্কৃত ক'রবো।'

রাজার স্বপ্নের কথা শুনে চারজন ছেলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে ব'ললে, 'আমরাই আপনার স্বপ্নের ঘটনা চোখে দেখাবো। তবে আমরা জাহাজে ক'রে বিদেশে যাবো। আপনি তার ব্যবস্থা ক'রে দিন।'

ছেলেদের কথায় রাজা নৌকোযাত্রার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলে। ছোটরাণীর চার ছেলে জাহাজে ক'রে লোকজন নিয়ে সমুদ্রে যাত্রা ক'রলে।

একদিন পরে বড়রাণীর ছেলে নারায়ণ লোকমুখে এখবর শুনে রাজার কাছে যেয়ে ব'ললে, 'বাবা, দাদারা কোথায় গেছে?'

রাজা বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে, 'তুই যা এখান থেকে।' কাঁদতে কাঁদতে নারায়ণ মায়ের কাছে ফিরে গেল। মা শুনে ব'ললে, 'না, ওখানে যাবি না। তোর বাবা নেই।'

পরের দিন নারায়ণ আবার রাজার কাছে গেল। যেয়ে ব'ললে, 'বাবা, আমি আপনার স্বপ্নের সত্য-সন্ধানে যাবো।' রাজা রেগে নারায়ণকে বকাবকি ক'রতে লাগল। পাশেই মন্ত্রী দাঁড়িয়ে দু'জনের কথাবার্তা শুনছিল।

মন্ত্রী রাজাকে ব'ললে, 'মহারাজ, নারায়ণও তো আপনারই ছেলে। ও' যদি বিদেশে যেতে চায় তবে ওকে যেতেই দিন না।'

রাজা ব'ললে, 'ও' মায়ের এক ছেলে। ও' গেলে ওর মায়ের খুব কষ্ট হবে। ওর মা যদি বলে তবে ও' যেতে পারে।'

মন্ত্রী ব'ললে, 'তা ঠিক।'

তারপর মায়ের অনুমতি নিয়ে নারায়ণ রাজার কাছে যেয়ে ব'ললে, 'মা আমাকে বিদেশে যেতে অনুমতি দিয়েছে। আপনি ব্যবস্থা ক'রে দিলেই আমি যেতে পারি।'

রাজা ব'ললে, 'বেশ। তোমার কী চাই বল।'

নারায়ণ ব'ললে, 'একটা দু'হাজারমনী নৌকো, বত্রিশ জন দাঁড়ী, চৌত্রিশ খানা ধারাল তরবারি আর ষোল বছরের রসদ আমাকে দিতে হবে।'

এ খবর শুনে রাজা বিরক্ত হ'ল। মন্ত্রী বুঝিয়ে দিতে রাজা রাজি হ'ল। মন্ত্রী সব জোগাড় ক'রে দিলে। নারায়ণ নৌকোয় উঠল। নৌকো ছাড়া হ'ল।

ষোলজন ক'রে বত্রিশ জন দাঁড়ী নৌকোর দু'ধারে দাঁড় টানতে লাগল। তীরবেগে নৌকো সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছুটে চ'লল।

দিনের পর দিন যেতে যেতে নৌকো একদিন এক রাজ্যে এসে পে'ছিল। লোককে জিজ্ঞেসা ক'রে নারায়ণ জানতে পারলে যে, সে-রাজ্যের নাম কর্ণাট। আর দেখতে পেলে তারই চার দাদা আগেই কর্ণাট রাজ্যে এসে হাজির হ'য়েছে।

বিরাট নৌকো থেকে নারায়ণকে তীরে নামতে দেখে দাদারা ব'ললে, 'নারাণ, তুই এখানে কিজন্যে এলি ?'

নারায়ণ ব'ললে, 'বাবার স্বপ্নের সত্য-সন্ধানে আমি বেরিয়েছি। তোমরা সন্ধান কিছু পেলে ?'

তারা ব'ললে, 'এই শহরেই আমরা বাবার স্বপ্নের সত্য-সন্ধান পেয়ে গেছি।'

নারায়ণের কিন্তু দাদাদের কথায় বিশ্বাস হ'ল না।

পরের দিন নারায়ণ কর্ণাট রাজ্য থেকে আবার নৌকো ছেড়ে দিলে। বহুদূর যাবার পর দাঁড়ীরা কোন কূল দেখতে না পেয়ে ভয় খেয়ে গেল। তারা খুব ক্লান্তও হ'য়েছিল। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দাঁড়ীদের নারায়ণ ঠাণ্ডা রেখে দিলে।

একদিন তারা সমুদ্রের মাঝে একটা 'দাঁড়া' দেখলে। মাঝিরা সমুদ্রের সেই নতুন দাঁড়া দিয়ে নৌকো চালালে। যেতে যেতে ভোর হ'য়ে এলে আবছা আলোয় সবাই দেখলে নৌকো তীরে এসে ঠেকেছে। তীরের লাগোয়া বিরাট এক গভীর জঙ্গল।

নৌকো থেকে নারায়ণ লক্ষ্য ক'রলে, এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে জঙ্গল থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে স্নান ক'রলে। তারপর কমণ্ডলুতে জল ভ'রে নিয়ে ভিজে কাপড়ে আবার দ্রুত পায়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

নৌকো তীরে নঙ্গর ক'রতেই নারায়ণ তলোয়ার নিয়ে নৌকো থেকে নেমে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু মেয়েটির কোন সন্ধান পেলে না। নারায়ণ নৌকোয় ফিরে এল। মাঝিদের ব'ললে, 'সামনে যে বড় জঙ্গল দেখছি নিশ্চয়ই এখানে বাঘ ভালুক

থাকে। তোমরা তীর থেকে অন্ততঃ পঁচিশ হাত দূরে সব সময় নৌকো নঙ্গর ক'রে রাখবে।'

মাঝিরা তাই ক'রলে।

সারাদিন আনন্দ ক'রে খেয়ে-দেয়ে মাঝিরা রাতে সবাই ঘুমিয়ে প'ড়ল।

খুব ভোর ভোর উঠে নারায়ণ নৌকো থেকেই দেখতে পেলে, সেই মেয়েটি আবার জঙ্গল থেকে এসে স্নান ক'রছে। স্নান সেরে কমণ্ডলুতে জল ভ'রে আবার বনের দিকে যাচ্ছে। নারায়ণ আগের দিনের মতোই মেয়েটির পেছু পেছু চ'লল। যাবার সময় মাঝিদের ব'লে গেল, 'যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি ততক্ষণ তোমরা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রবে।'

ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে, বড় বড় গাছের আড়ালে আড়ালে এঁকে বেঁকে মেয়েটি জঙ্গলের পথ ধ'রে যাচ্ছে। আর পেছনে পেছনে নারায়ণও যাচ্ছে। যেতে যেতে শুকনো পাতার ওপর নারায়ণের পা প'ড়ে পাতাগুলো খড়মড় শব্দ ক'রে উঠল। শব্দ শুনে মেয়েটি পেছন পানে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ল। তারপর নারায়ণকে দেখে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কে তুমি ?'

নারায়ণ কোমরে বাঁধা খাপ থেকে একখানা তলোয়ার টেনে নিয়ে মেয়েটিকে ব'ললে, 'তুমি কে ? আগে তা' বল।'

মেয়েটি একটু হেসে ব'ললে, 'আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয় ?'

নারায়ণ ব'ললে, 'তোমার চেহারা দেখে তো মনে হয়, তুমি কোন রাজার মেয়ে। কোথায় থাক তুমি ?'

মেয়েটি ব'ললে, 'সেকথা পরে ব'লছি। আগে বল, তুমি কে ?'

নারায়ণ উত্তর দিলে, 'আমি অমুক দেশের শালপুন রাজার পুত্র।'

মেয়েটি একটু ভেবে নিয়ে ব'ললে, 'ও, তাহ'লে ঠিকই অনুমান ক'রেছি।'

নারায়ণ ব'ললে, 'কী অনুমান ক'রেছ ?'

মেয়েটি ব'ললে, 'তোমার বাবাকে প্রতিদিনই আমি ডাকি।'

নারায়ণ ব'ললে, 'কেন ডাকো ?'

মেয়েটি উত্তর দিলে, 'আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে।'

নারায়ণ ব'ললে, 'তাহ'লে তুমিই ওহে শালপুন রাজা, প্রাণ যায় ইত্যাদি ব'লে আমার বাবাকে স্বপ্নে ডাকো ?'

মেয়েটি মাথা নেড়ে ব'ললে 'হ্যাঁ, আমিই অমন ক'রে তোমার বাবাকে ডাকি। আর আমি হ'চ্ছি সিংহলের রাজার মেয়ে।'

নারায়ণ জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'এখানে কেমন ক'রে এলে ?'

মেয়েটি ব'লতে লাগল, 'আমি ছেলেবেলায় বেটাছেলের পোষাক প'রে থাকতুম। যখন আমার বয়স বছর পাঁচেক তখন একদিন বাগানে নিজের মনে খেলা ক'রছিলুম। এমন সময় এক কাপালিক আমাকে চিলের মতো ছোঁ মেরে সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে

এল এখানে। কাপালিক কালীমায়ের মন্দিরে একশো সাতটা নরবলি দিয়েছে। আর একটি হ'লে তার একশো আট সংখ্যা পূর্ণ হয়। কিন্তু মেয়েছেলে দেখে কাপালিক আমাকে বলি দিতে পারলে না। এখন আমার ষোল বছর বয়স হ'ল। আজ এগার বছর আমি কাপালিকের কাছে আছি। তুমি ফিরে যাও। আমার সঙ্গে এস না। জানতে পারলে কাপালিক মায়ের কাছে তোমাকেই বলি দেবে। তুমি এখুনি পালাও এখান থেকে।'

তলোয়ার খাপে পুরে মেয়েটির আরও একটু কাছে যেয়ে নারায়ণ ব'ললে, 'না, যতক্ষণ তোমাকে কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার ক'রতে না পারছি ততক্ষণ আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

মেয়েটি জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'এত দূরে তুমি কী ক'রে এলে?'

নারায়ণ জবাব দিলে, 'নৌকোয় ক'রে এসেছি।'

মেয়েটি আবার ব'ললে, 'তাহ'লে এখুনি এখান থেকে চ'লে যাও। আমাকে কাপালিকের হাত থেকে উদ্ধার ক'রতে তুমি কিছুতেই পারবে না।'

নারায়ণ জেদ ধ'রলে, 'না। কিছুতেই আমি যাবো না।'

তখন মেয়েটি নারায়ণকে ব'ললে, 'মোটেই দেরী ক'রোনা। এস, তোমাকে এই-খানে মায়ের বেলপাতায় ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখি। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।' এই ব'লে মেয়েটি নারায়ণকে বেলপাতা চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখলে। তারপর কমণ্ডলু হাতে কাপালিকের কাছে যেতেই কাপালিক ব'ললে, 'তোমার আজ এত দেরী হ'ল কেন?'

মেয়েটি থতমত খেয়ে ব'ললে, 'একটু দেরীই হ'য়ে গেল বাবা।'

কাপালিক একটু চিন্তা ক'রে ব'ললে, 'মনে হ'চ্ছে এ জঙ্গলে কোথায় যেন একটা মানুষ এসেছে?'

কাপালিকের কথায় মেয়েটি ভয়ে ভয়ে ব'ললে, 'কই, না তো বাবা।'

কাপালিকের কিন্তু সন্দেহ গেল না। সে মেয়েটিকে ব'ললে, 'দাঁড়া তুই এখানে। চারদিকটা আমি একটু দেখে আসি।' এই ব'লে কাপালিক সেখান থেকে চ'লে গেল। আর মেয়েটি একদৃষ্টে কালীমূর্তির পানে চেয়ে রইল। অর দু'চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল। সে মনে মনে মাকে ব'লতে লাগল, 'মা, এ-যাত্রা রক্ষে করো।' কিছু-ক্ষণ পরে মেয়েটি হঠাৎ শুনতে পেলে কালী মা দৈববাণী ক'রছেন, 'কাঁদিস না বেটী। যে ছেলে এই জঙ্গলে এসেছে সে-ই তোর বর। কাপালিক যখন আমার কাছে তাকে বলি দেবার আগে প্রণাম ক'রতে ব'লবে তখন ছেলেটি যেন ব'লে—কিভাবে প্রণাম ক'রতে হয় তা সে জানে না। কাপালিক যেইমাত্র ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম করা দেখাতে যাবে অমনি ছেলেটি যেন আমার হাতের এই খাঁড়া নিয়ে এক কোপে কাপালিককে দু'ফাঁক ক'রে দেয়।'

কালীমায়ের দৈববাণী শুনে মেয়েটি অবাক হ'য়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

এদিকে সেই বিরাট জঙ্গল তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে শেষে বেলপাতার ভেতর থেকে বার ক'রে কাপালিক নারায়ণকে ধ'রে নিয়ে এল। তারপর মেয়েটিকে ব'ললে, 'যা বেটী, এই লোকটাকে তুই ঐ সামনের পুকুর থেকে চান করিয়ে নিয়ে আয়। দেখিস যেন পালিয়ে না যায়। আমি পুকুরের ঘাট পর্যন্ত নজর রাখছি।' মেয়েটি মাথা নেড়ে 'যাচ্ছি বাবা' ব'লে নারায়ণকে পুকুরের জলে স্নান করাতে নিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে মেয়েটি নারায়ণকে কালীমায়ের দৈববাণীর কথা ব'ললে। নারায়ণ অবাক হ'য়ে গেল।

স্নান করিয়ে নারায়ণকে নিয়ে মেয়েটি কাপালিকের কাছে হাজির হ'তেই কাপালিক পুজো আরম্ভ ক'রলে। পুজোর শেষে কাপালিক নারায়ণকে ব'ললে, 'তুই এবার মাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর্।'

নারায়ণ ব'ললে, 'মাকে কেমন ক'রে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রতে হয় আমি তা জানিনা বাবা। আমাকে প্রণাম করা দেখিয়ে দাও।'

কাপালিক তখন লম্বা হ'য়ে শুয়ে ব'ললে, 'এই দেখ্, এমনি ক'রে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রবি।'

এই কথা যখন ব'লছে তখনি নারায়ণ কালীমায়ের হাত থেকে খাঁড়াটা নিয়ে কাপালিকের ঘাড়ে ঝেড়ে এক কোপ্ বসিয়ে দিলে। কাপালিক ম'রে গেল।

আবার দৈববাণী হ'ল, 'আগে তোরা বিয়ে কর্।' মেয়েটি ব'ললে, 'কিভাবে আমাদের বিয়ে হবে মা?'

মা ব'ললেন, 'আমার সামনে মালা বদল ক'রে তোরা বিয়ে কর্।'

মায়ের আদেশ পেয়ে নারায়ণের সঙ্গে মেয়েটির মালা বদল ক'রে বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ের পর কালী মা আবার দৈববাণী ক'রলেন, 'পাশে যে বাঘটা কাপালিক বেঁধে রেখেছে ওটা খুলে দে। ও' তোদের কিছু ক'রবে না।' দৈববাণী শুনে মেয়েটি বাঘের বন্ধন খুলে দিলে।

নারায়ণ তার বাবার স্বপ্নের কথা মনে ক'রলে। খুলে দিতেই বাঘটা বনের মধ্যে পালিয়ে গেল।

আবার মায়ের দৈববাণী হ'ল, 'নারায়ণ, তোরা দু'জনে নৌকোয় ফিরে যা। তোর যত দাঁড়ী আছে তাদের এখানে নিয়ে আয়। সবাই মিলে তরবারির ডগা দিয়ে আমার বেদীর ঠিক নীচেটা সারারাত ধ'রে খুঁড়বি। সারারাতে এখানে যত মাণিক পাবি সবই নৌকোয় ভর্তি ক'রে দেশে নিয়ে যাবি।'

কালী মায়ের দৈববাণী শুনে সস্ত্রীক নারায়ণ নৌকোয় গেল। মাঝিদের ডেকে এনে সারারাত ধ'রে দেবীর বেদীর নীচে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে প্রচুর মাণিক পেলে। সেগুলো মাঝিরা নৌকোয় নিয়ে যেয়ে নৌকো ভর্তি ক'রে ফেললে। তারপর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণ নৌকোর মাঝখানে ব'সল। আর বত্রিশ জন দাঁড়ী মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে নৌকো ছেড়ে দিলে মাঝসমুদ্রের দিকে।

কিছুদূর যাবার পর নৌকো থেকে সবাই লক্ষ্য ক'রলে, সমুদ্রের মাঝখানে জলের ওপর একটা কড়ে আঙ্গুল সোজা হ'য়ে কিছুদূর গেল। তারপর জলের মধ্যেই ডুবে গেল। সবাই বুঝলে, কালীমা কৈলাস চ'লে গেলেন।

নৌকো জল কেটে তর্‌তর্‌ ক'রে এগিয়ে চ'লেছে। এক সময় নারায়ণ সিংহল রাজকন্যাকে ব'ললে, 'বাবার স্বপ্নের প্রথম অংশটা তো দেখা হ'ল। শেষ দিকটা তো কই দেখা হ'ল না ?'

স্বামীর কথা শুনে সিংহল রাজকন্যা একটা বাঁশি বাজালে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে দৈববাণী হ'ল, 'তুমি একা দেখবে কেন ? তোমাদের রাজসভাতে সব কিছুই দেখান হবে।'

কয়েকদিন পরে নারায়ণের নৌকো কর্ণাট রাজ্যে এসে পে'ৗছে গেল। নারায়ণ দেখতে পেলে, দূরে তার দাদাদের নৌকো বাঁধা আছে। খবর নেবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি সেখানে যেতেই মাঝিরা জানালে, তার দাদারা অনেকদিন হ'ল এ রাজ্যের কোথায় আছে তা' তারা জানে না।

একথা শুনে নারায়ণ স্ত্রী, মাঝি ও মাণিক সবকিছু ফেলে রেখে দাদাদের সন্ধানে বেরিয়ে প'ড়ল।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান ক'রতে ক'রতে রাজধানীতে এসে হাজির হ'ল। একজনের কাছে জানতে পারলে, তার দাদারা রাজকুমারীর কাছে পাশাখেলায় হেরে যেয়ে কর্ণাটরাজের বন্দীশালায় আবদ্ধ হ'য়ে আছে। নারায়ণ নৌকোয় না ফিরে রাজবাড়ির আশেপাশে ঘুরতে লাগল। এই সময় একজন লোকের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল।

একদিন বন্ধুকে নারায়ণ ব'ললে, 'আচ্ছা, রাজকুমারী কী এমন পাশা খেলে যে সব রাজার ছেলেই খেলতে এসে তার কাছে হেরে যায় ?'

বন্ধু ব'ললে, 'আমি তো রাজবাড়িতে কাজ করি। তাই আমার ওসব কিছু বলা নিষেধ।'

নারায়ণ নাছোড়-বান্দা। বন্ধুকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ ক'রলে। বন্ধু ফিসফিস ক'রে ব'ললে, 'আমি তোমাকে রাজকুমারীর পাশাখেলার ব্যাপারটা ব'লতে পারি, যদি তুমি সেকথা কাউকে না বলো।'

নায়ায়ণ ব'ললে, 'আমি কথা রাখবো। তোমার কথা আমি কাউকে ব'লবো না।'

বন্ধু ব'ললে, 'যে রাজকুমার আসে তার সঙ্গে রাজকন্যা যখন রাতে পাশা খেলতে বসে তখন তার পাশেই থাকে তার এক সখী। আর সখীর সামনে একটা পোষা ই'দুরের মাথায় বসানো থাকে একটা প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় পাশাখেলা চ'লতে থাকে। ই'দুরটা সহজে নড়েও না, চড়েও না। পাশাখেলা যখন পুরোদমে চ'লতে থাকে তখন রাজকুমারীর সখী বুড়ো আঙ্গুলের তিনটে টুসি দেয়। আঙ্গুলের টুসির শব্দ পেলেই ই'দুরটা পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ই'দুরের মাথায় বসানো প্রদীপটা

উল্টে প'ড়ে নিবে যায়। প্রদীপটা আবার জ্বালতে ক'রতে অন্ধকারে রাজকুমারী পাশা ওলট-পালট ক'রে দেয়। প্রদীপ জ্বালা হ'লে দু'এক দানেই রাজকুমারী জিতে যায়। এমনি ক'রেই সব রাজপুত্রের মতো তোমার দাদাদেরও বন্দী ক'রে রেখেছে।'

বন্ধুর মুখে রাজকুমারীর পাশাখেলার বৃত্তান্ত শুনে নারায়ণ ভাবতে লাগল। একসময় বন্ধুকে ব'ললে, 'রাজকুমারী কোথায় পাশাখেলা শিখেছে ব'লতে পার ?'

বন্ধু ব'ললে, 'এক ব্রাহ্মণ ও তার কন্যার কাছে রাজকুমারী পাশাখেলা শিখেছে।'

পরের দিন সকালেই বন্ধুর কাছে ব্রাহ্মণের ঠাঁই-ঠিকানা নিয়ে নারায়ণ বেরিয়ে প'ড়ল।

ব্রাহ্মণের বাড়িতে পৌঁছে ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রলে। অনেক কাকুতি-মিনতির পরে ব্রাহ্মণ নারায়ণকে পাশাখেলা শেখাতে রাজি হ'ল।

ব্রাহ্মণ ও তার কন্যার কাছে পাশাখেলা শিখে নিতে নারায়ণের অনেকদিন লেগে গেল। কিন্তু ইঁদুরের ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ-কন্যা নারায়ণকে কিছুতেই ব'ললে না।

ঐ ব্রাহ্মণের বাড়িতে এক বুড়ো চাকর ছিল। তার কাছে ইঁদুরের ব্যবস্থার সন্ধান পেলে। সে ব'লে দিলে, 'বেড়ালের হাড়ের পাশা নিয়ে গেলে জিততে পার।' পথে যেতে যেতে সে অনেক কষ্টে বেড়ালের হাড়ের পাশা তৈরী করালে।

বেড়ালের হাড়ের পাশা বগলে ক'রে নারায়ণ রাজবাড়িতে গেল। সেখানে দেউড়িতে ঘণ্টায় ঘা দিতেই ঘণ্টা বেজে উঠল। রাজকুমারীর দাসী বেরিয়ে এসে দেখলে, এক রাজপুত্র দরজায় দাঁড়িয়ে। নাম, ধাম, উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে দাসী নারায়ণকে অন্দরে নিয়ে গেল। রাজবাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার কোন ত্রুটি হ'ল না। রাতে দাসী নারায়ণকে রাজকুমারীর ঘরে নিয়ে গেল।

রাজকুমারী ও তার সখী একপাশে ব'সেছে। আর নারায়ণ অন্য পাশে ব'সেছে।

নারায়ণ লক্ষ্য ক'রলে, পাশে বসানো প্রদীপটা মাঝে মাঝে নড়ছে। ইঁদুরের মাথায় প্রদীপটা যে বসানো আছে তাতে আর সন্দেহ রইল না।

জোর পাশা খেলা চ'লছে। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী সখীর দিকে চাইতেই আঙুলের তিনবার টুসি দিলে। কিন্তু প্রদীপ আর উল্টোল না। যেমন জ্বলছিল তেমনই জ্বলতে লাগল।

বেড়ালের হাড়ে তৈরী পাশা থেকে বেড়ালের গন্ধ পেয়ে ইঁদুর ভয়ে জড়োসড়ো। একটুও নড়ল না। সখী আর একবার আঙুলের টুসি দিলে। তবুও কিছু হল না। রাজকুমারী ও তার সখীর মুখ ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নারায়ণ রাজকুমারীকে হারিয়ে দিলে। সখী নারায়ণকে ব'ললে, 'পাশা খেলায় তুমি যখন হারিয়ে দিয়েছ তখন রাজকুমারীকে বিয়ে ক'রতে হবে।'

নারায়ণ পাশা কোঁচড়ে গুঁজে নিয়ে ব'ললে, 'আমি রাজকুমারীকে বিয়ে ক'রবো না। তবে একটি অনুরোধ রাখতে হবে।'

রাজকুমারী ব'ললে, 'নিশ্চয়ই রাখবো। বল, কী তোমার অনুরোধ।'

নারায়ণ ব'ললে, আমার চারজন দাদা পাশা খেলতে এসে বন্দী হ'য়ে কারাগারে আছে। তাদের মুক্তি দিতে হবে। আর আমি কিছু চাই না।'

রাজকুমারী খুশী হ'য়ে ব'ললে, 'নিশ্চয়ই তাদের আমি কাল সকালেই মুক্ত ক'রে দোব।'

নারায়ণ ব'ললে, 'আরও একটি কথা আছে আমার।'

রাজকুমারী নারায়ণের মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে, 'বল, কী কথা?'

নারায়ণ ব'ললে, 'আমাকে কথা দিতে হবে আর কোনদিন ইঁদুর নিয়ে পাশা খেলে অন্যায়ভাবে কোন রাজপুত্রকে বন্দী করবে না।'

রাজকুমারী তা'তেই সম্মত হ'ল।

পরের দিন সকালে দাদাদের মুক্ত ক'রে নিয়ে নৌকোয় ফিরে এল। ঘাটে আরও দু'একদিন নৌকো থাকল। সে ক'দিন আনন্দ-আমোদে সবাই কাটালে।

দাদারা দেখতে পেলে, নারায়ণের নৌকোর মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আছে।

একসময় নারায়ণ দাদাদের ব'ললে, 'বাবার স্বপ্নের কিনারা কী ক'রলে তোমরা?

বড়দাদা ব'ললে, 'সেসব আমরা ক'রে ফেলেছি।'

নারায়ণ ব'ললে, 'কই দেখি কী ক'রেছ?'

ছোটদাদা একটা বাঁধানো পট এনে হাজির ক'রলে। পট দেখে নারায়ণ মনে মনে হাসল। মুখে কিছু ব'ললে না।

নারায়ণের নৌকোয় সুন্দরী কন্যাকে দেখে দাদারা গোপনে নানান জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। শেষে তারা ঠিক করলে, যেভাবেই হোক নারায়ণকে নৌকো থেকে জলে ফেলে দিতে হবে।

এদিকে নারায়ণের দাদাদের ভাবগতিক দেখে সিংহলের রাজকন্যা স্বামীকে ব'ললে, 'তুমি ওদের জাহাজে যেও না। আমার কেমন যেন ভাল ঠেকছে না।' নারায়ণ ব'ললে, 'ওসব তুমি কিছু ভেবো না। দাদাদের সঙ্গে নিয়েই আমি দেশে ফিরে যাবো।'

দু'দিন পরে সবাই সমুদ্রে নৌকো ছেড়ে দিলে। যেতে যেতে দাদারা তাদের নৌকো থেকে ব'ললে, 'নারাণ, তুই আমাদের নৌকোয় আয়। সবাই মিলে একটু খেলাধুলো ক'রবো।'

দাদাদের কথায় নারায়ণ নিজের নৌকো থেকে যেইমাত্র দাদাদের নৌকোয় যাবে অমনি এক দাদা এসে তাকে ঠেলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে।

সমুদ্রের জলে স্বামীকে ডুবে যেতে দেখে সিংহলের রাজকন্যা বাঁশি বাজালে। বাঁশি বাজাতেই আকাশ থেকে একটা বড় তিত লাউ ঝপাং ক'রে এসে প'ড়ল নারায়ণের

সামনে। তিত লাউ জলে ভাসতে লাগল। আর নারায়ণ সেই লাউ ধ'রে ভাসতে ভাসতে কোন্ দিকে চ'লে গেল।

তারপর দিনকয়েকের মধ্যে নৌকো নিয়ে চারজন রাজপুত্র দেশে এসে পৌঁছে গেল। ছোট তিন রাজপুত্র সিংহলের রাজকন্যাকে ব'ললে, 'তুমি বড়দাকে বিয়ে করো।'

রাজকন্যা ব'ললে, 'আমাকে ছ'মাস সময় দিতে হবে। তারপর আমি বিয়ে করবো। আর আমাকে রাজবাড়ি থেকে কিছুদূরে আলাদা একটা বাড়িতে ঐ ছ'মাস থাকতে দিতে হবে। আমি ব্রত পালন ক'রবো।'

তাতেই রাজপুত্রেরা রাজি হ'য়ে রাজবাড়ির কিছু দূরে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়িতে রাজকন্যাকে রেখে দিলে। রাজপুত্রেরা তাদের বাবাকে নারায়ণের কথা কিছুই ব'ললে না। আর রাজাও কিছু জিজ্ঞেসা ক'রলে না।

রাজা ছেলেদের একদিন ডেকে ব'ললে, 'আমার স্বপ্নের কতদূর কী ক'রলে তোমরা?'

বাবার কথা শুনে এক ছেলে সেই পটটা এনে রাজাকে দেখালে। রাজা বিরক্ত হ'ল। তা' গ্রাহ্য ক'রলে না।

ওদিকে তিত লাউ ধ'রে ভাসতে ভাসতে নারায়ণ এসে ঠেকল বহুদূরে সমুদ্রের কিনারায়। জল থেকে উঠে কিছুক্ষণ হাঁপ নিলে। তারপর পাশেই একটা শুক্‌নো ফুল বাগানে যেয়ে দাঁড়াল।

বাগানে পা দিতেই শুকনো বাগান সবুজ পাতায় ও ফুলে ভ'রে উঠল।

দূরে রাখাল ছেলেরা মাঠে গরু ছেড়ে এক কাছে ব'সে জটলা ক'রছিল। তারা দূর থেকে ফুল বাগানের দিকে চেয়েই অবাক হ'য়ে গেল। তারপর দল বেঁধে ছুটে এল বাগানের কাছে। দেখলে, এক সুন্দর চেহারার লোক বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রছে। তাকে কোন কথা না ব'লে তারা ছুটল বাগানের মালিনীর কাছে। তার কাছে যেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিলে। মালিনী কথাটা শুনে প্রথমে বিশ্বাসই ক'রতে চাইলে না। কিন্তু রাখালদের হাঁপাহাঁপিতে গেরস্থালির কাজ বন্ধ রেখে বাগানে যেয়ে হাজির হ'ল। বাগানে ফুলের বাহার দেখে অবাক। নারায়ণের কাছে যেয়ে মালিনী ব'ললে, 'তুমি কে বাবা? কোথায় তোমার বাড়ি?'

নারায়ণ ব'ললে, 'মাসি, আমার কেউ নেই। আমার নাম নারায়ণ।'

মালিনী ব'ললে, 'আহা, বেশ সুন্দর নামটি তোমার বাবা। আমার ছেলেপিলে নেই। তুমি যাবে আমার বাড়িতে?'

নারায়ণ একটু হেসে ব'ললে, 'মাসি, তুমি যদি দয়া ক'রে আমাকে তোমার বাড়িতে থাকতে দাও তাহ'লে আমার বড় উপকার হয়।'

তারপর মালিনী নারায়ণকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। নারায়ণও সেখানে বেশ আরামে থাকতে লাগল।

মালিনী প্রতিদিন বাগান থেকে ফুল তুলে আনে। ফুলের মালা তৈরি করে। সেই মালা আর ফুল নিয়ে রাজবাড়িতে দিয়ে আসে। রাজবাড়ি থেকে যা পায় তাই দিয়েই নারায়ণ ও মালিনীর দিন চ'লে যায়।

একদিন নারায়ণ মালিনীকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'মাসি, তুমি রোজ রোজ কা'কে ফুল দিয়ে আস ?'

মালিনী ব'ললে, 'কে এক মেয়ে এসেছে রাজবাড়িতে। সে আবার ছ'মাস বেত ক'রছে। আমি তাকেই ফুল, মালা দিয়ে আসি।'

তারপর নারায়ণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মালিনীর কাছে রাজবাড়ির মেয়েটির চেহারা ও কথাবার্তার ঢং ঢাং জেনে বুঝতে পারলে, ঐ মেয়েই তার স্ত্রী।

একদিন নারায়ণ বাগান থেকে ফুল এনে বিনিসুতোয় মালা গেঁথে সেই মালার ফুলের পাপড়িতে নিজের নাম লিখে দিয়ে মালিনীকে ব'ললে, 'মাসি, রাজকন্যাকে আজ এই মালা দিয়ে শুধুবে,—কেমন হ'য়েছে। আর সে কী বলে তা' আমাকে এসে ব'লো।'

রাজি হ'য়ে ফুল ও মালা নিয়ে মালিনী চ'লে গেল। রাজকন্যাকে ফুল ও মালা দিতেই রাজকন্যা মালা দেখে অবাক হ'য়ে গেল।

মালিনী ব'ললে, 'আজ মালা কেমন হ'য়েছে মা ?'

রাজকন্যা ব'ললে, 'খুব সুন্দর হ'য়েছে। কে গেঁথেছে এ মালা ?'

মালিনী থতমত খেয়ে ঢোঁক গিলে ব'ললে, 'আমার এক বোনঝি আছে বাড়িতে। সে-ই এ মালা গেঁথে দিয়েছে মা।'

রাজকন্যা আর কোন কথা না ব'লে কিছু বেশী টাকা দিয়ে মালিনীকে ব'ললে, 'তুমি রোজ এরকম মালা আনবে। আর একদিন তোমার বোনঝিকেও আমার কাছে নিয়ে এস।'

মালিনীর ভয় হ'ল। তবুও ব'ললে, 'আচ্ছা মা।' তারপর টাকাকড়ি নিয়ে মালিনী বাড়ি চ'লে গেল।

নারায়ণ রাজকন্যার কথা জানতে চাইলে মালিনী ব'ললে, 'মালা খুব পছন্দ হ'য়েছে। আর টাকাও বেশী দিয়েছে। কিন্তু মহা মুশকিল হ'য়ে গেছে বাবা।'

নারায়ণ ব'ললে, 'আবার কী হ'ল মাসি ? রাজকন্যা তোমাকে ধমক-টমক দিয়েছে নাকি ?'

মালিনী ব'ললে. 'নারে বাবা, না। সে সব কিছু নয়। আমি ব'লনু, আমার বোনঝি মালা গেঁথেছে। অমনি রাজকন্যা ব'ললে, তোমার বোনঝিকে অবশ্যই একদিন আমার কাছে নিয়ে এস। তাই এখন ভাবছি, কী হবে।'

নারায়ণ হেসে ব'ললে, 'এই কথা! বেশ তো, একদিন আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।'

মালিনী ব'ললে, তুই বেটাছেলে। তোকে আমি নিয়ে গেলে ধড়ে আমার মাথা থাকবে ?'

নারায়ণ একটু আবদার ক'রে বললে, 'না মাসি, আমাকে তুমি মেয়ে সাজিয়ে এক-দিনের মতোও রাজকন্যাকে দেখিয়ে আনবে চল। তোমার ভয় নেই।'

যেদিনই ফুল, মালা রাজকন্যাকে দিতে যায় সেইদিনই বোনঝিকে নিয়ে যাবার জন্যে রাজকন্যা মালিনীকে খুব ক'রে বলে। এদিকে নারায়ণও রাজকন্যার কাছে যাবার জন্যে ছটফট করে।

অগত্যা একদিন মালিনী নারায়ণকে মেয়ে সাজিয়ে তার মাথায় ফুলের ঝাঁকা দিয়ে চাঁদনী-ঘাটে যেখানে রাজকন্যার আবাস ছিল সেখানে নিয়ে যেয়ে হাজির হ'ল। সামনে আসতেই রাজকন্যা স্বামীকে চিনতে পারলে। তারপর দু'জনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হ'ল। কথাবার্তা শেষ হ'লে নারায়ণ মালিনীর বোনঝি সেজে আবার মালিনীর বাড়িতে ফিরে এল।

এদিকে শালপুন রাজা স্বপ্নের সত্যকে দেখবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। মন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ ক'রে রাজ্যে সোনার চেংড়া ঘোরাতে হুকুম দিলে। সোনার চেংড়া রাজ্যময় ঘোরানো হ'তে লাগল।

নারায়ণ সোনার চেংড়া ধরলে। সোনার চেংড়া আটক হ'য়েছে শুনে কে আটক ক'রেছে তার সন্ধানে রাজার লোকেরা বেরিয়ে প'ড়ল।

সন্ধান পেলে তারা মালিনীর বাড়িতে। রাজার লোক মালিনীকে ডেকে ব'ললে, 'তুমি সোনার চেংড়া ধ'রেছ ? চল তুমি রাজাকে স্বপ্নের সত্য দেখাতে।'

মালিনী ব'ললে, 'একটিবার দাঁড়াও। আমি বাড়ির ভেতর থেকে আসি।' এই ব'লে ভেতরে যেয়ে নারায়ণকে সব ব'ললে।

নারায়ণ মালিনীকে ব'ললে, 'বাইরে রাজার লোককে তুমি যেয়ে বল—স্বপ্নের সত্যকে দেখানো হবে। তবে রাজাকে দিন ধার্য ক'রে একটা বড় রকমের সভা করতে হবে। আর এখান থেকে রাজসভা এবং সেখান থেকে সমুদ্রের ধারে চাঁদনীর ঘাটে রাজকন্যার একতলা বাড়ি পর্যন্ত কাপড়ের কাণ্ডার ক'রে দিতে হবে।'

বাড়ির বাইরে এসে মালিনী রাজার লোককে ঐ সব কথা ব'ললে।

রাজার লোকও রাজাকে সব কথা শোনালে। রাজা শুনে খুশি হ'য়ে সভার আয়োজন ক'রতে আদেশ দিলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই মালিনীর বাড়ি থেকে সভাস্থল, সেখান থেকে চাঁদনীর বাঁধা-ঘাট পর্যন্ত কাপড়ের কাণ্ডার ক'রে দেওয়া হ'ল।

বহু রাজ্যের রাজাকে শালপুনরাজা সভায় আসবার জন্যে নেমতন্য পাঠিয়ে দিলে।

সভার দিন ভোর ভোর নারায়ণ কাপড়ের কাণ্ডারের ভেতর দিয়ে মালিনীর বাড়ি থেকে রাজসভার পাশ দিয়ে গেল চাঁদনীর বাঁধাঘাটে, সেখান থেকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল মালিনীর বাড়িতে। দু'জনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হ'ল।

সিংহলের রাজকন্যা স্বামীকে ব'ললে, 'সব দেখানো হবে। আগে রাজসভায় আমাকে নিয়ে চল।'

তারপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মালিনীকে প্রণাম ক'রে কাপড়ের কাণ্ডারের ভেতর দিয়ে রাজার সভায় এসে হাজির হ'ল। সভা তখন লোকে লোকারণ্য।

একপাশে রাজা সিংহাসনে ব'সেছে। অন্যান্য রাজারাও সামনের সারিতে ব'সে।

রাজকন্যা ও নারায়ণ দু'জনেই সভার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সভায় নমস্কার জানিয়ে নারায়ণ রাজাকে ব'ললে, মহারাজ, এবার তাহলে আপনার স্বপ্নের সত্যকে দেখাতে আরম্ভ করি?'

ঘাড় নেড়ে রাজা সম্মতি জানালে।

সিংহল রাজকন্যা বাঁশি বাজালে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে ছ'জন অপ্সরা চার-দিক আলো ক'রে সভার মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াল। একজনের হাতে একটা কমণ্ডলু। সেটা সে সিংহলের রাজকন্যার হাতে ধরিয়ে দিলে।

কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নারায়ণের স্ত্রী রাজাকে একখানা ধারাল অস্ত্র এনে দিতে ব'ললে। অস্ত্র আনা হ'ল।

তারপর স্ত্রীর ইঙ্গিতে নারায়ণ একজন অপ্সরার মুণ্ডুটা এক কোপে ঝপ্ ক'রে কেটে ফেললে। কাটতেই সেটা রূপোর গুঁড়ি হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় অপ্সরাকে তেমনিভাবে কাটতেই সেটা সোনার ডাল হ'য়ে গেল।

তৃতীয়টাকে কাটতেই সেটা হীরের পাতা হ'য়ে গাছময় ঝলমল ক'রে ঝিলিক দিয়ে ঝুলতে লাগল। চতুর্থটা থেকে হ'ল মুক্তোর ফল। মুক্তোর ফলে গাছ ভর্তি হ'য়ে গেল।

পঞ্চম অপ্সরাকে অস্ত্র দিয়ে দু'ফাঁক ক'রে দিতেই সেটা অপূর্ব এক ময়ূর হ'য়ে সেই গাছের ওপর নাচতে লাগল।

শেষ অপ্সরাকে কাটতেই সে বিকট এক রাক্ষসী হ'য়ে গাছের ওপর উঠে গোটা গাছের যা কিছু সবই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে নারায়ণ রাজাকে ব'ললে, 'মহারাজ, আপনার স্বপ্নকে আপনি নিজের চোখে দেখলেন তো?'

রাজার মুখে কথা নেই। অবাক হ'য়ে শুধু শব্দ ক'রলে,—'হুঁ'। নারায়ণ এবার স্ত্রীর পানে চাইলে। সিংহলের রাজকন্যার হাতে যে কমণ্ডলু ছিল তাতে ছিল অমৃতকুণ্ডের জল। সে কমণ্ডলু থেকে সেই জল নিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দিতেই স্বপ্নের রূপ কোথায় মিলিয়ে গেল। আর সেই ছ'জন অপ্সরা আবার জীয়ন্ত হ'য়ে সভার মাঝে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

তারপর রাজকন্যা বাঁশি বাজাতেই ছ'জন অপ্সরা শোঁ শোঁ শব্দে উড়ে আকাশে মিলিয়ে গেল। যাবার সময় তারা সিংহলরাজকন্যাকে ব'লে গেল, 'ইন্দ্রের শাপে তুমি এখন পৃথিবীতেই থাক। আমরা চললু।'

সবাই দেখে শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

এবার শালপুন রাজা নারায়ণকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'তুমি কে বাবা ?'

নারায়ণ হেসে ব'ললে, 'আমি আপনার ঘোড়াশালের বড়রাণীর একমাত্র ছেলে—নারায়ণ। আর এ হ'চ্ছে আপনার বৌমা।' এই ব'লে স্ত্রীর দিকে তাকালে। সিংহলের রাজকন্যা ঘোমটা টেনে রাজাকে প্রণাম ক'রলে। নারায়ণও প্রণাম ক'রলে বাবাকে। আনন্দে রাজার বুক ভ'রে গেল। ব'ললে, 'আমি খুবই খুশি। কিন্তু

'ওহে শালপুন রাজা,
প্রাণ যায়, প্রাণ রক্ষে কর।
আমাকে বাঘে খেলে।'—একথার সত্যটা তো কই জানতে বা দেখতে পেনু না ?'

নারায়ণ বাবাকে ব'ললে, 'সেটা আপনি আপনার বৌমাকে জিজ্ঞেসা করুন।'

রাজকন্যা ব'ললে, 'হ্যাঁ বাবা, রোজ রোজ আমিই আপনাকে ডাকাডাকি করতুম।'

এরপর রাজাকে সিংহলের রাজকন্যা সব ঘটনা একটি একটি ক'রে ব'ললে। রাজাও শুনলে।

ছেলে ও বৌমাকে অন্দরে নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে ঘোড়াশাল থেকে বড়রাণীকেও নিয়ে এল।

মন্ত্রীকে ডেকে রাজা ব'ললে, 'ছোটরাণীর ছেলেরা আমাকে ঠকাতে চায়। ওরা নারায়ণের জীবনকেও শেষ ক'রে দিতে চেয়েছিল। তাই তাদের আমি কোন ধন-সম্পত্তি দোব না। সবকিছু আমি নারায়ণকে দিতে চাই।'

বাবার কথা শুনে নারায়ণ ব'ললে, 'না বাবা, তা' কেন হবে ? দাদারাও তো আপনার সন্তান। আমি সবাইকে নিয়েই থাকতে চাই। আপনি কাউকেই কোনকিছু থেকে বঞ্চিত ক'রবেন না।'

নারায়ণের কথায় রাজা আর কিছু ব'ললে না। বড়রাণী, ছোটরাণী ও বৌ-ছেলেদের নিয়ে শালপুন রাজা সুখে রাজত্ব ক'রতে লাগল।

মায়ের পরিত্রাণ

কোনো পরিবারে সাত ভাই ছিল। তারা খুবই গরীব। ছ'ভাইয়ের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল। বাকি ছিল ছোট ভাই। ভাইয়েরা বহু কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালায়।

অনেক দেখে শুনে এক খুব সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে দাদারা ছোটভাইয়ের বিয়ে দিলে। ছোটবৌ খুবই পয়মন্ত। সে এ বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির অবস্থা ফিরে গেল। দেখতে দেখতে সাত ভাই খুব বড়লোকও হ'য়ে গেল। ছোট বৌয়ের একটি বেটাছেলে হ'ল। মাঝে মাঝে বড় ভাই বাড়ির সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'তোরা যে যাই করিস দুয়ারে ভিখিরী এলে যেন তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিস না। ভুলে যাস না— আমরা গরীব থেকে বড়লোক হ'য়েছি।'

সবাই তাই করে। দুয়ারে ভিখিরী এলে তাকে তাড়াতাড়ি ভিক্ষে দেয়।

একদিন এক ভিখিরী সন্ন্যাসী এসে দুয়ারে দাঁড়াল। ভিক্ষে চাইলে।

যে-ই তাকে ভিক্ষে দিতে আসে তাকেই বলে, 'ভিক্ষে নোব না।' বাড়ির একজন ব'ললে, 'ভিক্ষে নেবেনা কেন'?

সন্ন্যাসী ব'ললে, 'ভিক্ষে আমি নোব। তবে যার তার হাতে নোব না।'

একজন ব'ললে, 'কার হাতে ভিক্ষে নেবে?'

সন্ন্যাসী ব'ললে, 'এ বাড়ির যে ছোট বৌ আছে আমি তার হাতে ছাড়া অন্য কারো হাতে ভিক্ষে নোব না।'

একথা শুনে ছোটবৌ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষে দিতে এল। ছোটবৌ সন্ন্যাসীর খুব কাছে আসতেই সন্ন্যাসী তার ঝোলা থেকে একটা ফুল বার ক'রে ছুঁড়ে মারলে ছোট বৌয়ের নাকে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটবৌ কুকুর হয়ে গেল। এবার সন্ন্যাসী ছুটতে লাগল আর কুকুরও তার পেছু পেছু যেতে লাগল। বাড়ির সবাই বুঝতে পারলে, সন্ন্যাসী ছোটবৌকে কুকুর ক'রে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সাত ভাই সন্ন্যাসীকে ধরবার জন্যে তার পেছু পেছু ছুটতে লাগল। যখন মাঠের মধ্যে সাত ভাই সন্ন্যাসীকে ধ'রবো ধ'রবো হ'য়েছে সেই সময়ে সন্ন্যাসী তাদের গায়ে জলের ছিটে দিয়ে দিতেই সাত ভাই সাতটা তালগাছ হ'য়ে গেল। সাতটা তালগাছ মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রইল। আর সন্ন্যাসী ছোটবৌকে কুকুর ক'রে নিয়ে তার দেশে চ'লে গেল। দেশে যেয়ে সন্ন্যাসী ছোটবৌকে কুকুর থেকে আবার মেয়ে ক'রলে। সন্ন্যাসী যখন তার ঘরের বাইরে যায় তখন ছোটবৌকে কুকুর ক'রে রেখে যায়। বাইরে থেকে এসে তাকে আবার মেয়ে করে। এমনি ভাবে দিন চ'লতে লাগল।

এদিকে ছোটবৌয়ের সেই ছেলে ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে উঠল। ছেলে জ্যাঠাই-মায়েদের একদিন জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'আমার মা কোথায়? আর বাবা জ্যাঠারাই বা কোথায়?' জ্যাঠাইমায়েরা ছোটবৌয়ের ছেলেকে সব ঘটনা ব'ললে। সব শুনে ছোটবৌয়ের ছেলে একটা ঝাঁকায় তেল, সিঁদুর আর আলতা নিয়ে ঝাঁকা মাথায় বেরিয়ে প'ড়ল। দেশে দেশে তেল, সিঁদুর আর আলতা বিক্রি ক'রে বেড়ায়। যেখানেই যায় সেখানেই তার ঝাঁকার চার পাশে মেয়েরা জড়ো হয়। আর ছোট বৌয়ের ছেলে লক্ষ্য করে তার জ্যাঠাইমায়েরা যেমন তার মায়ের চেহারা ব'লেছে তেমন কোন মেয়ে সেখানে আছে কিনা?

এমনি ক'রে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে একটা পুকুরঘাটে এসে তার ঝাঁকা মাথা থেকে নামাতেই ঘাটে যে মেয়েরা এসেছিল তারা একে একে এসে ঝাঁকার চারদিকে দাঁড়াল। একটি মেয়ে ঘাটের পাশে ব'সে ব'সে কাঁদছিল। ছোটবৌয়ের ছেলে সেটা লক্ষ্য ক'রলে।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েরা যে যার কিনবার কিনে নিয়ে যখন চলে গেল তখন সে গুটি-গুটি ক'রে যে মেয়েটি কাঁদছিল তার কাছে গেল।

মেয়েটিকে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'মা, তুমি কাঁদছো কেন? তোমার কী হ'য়েছে?'

মেয়েটি আরও বেশী ক'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ছোটবৌয়ের ছেলে ব'ললে, 'আমি তোমার ছেলের মতো। আমাকে বল না মা—কেন তুমি কাঁদছো?'

মেয়েটি সব ব'লতেই ছোটবৌয়ের ছেলে বুঝতে পারলে, এই মেয়েটিই তার মা। সন্ন্যাসী তাকে কুকুর ক'রে এদেশে নিয়ে এসেছে। 'মা, মাগো' ব'লে সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠল। তারপর মা বেটায় অনেক কথা হ'ল।

ছেলে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, 'সন্ন্যাসী তো তোমায় কুকুর ক'রে রাখে। তবে তুমি এমন ক'রে ঘাটে এলে কী ক'রে?'

মা ব'ললে, 'সন্ন্যাসী যখন ঘরে থাকে তখন সে আমাকে মেয়ে করে। বিদেশে গেলেই আমাকে কুকুর ক'রে রেখে যায়।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ছেলে মাকে ব'ললে, 'মা, তোমাকে যে আমি দেশে দেশে খুঁজে বেড়াচ্ছিনু। এখন তোমার দেখা পেয়েছি। এবার আমার সঙ্গে তুমি দেশে চলো।'

মা ব'ললে, 'কেমন ক'রে যাবো বাবা। সন্ন্যাসীর হাত থেকে বাঁচবার আমার উপায় নেই। তার চেয়ে তুই বাড়ি ফিরে যা।'

ছেলে ব'ললে, 'মা, তুমি কী ব'লছ! তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি দেশে ফিরে যাবো? না, তা আমি কিছুতেই যাবো না।' কিছুক্ষণ মা বেটা দু'জনে চুপচাপ। তারপর ছেলে ব'ললে, 'ঐ সন্ন্যাসীকে মারবার কি কোন উপায় নেই?'

মা ব'ললে, 'আমি সন্ন্যাসীর কাছে শুনেছি, ওর প্রাণ সাতসমুদ্র পারে আছে।'

ছেলে ব'ললে, 'কোথায় আছে?'

মা ব'ললে, 'সাত সমুদ্রের ওপারে এক মন্দিরে একটা কালীর মূর্তি আছে। সেই মূর্তির মাথায় একটা ময়না পাখী আছে। সেই পাখীটিই হ'চ্ছে ঐ সন্ন্যাসীর প্রাণ।'

ছেলে ব'ললে, 'আমি যাবো।'

এই ব'লে বহু গাঁ, সহর, বন-জঙ্গল পেরিয়ে ছোটবৌয়ের ছেলে যেতে লাগল।

পথে একজন লোক একটা আম গাছের তলায় ব'সেছিল। আমগাছে প্রচুর আম ধ'রেছে। লোকটি ব'ললে, 'ও ভাই, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' ছোটবৌয়ের ছেলে ব'ললে, 'আমি সাত সমুদ্রের ওপারে কালীর মন্দিরে যাচ্ছি।'

লোকটি ব'ললে, 'তুমি কালী মন্দিরে যাবে? তা' এক কাজ ক'রো না ভাই। কালীর একটু চানজল নিয়ে এস না?'

ছেলে ব'ললে, 'কী হবে?'

লোকটি ব'ললে, 'আমার এই আমগাছের সব আমই তেতো। কালীর চানজল দিয়ে দেখবো তেতো আম মিষ্টি হয় কি না। তুমি একটু মনে ক'রে এনো ভাই।'

'আচ্ছা'—ব'লে ছোটবৌয়ের ছেলে সেখান থেকে চ'লে গেল। কিছু দূর যাবার পর সমুদ্রের তীরে হাজির হ'ল। সমুদ্রের তীরে ব'সে ভাবছে। এমন সময় এক কুমীর এসে তার সামনে জলের ধারে গা শুকোতে লাগল। কুমীরের গলাটা বেশ ফোলা ফোলা।

ছোটবৌয়ের ছেলে কুমীরটাকে ব'ললে, 'তোমার গলাটা ফুলেছে কেন? দেখে মনে হয়, তোমার বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে।'

কুমীর ব'ললে, 'হ্যাঁ ভাই, তা হ'চ্ছে। তুমি এখানে কেন?'

ছেলে ব'ললে, 'আমি সাত সমুদ্রের ওপারে কালীর মন্দিরে যাবো। কিন্তু যাবো কী ক'রে তাই ভাবছি।'

কুমীর ব'ললে, 'আমি তোমায় পিঠে ক'রে পার করে দোব। তবে মা কালীর একটু চানজল তোমায় এনে দিতে হবে।'

ছেলে ব'ললে, 'নিশ্চয়ই এনে দোব। কিন্তু চানজল কী হবে?'

কুমীর ব'ললে, 'খেতে যেয়ে আমার গলায় কী আটকেছে। চানজল এনে দিলে সেটা বেরিয়ে যাবে আর আমিও ভাল হ'য়ে যাবো।'

আরও কিছু কথাবার্তার পর ছোটবৌয়ের ছেলে কুমীরের পিঠে চ'ড়ল আর কুমীরটা জলে ভেসে ভেসে সমুদ্রের ওপারের দিকে যেতে লাগল।

তিনদিন তিনরাত সমুদ্রের জলে কুমীরের পিঠের ওপর তার কেটে গেল।

তারপর সাত সমুদ্রের ওপারে যেয়ে কুমীর ছোটবৌয়ের ছেলেকে নিয়ে হাজির হ'ল। কুমীরের পিঠ থেকে তীরে নেমে সে কুমীরকে ব'ললে, 'তুমি তাহ'লে এই সমুদ্রের ধারেই অপেক্ষা কর। আমি মন্দির থেকে ফিরে আসি।' কুমীর অপেক্ষা ক'রতে লাগল আর ছোটবৌয়ের ছেলে দূরে মন্দিরের দিকে চ'লে গেল।

মস্ত বড় মন্দির। মন্দিরে ঢোকবার পথে অনেক বাঘ-ভালুক, ভূত-প্রেত তাকে ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু কাউকেই সে গ্রাহ্য ক'রলে না। সটান মন্দিরের ভেতর কালী মূর্তির সামনে যেয়ে হাজির হ'ল। মূর্তিকে প্রণাম ক'রে মূর্তির মুখের দিকে চেয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের ভেতর থেকে গম্‌গম্‌ ক'রে শব্দ হল, 'সন্ন্যাসী বড় অত্যাচারী হ'য়ে উঠেছে। সে মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে। আমি তোরই অপেক্ষায় ছিনু। যে-জন্যে এসেছিস তাই কর তুই। কোন ভয় নেই।'

এবার মূর্তির পেছনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কালীর মাথা থেকে ময়না পাখীটাকে ধ'রে নিলে। তারপর মন্দিরের মেঝেতে এক আছাড় দিয়ে দিতেই পাখীটা ধড়ফড় ক'রে মরে গেল।

আবার মন্দিরের ভেতর থেকে শব্দ উঠল, 'কুমীরের গলা থেকে আর ঐ তেতো আমগাছের গোড়া থেকে যা বেরোবে তা' তুই বাড়ি নিয়ে যাবি।' ছোটবৌয়ের ছেলে ব'ললে, 'মা, কেমন ক'রে সে সব পাবো ?'

আবার শব্দ হ'ল, 'কুমীরের গায়ে আমার চান-জল ছিটিয়ে দিবি। আর আম-গাছের গোড়াটা একটা কাঠি দিয়ে খুঁড়বি। তা হ'লেই হবে। আর জীবনে যেন কোনদিন মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার করিস না। তা হ'লে আমি ক্ষমা ক'রবো না।'

কালী মূর্তিকে প্রণাম ক'রে একটা ছোট ভাঁড়ে ক'রে এক ভাঁড় চানজল নিয়ে মন্দির থেকে এসে সমুদ্রের ধারে কুমীরের কাছে হাজির হ'ল। চানজল কুমীরের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই কুমীরের গলার ভেতর থেকে এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারী বেরিয়ে এল। আর কুমীরও আরাম পেয়ে মুখে শব্দ ক'রলে, 'আঃ বাচনু! আমার বড় আরাম হ'ল।' ছোটবৌয়ের ছেলে রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে কুমীরের পিঠে চ'ড়ে ব'সল। কুমীরও জলে ভেসে ভেসে চ'লতে লাগল। এবার দু'দিনেই সাত সমুদ্রের এপারে নিয়ে এসে হাজির ক'রলে।

তীরে নেমে কুমীরের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে ছোটবৌয়ের ছেলে রাজকন্যাকে সঙ্গে ক'রে চ'লতে লাগল।

দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যে হ'ল। তারা সেই তেতো আমের গাছটার কাছে এসে হাজির হ'ল।

ছোটবৌয়ের ছেলে একটা কাঠি নিয়ে আমগাছের গোড়ার মাটি অল্প একটু খুঁড়তেই মাটির ভেতর থেকে একটা ঘড়া বেরিয়ে এল। ঘড়ায় এক ঘড়া মোহর। মোহর ভর্তি ঘড়া মাথায় নিয়ে রাজকন্যাকে সঙ্গে ক'রে ছোটবৌয়ের ছেলে সন্ন্যাসীর ঘরে এসে হাজির হ'ল। দেখলে সন্ন্যাসী ম'রে গেছে আর তার মা ছেলের অপেক্ষায় ঘর আর বার ক'রছে।

ছোটবৌ ছেলেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে ব'ললে, 'তুই তাহ'লে সাত সাতটা সাগর পেরিয়ে কালী মন্দিরে গিয়েছিলি বাবা!'

ছেলে মাকে সব ব'ললে।

রাজকন্যা ছোটবৌকে প্রণাম ক'রে ব'ললে, 'আপনার ছেলেকে মনে মনে আমি স্বামীত্বে বরণ ক'রেছি। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মা। আপনাদের কাছে থাকতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

এবার ছোটবৌয়ের ছেলে মা, রাজকন্যা ও মোহরের ঘড়া সঙ্গে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হ'ল।

বাড়ির কাছাকাছি এসেই সাতটা তালগাছ দেখতে পেলে। সেই তালগাছ সাতটায় কালীর চানজল ছিটিয়ে দিতেই সাতভাই আবার মানুষ হ'য়ে গেল। এবার সবাই মিলে বাড়িতে এসে হাজির হ'ল। বাড়ির সবাই তাদের কাছে ছুটে এল। পাড়ার লোকেও এক দুই ক'রে দেখে যেতে লাগল।

একটা শুভদিন দেখে রাজকন্যার সঙ্গে ছোটবৌয়ের ছেলের বিয়ে হ'য়ে গেল। অনেক লোকজন খেলে। সবাই মিলে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

মনিষ্যি জন্ম

এক ছিল রাজা। রাজা একদিন তার সভাসদদের সামনে ব'ললে, 'আমার মনে একটি বড় রকমের প্রশ্ন জেগেছে।'

রাজার মুখের দিকে সবাই চাইলে। মন্ত্রী রাজাকে বললে, 'কী প্রশ্ন মহারাজ?'

রাজা ব'ললে, 'এ জন্মে কী এমন দান ক'রলে পরের জন্মে আবার মনিষ্যি হ'য়ে জন্মাতে পাবো?'

রাজার কথা শুনে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লাগল।

মন্ত্রী ব'ললে, 'না মহারাজ, ও প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না।'

এরপর সবাই একে একে মাথা নেড়ে রাজাকে 'না' ব'ললে।

এবার ডাক প'ড়ল রাজবাড়ির পুরোহিতের। পুরোহিত রাজার সামনে এসে হাজির হ'ল। ব'ললে, 'মহারাজ, আমাকে আপনি ডেকেছেন কেন?'

রাজা তার প্রশ্নটা পুরোহিতকে শুনিয়ে দিতেই কিছুক্ষণের জন্যে পুরোহিতের কথা বন্ধ হ'য়ে গেল। তারপর পুরোহিত ব'ললে, 'মহারাজ, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া বড় শক্ত। আমাকে অন্ততঃ সাতদিন সময় দিতে হবে।'

রাজা পুরোহিতকে ব'ললে, 'বেশ, তাই হবে। কিন্তু মনে রাখবেন—আপনি রাজবাড়ির পুরোহিত। আমার এই রাজ্যে আমি তেত্রিশ কোটি দেবতার পুজোর ব্যবস্থা ক'রেছি। কোথাও কোন ত্রুটি আমি রাখিনি। যদি ভণ্ডামী করেন তবে আপনাকেও আমি রেহাই দোব না। আমার প্রশ্নের জবাব আপনাকে যে ভাবেই হোক দিতে হবে।'

রাজার কাছে বিদেয় নিয়ে খুব চিন্তিত হ'য়ে পুরোহিত বাড়ি চ'লে এল।

বাড়িতে এসে সব সময় মনমরা হ'য়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়াও ভাল ক'রে করে না। পুরোহিতের বৌ তা লক্ষ্য ক'রে স্বামীকে ব'ললে, 'তোমার কী হ'য়েছে? অত ভাবছো কেন বলতো?' পুরোহিত রাজার প্রশ্নের কথা বৌকে ব'ললে। বৌ শুনে ব'ললে, 'রাজা তো অন্যায় কিছু বলেনি। তুমি ব্রাহ্মণ। তোমার জন্যে রাজা অনেক খরচ-খরচা করে। রাজা তোমার কোন অভাব ব'লতে রাখেনি। তুমি তপজপ করো। ঠাকুর দেবতার পুজো করো। তোমার তো ঐ—প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত।' পুরোহিত ব'ললে, 'তা তো উচিত। কিন্তু আমি কি ঠাকুরকে সেরকম যজাতে পেরেছি? আমি তো শুধু মন্ত্র ব'লেছি আর খেয়েছি।'

বৌ ব'ললে, 'তাহ'লে এবার কী ক'রবে তুমিই ভাবো।'

পুরোহিতের একটি ছেলে ছিল। সে পাঠশালা থেকে ফিরে এসে দেখলে—তার মা বাবা দু'জনেই খুব চিন্তিত।

ছেলে মাকে ব'ললে, 'মা, তোমরা কী এত ভাবছো বলতো?'

মা ছেলেকে ব'ললে, 'আমি জানিনা যা। তোর বাবাকে জিজ্ঞেসা ক'রগে।'

ছেলে বাবার কাছে গেল। বাবাকে ব'ললে, 'বাবা, তুমি এত ভাবছো কেন?'

পুরোহিত ছেলেকে সব কথা ব'ললে। ছেলে শুনে ব'ললে, 'অত ভাবনার কী আছে বাবা ? আমি তো আছি। আমিই তোমায় নিশ্চিন্ত ক'রবো।'

পুরোহিত ব'ললে, 'তুই ছোট ছেলে। তুই আবার কী ক'রবি ?'

ছেলে ব'ললে, 'আমি রাজার কাছে যাবো।'

পুরোহিত ব'ললে, 'রাজার কাছে যেয়ে তুই কী বলবি ?'

ছেলে ব'ললে, 'যা ব'লতে হয় আমি রাজার সামনেই ব'লবো।'

পুরোহিত ব'ললে, 'তুই কি রাজার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবি বাবা ?'

ছেলে ব'ললে, 'দেখিই না। আমি যদি বামুনের ছেলে হই আর সতীর গর্ভে জন্ম নিয়ে থাকি তবে নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের জবাব আমি রাজাকে দিতে পারবো।'

পুরোহিত ব'ললে, 'বেশ, তা যদি পারিস তবে রাজবাড়িতে আমার মান থাকে বাবা।'

একদিন বাদে পুরোহিতের ছেলে রাজার কাছে গেল। রাজাকে ব'ললে, 'মহারাজ, আমার বাবাকে আরও কিছুদিন সময় দিতে হবে।'

রাজা ব'ললে, 'কতদিন ?'

পুরোহিতের ছেলে ব'ললে, 'আরও সাতদিন।'

রাজা ব'ললে, 'বেশ, আর দিন সাতেক সময় তোমার বাবাকে দেওয়া হ'ল।'

ছেলে রাজার কাছ থেকে ফিরে এসে বাবাকে ব'ললে, 'সাত দিনের ভেতর আমি তোমাকে রাজার প্রশ্নের জবাব এনে দোব। তারপর তুমি রাজাকে ব'লে এস।'

পুরোহিত তার ছেলের কথা শুনে অবাক হ'য়ে গেল।

মনে মনে ভাবতে লাগল, ছেলে কী ক'রে ও প্রশ্নের জবাব দেবে।

পরের দিন খুব ভোর ভোর পুরোহিতের ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এটা-সেটা চিন্তা ক'রতে ক'রতে রাস্তা চ'লতে লাগল। বহু গ্রাম-সহর, বন-জঙ্গল, নদী-নালা পেরিয়ে এক সমুদ্রের ধারে যেয়ে পেঁছিল। দেখলে, এক মুনি সমুদ্রস্নান ক'রে তীরে ব'সে একমনে তপজপ ক'রছে। পাশেই থাকবার জন্যে মুনির একটি কুঁড়ে ঘর আছে।

পুরোহিতের ছেলে মুনির পাশে যেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মুনির কোন দিকে খেয়াল নেই। তপজপেই মগ্ন।

কিছুক্ষণ পরে মুনির খরম জোড়া নিজের কাপড় দিয়ে মুছে ঠিকমত সোজা ক'রে রেখে দিয়ে মুনির কুঁড়ের মধ্যে যেয়ে হাজির হ'ল। দেখে বুঝতে পারলে, মুনি যেটুকু জায়গায় শোয় শুধু সেইটুকু জায়গা কিছু পরিষ্কার, বাকি আশপাশ সবই অপরিষ্কার। ঘাস-পালায় বনজঙ্গল হ'য়ে আছে। কোমরে কাপড় বেঁধে পুরোহিতের ছেলে কিছুক্ষণের মধ্যে মুনির কুঁড়ের ভেতর-বার পরিষ্কার ক'রে ঝকঝকে তকতকে ক'রে ফেললে। তারপর একটু দূরে যেয়ে চুপচাপ ব'সে রইল।

কিছুক্ষণ পরে মুনির তপজপ শেষ হ'ল। চোখ মেলে চাইলে। খরমের দিকে

চোখ প'ড়তেই মুনি মনে মনে ভাবতে লাগল—কে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে আমার খরমজোড়া সোজা ক'রে রেখে গেল !

ভাবতে ভাবতে খরম পায়ে দিয়ে মুনি কুঁড়ের মধ্যে এল। কুঁড়েয় এসে আরও অবাক হ'ল। ভাবলে, কুঁড়ের মধ্যে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবে কে এমন ক'রে আমার কুঁড়ে পরিষ্কার ক'রে দিলে !

মুনির খুব আনন্দ হ'ল। সে কুঁড়ের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে ব'ললে, 'যে আমার খরম যত্ন ক'রে সোজা ক'রে রেখেছিলি, যে আমার কুঁড়েকে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিস সে যদি ভণ্ড হ'স তবে ভস্ম হ'য়ে যা। আর যদি মনের ভক্তিতে ক'রে থাকিস তবে তোর যেন মনোবাসনা পূর্ণ হয়।'

একথা শুনতে পেয়ে পুরোহিতের ছেলে মুনির সামনে এসে মুনিকে ভূমিষ্ট হ'য়ে পেন্নাম ক'রলে। মুনি তার দিকে চেয়ে ব'ললে, 'কে তুই ?'

সে ব'ললে, 'বাবা, আমি অমুক দেশ থেকে আসছি। আমিই আপনার খরম সোজা ক'রে দিয়েছি। কুঁড়েও পরিষ্কার ক'রেছি।'

মুনি ব'ললে, 'আমি খুবই সন্তুষ্ট হ'য়েছি। তা', কীজন্যে এখানে এসেছিস বেটা ?'

পুরোহিত-পুত্র ব'ললে, 'আমি এক বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি বাবা।'

—'কী বিপদ ?'

পুরোহিতের ছেলে মুনিকে সব ব্যাপার জানালে। শেষে ব'ললে, 'আমার বাবা ব্রাহ্মণ-সন্তান হ'য়েও ঠাকুর-দেবতাকে চিয়াতে পারেনি। তাই রাজার প্রশ্নের জবাবও জানতে পারেনি। আপনি আমার বাবার মান বাঁচান।'

মুনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ব'ললে, 'ও প্রশ্নের জবাব আমিও দিতে পারবো না।'

পুরোহিতের ছেলে মুনিকে ব'ললে, 'আপনি একটু আগে বললেন—যে আপনার কুঁড়ে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে তার মনোবাসনা পূর্ণ হোক। তাহ'লে আমার মনোবাসনা কি পূর্ণ হবে না ?'

একটু ভেবে মুনি ব'ললে, 'আমি যখন মুখ থেকে ওকথা বার ক'রেছি তখন তোর মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। তবে আমার কাছে কিছু হবে না।'

—'তবে কোথায় হবে বাবা ?'

—'আমার গুরুর কাছে যেতে হবে।'

—'আপনার গুরু কোথায় থাকেন ?'

—'তিনি থাকেন কৈলাসে।'

—'বাবা, তাহ'লে আমার কী উপায় হবে ?'

—'কথা যখন ক'য়ে ফেলেছি তখন কৈলাসেই যেতে হবে।'

—'আমি কোথায় থাকবো ?'

—'তুইও আমার সঙ্গে চ'। তোরও কৈলাস দেখা হ'য়ে যাবে।'

এই ব'লে পুরোহিতের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মুনি কৈলাসের দিকে রওনা হ'ল।

কৈলাসে পেঁছে একেবারে শিব-দুর্গার সামনে যেয়ে পেন্নাম ক'রে দাঁড়াল।

পুরোহিতের ছেলেকে ব'ললে, 'এঁরাই আমার গুরু।'

পুরোহিতের ছেলেও পেন্নাম ক'রলে।

শিব মুনিকে ব'ললেন, 'কী মনে ক'রে এসে পড়লি?'

মুনি ব'ললে, 'গুরুদেব, আমি বড় বিপদে প'ড়ে গেছি।'

—'কী আবার তোর বিপদ হ'ল?'

—'আমি এই ছেলেটিকে বর দিয়ে ফেলেছি—তোর মনোবাসনা পূর্ণ হোক। ছেলেটির বাবা জানতে চায় কী দান ক'রলে আবার মনিষ্যি হ'য়ে জন্মাতে পারা যাবে। আমি ব'লতে পারিনি। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।' শিব কিছুক্ষণ চুপ-চাপ থেকে ব'ললেন, 'একথা আমি তো ব'লতে পারবো না।'

—'তাহ'লে কী হবে গুরুদেব? আমার বর দেওয়া কি মিথ্যে হ'য়ে যাবে?'

একটু ভেবে নিয়ে শিব ব'ললেন, 'এ প্রশ্নের সমাধান ক'রতে হ'লে বৈকুণ্ঠে যেতে হবে। সেখানেই যদি কিছু হয়।' তারপর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সোজা বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণের কাছে যেয়ে হাজির হ'ল।

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ ব'সে ব'সে আরামে গল্প-গুজব ক'রছিলেন। শিবকে দেখে নারায়ণ ব'ললেন, 'কী কারণে তোমরা এখানে এসে হাজির হ'লে?'

সবাই লক্ষ্মী-নারায়ণকে প্রণাম ক'রলে। শিব পুরোহিতের ছেলেকে দেখিয়ে নারায়ণকে একটি একটি ক'রে সব কথা বললে।

সব শুনে নারায়ণ ব'ললেন, 'একথার জবাব আছে। কিন্তু এসব কথা নরলোকে বলা চ'লবে না।'

শিব ব'ললেন, 'না ব'ললে আমার শিষ্যের কথার দাম থাকে না আর পুরো-হিতেরও রাজার কাছে মান থাকে না। একটা কিছু কিনারা আপনাকে ক'রে দিতেই হবে।' কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নারায়ণ ব'ললেন, 'একথা আমি ব'লবো না। তবে এই ছেলেটিকে আমি কিছু ব'লে দিচ্ছি। যা যা ব'লে দোব সেইমত কাজ হ'লে এ প্রশ্নের জবাব মিলে যাবে।'

শিব ব'ললেন, 'সেই ভাল। নিজে কাজ ক'রে প্রশ্নের জবাব নিজেই জোগাড় ক'রে নেবে।'

পুরোহিতের ছেলেও তাতে রাজি হ'য়ে গেল।

নারায়ণ এবার ছেলেটিকে ব'ললেন, 'অমুক দেশে হৈ হৈ নামে এক রাজা আছে। রাণী সন্তান সম্ভবা। প্রসব বেদনা উঠেছে। কয়েকদিন ধ'রে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। অনেক বোদ্যি কোবরেজ এসেও কিছু ক'রতে পারেনি। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না। এজন্যে হৈ হৈ রাজা খুবই চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে। তুমি তোমার রাজাকে বলগে সে যেন ঐ হৈ হৈ রাজার কাছে যায়। হৈ হৈ রাজাকে ব'লে ক'য়ে রাণীর কাছে যেয়ে রাণীকে ছুঁলেই রাণী সন্তান প্রসব ক'রবে। আর সেই শিশুই তখন তোমার রাজাকে ব'লবে, কী ক'রলে আবার মনিষ্যি জন্ম লাভ করা যায়।'

নারায়ণের কথা শুনে সবাই বৈকুণ্ঠ ছেড়ে চ'লে এল।

পুরোহিতের ছেলেও বাড়িতে এসে পেঁছিল।

পুরোহিত তার ছেলেকে ব'ললে, 'রাজার প্রশ্নের কিছু কিনারা হ'ল বাবা ?'

ছেলে জবাব দিলে, 'হয়েছে। আমিই সেকথা রাজবাড়িতে যেয়ে রাজাকে ব'লে আসবো।'

পরের দিন পুরোহিতের ছেলে রাজার কাছে গেল। রাজা তার প্রশ্নের কথা তুলতেই পুরোহিতের ছেলে রাজাকে সব ব'ললে।

রাজা শুনে মন্ত্রীকে ডেকে ব'ললে, 'মন্ত্রী, আমি দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাবো। রাজ্যের কোথাও যেন কোন অসুবিধে না হয়।'

মন্ত্রী ব'ললে, 'না মহারাজ, কোন অসুবিধেই হবে না।'

পরের দিন খুব ভোর ভোর রাজা সন্ন্যাসীর বেশে হৈ হৈ রাজার কাছে যাবার জন্যে বেরিয়ে প'ড়ল।

বহুদূর যাবার পর এক বিরাট জঙ্গল প'ড়ল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। তবুও জঙ্গল আর শেষ হয় না। জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় দেখলে, একটা ঘর। সেই ঘরের দরজায় যেয়ে সে বললে, 'মা, আজ রাতের মতো আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে।'

ঘর থেকে এক ব্যাধ আর ব্যাধিনী বেরিয়ে এল। দুয়ারে সন্ন্যাসী দেখে আগ বাড়িয়ে এসে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। সন্ন্যাসীকে ব্যাধ ব'ললে, 'রাতে থাকার কোনই অসুবিধা হবে না। তবে খাওয়া-দাওয়ার হয়ত আপনার খুবই অসুবিধা হ'তে পারে। কারণ আজ দু'সের চাল জোগাড় ক'রেছি। আলু-ভাতে ভাত কোন রকমে দিতে পারি।'

সন্ন্যাসীবেশী রাজা ব'ললে, 'তা হলেই আমার যথেষ্ট হবে।'

রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। সন্ন্যাসীবেশী রাজাকে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুতে দিলে। ব্যাধিনী ঘরের বাইরে শুয়ে রইল। আর ব্যাধ তীরধনুক নিয়ে দুয়ারে পাহারা দিতে লাগল।

রাতের প্রথম প্রহরে এক বিরাট ময়াল সাপ ব্যাধের ঘরের দিকে এগিয়ে এল। এক তীরে ব্যাধ সাপটাকে মেরে ফেললে।

দ্বিতীয় প্রহরে একটা বাঘ হাঁকাড় দিতে দিতে ব্যাধের কাছে এসে প'ড়তেই ব্যাধ সেটাকেও তীর বিঁধে শেষ ক'রে দিলে।

তৃতীয় প্রহরে এল একটা সিংহ। সেও ব্যাধের তীরে প্রাণ দিলে।

রাতের চতুর্থ প্রহরে ব্যাধ ঘুমিয়ে গেল। যেই ঘুমিয়েছে অমনি একটা রাক্ষস এসে ব্যাধকে ধরলে। ব্যাধ চীৎকার ক'রে ব'ললে, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, আমাকে রাক্ষসে ধরে নিয়ে বনের মধ্যে চ'লে যাচ্ছে। ব্যাধিনী রইল। তাকে একটু দেখো।'

চীৎকারে ব্যাধিনী ও সন্ন্যাসীবেশী রাজা দু'জনেই জেগে প'ড়েছে।

রাক্ষসটা ব্যাধকে বনের মধ্যে একটু দূরে নিয়ে যেয়ে খেয়ে ফেললে।

ব্যাধিনী কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে, 'সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি না এলে আমার স্বামীকে রাক্ষসে খেত না।'

সন্ন্যাসীবেশী রাজা ব'ললে, 'সত্যিই তাই। কিন্তু আমি আর কী ক'রবো।'

সকাল হ'ল। রাজা ব্যাধিনীকে ব'ললে, 'তোমার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই ক'রবো। তবে এখন নয়। আমি হৈ হৈ রাজার কাছে যাচ্ছি। ফেরবার পথে তোমার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই ক'রে যাবো।'

রাজা হৈ হৈ রাজার কাছে যাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ল।

রাজবাড়িতে পেঁাছে রাজা দেখলে বোদ্যি, কোবরেজ, লোকজন প্রচুর জড়ো হ'য়েছে রাজবাড়িতে। রাণী কয়েকদিনই হ'ল প্রসব বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে। সন্ন্যাসী-বেশী রাজা হৈ হৈ রাজাকে ব'ললে, 'আমি একবার রাণীমাকে দেখবো। আমি গেলে হয়ত রাণীর কষ্ট দূর হ'য়ে যেতে পারে।'

হৈ হৈ রাজা সন্ন্যাসীকে অন্দরে যাবার অনুমতি দিলে। সন্ন্যাসীবেশী রাজা রাণীর কাছে গেল। দেখলে যন্ত্রণায় রাণী আছাড়-কাচাড় ক'রছে।

'কী হ'য়েছে' ব'লে সন্ন্যাসীবেশী রাজা রাণীর গায়ে একটা হাতের আঙুল ছুঁইয়ে দিতেই রাণীর একটি বেটা ছেলে ভূমিষ্ট হ'ল। এককান দু'কান ক'রে খবরটা সব জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ল। রাজবাড়িতে উৎসব শুরু হ'য়ে গেল।

এদিকে শিশু ভূমিষ্ট হ'য়েই সন্ন্যাসীবেশী রাজাকে ব'ললে, 'রাজা, তুমি কি ব্যাধের ঘরে রাতে ছিলে?'

রাজা ব'ললে, 'হ্যাঁ।'

শিশু ব'ললে, 'ব্যাধকে কি কোন রাক্ষসে খেয়ে ফেলেছে?'

—'হ্যাঁ।'

শিশু ব'ললে, 'আমি সেই ব্যাধ। আমাকেই রাক্ষস ধ'রে খেয়েছিল। এখন আমি এই রাজার ঘরে জন্মানু।'

রাজা সেকথা শুনে অবাক হ'য়ে শিশুর দিকে চেয়ে রইল।

শিশু আবার ব'ললে, 'ব্যাধ হ'য়ে তোমাকে অন্নদান ক'রেছিনু ব'লেই আমি আজ আবার মনিষ্যি হ'য়ে জন্মেছি।'

রাজা জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'অন্নদান ক'রলেই পুণ্য বেশী হয়?'

শিশু ব'ললে, 'হ্যাঁ, অন্নদানের মতো দান নাই। যে অন্ন দান করে, কেবল সেই-ই বারবার মনিষ্যি জন্ম লাভ ক'রতে পারে।'

এরপর রাজা হৈ হৈ রাজার বাড়ি থেকে দেশে ফিরে এল। পথে ব্যাধের ঘরে দেখে এল ব্যাধিনী নেই। ব্যাধের ঘর শূন্য।

দেশে ফিরে রাজা দিনের পর দিন বহু লোকজন খাওয়াতে লাগল। আর রাজ-পুরোহিতের ছেলেকে অনেক টাকা কড়ি, সোনাদানা উপহার দিলে। পুরোহিতও নিশ্চিন্ত হ'ল।

ধার্মিক রাজা

কোনো দেশে এক ধার্মিক রাজা ছিল। সেই রাজার রাজ্যের মধ্যে একটা বনে একদিন এক শিকারী তীর-ধনুক নিয়ে শিকার ক'রতে এল। জানতে পেরে বনের পশুরা বন থেকে ছুটে এসে ধার্মিক রাজার কেউ কাঁধে, কেউ মাথায়, কেউ বা পিঠে উঠে প'ড়ল। সেখানে তারা আশ্রয় নিলে। বনের একটা অজগর সাপ ছুটে এসে রাজার মুখের ভেতর দিয়ে যেয়ে পেটে আশ্রয় নিলে। শিকারী বন থেকে চ'লে যেতেই বাঘ, ভালুক, হরিণ সবাই ধার্মিক রাজার কাছ থেকে আবার বনে চ'লে গেল, কিন্তু অজগরটা রাজার কাছ থেকে গেল না। সে ধার্মিক রাজার পেটের ভেতর র'য়ে গেল। রাজার পেট খুব উঁচু হ'য়ে রইল। কিছুদিনের মধ্যে রাজা খুব গরীব হ'য়ে প'ড়ল। তাই মনের দুঃখে অন্যদেশ চ'লে গেল। ভিখিরী রাজা। ভিক্ষে ক'রে খায়। সেই দেশের লোকেরা ভিখিরীকে একটা কুঁড়ে ঘর ক'রে দিলে। সে সেই ঘরে থাকে আর বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বেচে কিছু আয় করে। তাতেই তার কোনো রকমে চ'লে যায়।

ঐ দেশের রাজার সাত মেয়ে। রাজা একদিন তার মেয়েদিকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'তোমরা কার ভাগ্যে খাও?' সবাই ব'ললে—বাবার ভাগ্যে। শুধু ছোট মেয়ে ব'ললে, 'আমি নিজের ভাগ্যে খাই।'

ছোট মেয়ের কথায় রাজা রেগে মনে মনে ঠিক ক'রলে, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আগে যার মুখ দেখবো তার সঙ্গেই ছোটমেয়ের বিয়ে দোব। পরের দিন সকালে রাজা ঘুম থেকে উঠেই সেই পেট উঁচু কাঠুরিয়ার মুখ দেখলে। তার সঙ্গেই ছোট মেয়ের বিয়ে দিলে। ছোট রাজকন্যা কাঠুরিয়া স্বামীর সঙ্গে সেই মাটির ঘরে থাকতে লাগল। দু'জনেই বনে কাঠ কাটে, আর বাজারে বিক্রি করে। ছোট রাজকন্যা কিছু কিছু পয়সা জমায়। এমনি ক'রে অনেক পয়সা হ'ল। স্বামীর উঁচু পেট দেখে একদিন রাজকন্যা খুব গোপনে রাজবাড়িতে তার মায়ের কাছে যেয়ে বারো বছরের জমানো আমানি নিয়ে এসে স্বামীকে খাইয়ে দিলে। বিষের মতো সেই আমানি পেটে যেতেই পেটের ভেতর অজগর সাপ মরে গেল। কিছু দিনের মধ্যে ধার্মিক রাজার পেট যেমনকার তেমনি হ'য়ে গেল। কাঠের ব্যবসায় অনেক টাকাকড়ি হ'ল। বাড়ি হল বিরাট। ওদিকে রাজকন্যার বাবা খুব গরীব হ'য়ে গেল। রাজকন্যার বাবা মেয়ের কাছে ভিক্ষে চাইতে এল। একদিন হাজার টাকা বাবাকে দিলে। পরের দিন আবার এলে ভিক্ষে তো দিলেই না, বাবাকে ব'ললে, 'আমি নিজের ভাগ্যে খাই, তুমিও নিজের ভাগ্যে খাওগে।' রাজকন্যার বাবা সেখান থেকে চলে গেল। ধার্মিক রাজা ছোট রাজকন্যাকে নিয়ে সুখে বাস ক'রতে লাগল।

পেয়ে হারানো হারিয়ে পাওয়া

কোনো গাঁয়ে একটা আধভাঙা শিবমন্দির ছিল। সেই মন্দিরে এক গরীব বামুন রোজ পুজো ক'রত। বাইরের ভাল রকম যাত্রীপত্তর কেউ মন্দিরে পুজো দিতে আসত না ব'লে বামুনের তেমন রুজি-রোজগারও হ'ত না। দিনে দিনে সে বড়ই অভাবের মধ্যে প'ড়ে গেল।

একদিন পুজোটুজো শেষ ক'রে বামুন শিবলিঙ্গের সামনে হাতজোড় ক'রে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'হে বাবা বুড়ো শিব, খাদ্য বেগরে আমি আর বাঁচিনা। আমাকে একটু দয়া করো বাবা। আমার অভাব মোচন ক'রে দাও ঠাকুর। যদি তুমি কিছু না করো তবে এই মন্দিরের দেয়ালে মাথা ঠুকে এ প্রাণ আমি শেষ ক'রবো।'

অনেকক্ষণ ধ'রে কান্নাকাটি করবার পর বামুনের সামনে শিব এসে হাজির হ'লেন। বললেন, 'হ্যাঁরে ব্যাটা, কান্নাকাটি ক'চ্ছিস কেন? তোর খুব অভাব। তাই না? বেশ, এই ভাঙা পাখাটা রেখে দে। এটা নিয়ে বাড়ি চ'লে যা।'

শিবকে প্রণাম ক'রে ভাঙা হাতপাখাটা নিয়ে বামুন বাড়ি চ'লে এল। গরম কাল। খুব গরম প'ড়েছে। বামুন সেই ভাঙা পাখাটা নিয়ে হাওয়া ক'রতে লাগল। যেই মাত্র পাখাটা দোলাতে শুরু ক'রেছে অমনি পাখা থেকে নানা রকমের ফল, মিষ্টি ইত্যাদি ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে প'ড়তে লাগল। বামুন তো অবাক। দু'চারটে ফল, মিষ্টি মুখে দিয়ে দেখলে সেগুলো অসম্ভব মিষ্টি। সে তখন বুঝলে, পাখাটা শিবের দেওয়া তাই এমন হ'চ্ছে। ভাঙাপাখা যত নাড়ে ততই ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে নানান জিনিস প'ড়তে থাকে। বামুন সেগুলোর কিছু নিজে নেয়, কিছু পাড়ার লোকজনকে দেয়, বাকি বাজারে বিক্রী ক'রে টাকা পয়সা পায়।

কিছুদিনের মধ্যে বামুনের অভাব-অনটন ঘুচে গেল। তার অবস্থাও বেশ ভাল হ'য়ে এল।

এক কান দু'কান ক'রে কথাটা ঐ দেশের রাজার কানে পৌঁছে গেল। রাজার হুকুমে রাজার লোকজন এসে বামুনের কাছ থেকে ভাঙা পাখাটা জোর ক'রে নিয়ে গেল রাজবাড়িতে।

কিছুদিনের মধ্যে বামুনের অবস্থা আবার যা'কে তাই হ'য়ে গেল।

অভাবে প'ড়ে আবার একদিন শিবমন্দিরে ঠাকুরের সামনে কাঁদতে লাগল। মহাদেব বামুনের সামনে এসে হাজির হ'লেন। ব'ললেন, 'কিরে ব্যাটা, আবার কান্নাকাটি শুরু ক'রলি কেন? তোকে তো ভাঙা পাখা দিয়েছি। তাতে তোর কিছু হয়নি?'

বামুন শিবকে প্রণাম ক'রলে। তারপর হাতজোড় ক'রে ব'ললে, 'বাবা, হ'য়েছিল তো ভালই। কিন্তু রাজার লোক এসে জোর ক'রে আপনার দেওয়া পাখাটা নিয়ে চ'লে গেছে।' সব শুনে শিব ব'ললেন, 'রাজার লোকে পাখা নিয়ে চলে গেছে? আচ্ছা, এবার এই ছাগলটা দিচ্ছি। এটা নিয়ে বাড়ি চ'লে যা।' এই ব'লে শিব বামুনকে একটা ছাগল দিয়ে স্বর্গে চ'লে গেলেন।

বামুন ছাগলটা কাঁধে নিয়ে মন্দিরের বাইরে কিছু দূরে এসে এক পুকুরের পাড়ে ব'সল। ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল, পাখাটা ছিল ভাল। এ ছাগল নিয়ে আমার কী হবে? এরকম ভাবতে ভাবতে মনের দুঃখে বিরক্ত হ'য়ে ছাগলটার পেটে মারলে এক কিল। অমনি ছাগলের পেছন দিয়ে মণি মুক্তো ঝর্ ঝর্ ক'রে প'ড়তে লাগল।

বামুন দেখেই অবাক্। মণিমুক্তো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ছাগলকে কাঁধে নিয়ে মনের আনন্দে বাড়ি চ'লে এল।

বামুন ছাগলটাকে খুবই যত্ন করে। আর তার পেটে কিল মারে। কিল মারার সঙ্গে সঙ্গে ছাগলটা রাশি রাশি মণিমুক্তো নাদে। কিছুদিনের মধ্যেই বামুনের অবস্থা আবার ফিরে গেল। সে বাড়ি-ঘর ক'রলে। প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হ'য়ে গেল।

বামুনের ছাগলের কথাও রাজার কাছে পেঁছে গেল। রাজা বামুনের কাছে লোক পাঠালে। রাজার লোক বামুনের কাছ থেকে ছাগলটাও জোর ক'রে নিয়ে চ'লে গেল।

পাখা, ছাগল দু'টোই রাজা নিয়ে নিতে বামুনের মনে খুব কষ্ট হ'ল। সে মনের দুঃখে আবার শিবমন্দিরে যেয়ে শিবকে ডাকতে লাগল।

শিব এসে বামুনের সামনে হাজির হ'লেন।

বামুন শিবকে প্রণাম ক'রে ব'ললে, 'বাবা, আপনি দিলে কী হবে। আমার তো কিছুই ভোগ হ'চ্ছে না। সবই রাজা নিয়ে নিচ্ছে।'

শিব বললেন, 'আচ্ছা। এবার এই লাউটা নিয়ে যা।' এই ব'লে বামুনকে একটা লাউ দিয়ে শিব স্বর্গে চ'লে গেলেন।

লাউটা কাঁধে নিয়ে বামুন মন্দির থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ালে। মাঠে এসে একটা জমির পগারে ব'সল। ব'সে ভাবতে লাগল—পাখা, ছাগল যখন আমার সইল না তখন এই লাউটা শুধু শুধু ব'য়ে নিয়ে যেয়ে আমার কী হবে? এই ভেবে লাউটাকে মাটিতে মারলে এক আছাড়। লাউটা দু'খানা হ'য়ে গেল। অমনি লাউয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন সেপাই। সেপাই দু'টো দেখে বামুন ভয়ে একেবারে জড়সড় হ'য়ে গেল। সেপাই দু'জন বামুনকে ব'ললে, 'আমাদের ভয় খাবেন না। আমরা আপনার হুকুমের দাস। যা হুকুম করবেন আমরা তাই ক'রবো।' তাদের কথা শুনে বামুন একটু ভরসা পেয়ে ব'ললে, 'বেশ, তোমরা যদি আমার হুকুম তামিল করো তবে এ-দেশের রাজার কাছ থেকে আমার পাখা আর ছাগলটাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এস।'

হুকুম পেয়ে সেপাই দু'জন ছুটল রাজার কাছে। যাবার সময় বামুনকে তারা ব'লে গেল ঐ ভাঙা লাউয়ের কাছে ব'সে থাকতে।

সেপাইরা রাজার কাছে যেয়ে রাজাকে ব'ললে, 'বামুনের কাছ থেকে যে ভাঙা-পাখা আর ছাগল তুমি নিয়ে এসেছ তা আমাদের দিয়ে দাও।'

রাজা রেগে ব'ললে, 'কে হে তোমরা ? কিছুতেই আমি পাখা, ছাগল দোব না। তোমরা এখান থেকে দূর হ'য়ে যাও।'

সেপাই দুজনার সঙ্গে রাজার খুব কথা কাটাকাটি হ'ল। তারপর যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেল। যুদ্ধে রাজার মৃত্যু হ'ল। সেপাই দু'জন পাখা আর ছাগল উদ্ধার ক'রে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে সোজা বামুনের কাছে চ'লে এল। বামুনের হাতে সেগুলো দিয়ে ব'ললে, 'আমরা আবার ঐ লাউটার ভেতর ঢুকে যাচ্ছি। আপনি দু'খণ্ড লাউকে এক কাছে ক'রে দেবেন।'

দেখতে দেখতে সেপাই দু'জন খুব ছোট হ'য়ে লাউয়ের ভেতর ঢুকে গেল। তারপর বামুন দু'খণ্ড লাউকে এক কাছে ক'রে দিতেই লাউটা গোটা হ'য়ে গেল।

পাখা, ছাগল আর লাউ নিয়ে বামুন মনের আনন্দে বাড়ি চ'লে গেল। বাড়িতে যেয়ে পাখাকে নাড়া দিতেই ভাল ভাল খাবার জিনিস প'ড়তে লাগল। আর ছাগলটার পেটে কিল মারতেই তার পেট থেকে মণিমুক্তো বার হ'তে লাগল।

বামুন খুব খুশি। শিবের দেওয়া ভাঙা পাখা, ছাগল আর লাউ নিয়ে সে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

'বিবি তো গোর্‌জা'

কোনো দেশের বাদশার একটি মাত্র কন্যা ছিল। কন্যার ভাগ্য-বিচারের জন্যে বাদশার আদেশে দেশের বড় গণৎকারকে ডাকা হ'ল। গণৎকার বাদশা-কন্যার হাতের রেখা দেখে বললে, 'যেখানেই এ মেয়ের বিয়ে হোক বিয়ের পরে বেশ কিছুদিন এ মেয়েকে দৈনিক একশো ঘা বেত খেতে হবে আর চামড়ার টুপি প'রতে হবে।'

গণৎকারের কথা শুনে বাদশা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। দিন যায় মাস যায়, বাদশার মনের চিন্তা আর দূর হয়না।

এদিকে বাদশা-কন্যার বিয়ে দেবার সময় হ'য়ে এল। বাদশা মনমরা হ'য়ে থাকে। বাদশার মনের অবস্থা জানতে পেরে উজির বাদশাকে যুক্তি দিলে, 'হুজুর, আপনার কন্যার সঙ্গে এমন একজনের শাদি দিন যার মা বাপ এবং অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। সংসারে সে শুধু একা।'

উজিরের কথায় বাদশা রাজ্যময় ঢেঁড়া পিটিয়ে দিতেই বহু ঘটক নানা রকম ছেলের সন্ধান নিয়ে বাদশার কাছে হাজির হ'তে লাগল। মনের মতো পাত্র বাদশা পেলে না। শেষে এক ঘটক একজন সদাগরের সন্ধান এনে দিলে। সদাগরের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। সে সমুদ্রের ধারে প্রকাণ্ড বাড়িতে একা থাকে। লোকজন ব'লতে তার চাকর-বাকর।

বাদশা ঐ সদাগরের সঙ্গে নিজের কন্যার শাদি ঠিক ক'রে ফেললে। খুব ধুমধাম ক'রে শাদি হ'য়েও গেল। বিয়ের পর একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে বাদশা তার কন্যাকে সদাগরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে। বাদশা-কন্যা সদাগরের বাড়িতে যাবার কিছুদিন পরেই সদাগর তার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে জাহাজ নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য করতে চ'লে গেল।

সমুদ্রের কিনারায় প্রকাণ্ড বাড়িতে বাদশা-কন্যা তার দাসী ও অন্যান্য চাকর-বাকর নিয়ে থাকে।

রাতে একটি ঘরে বাদশা-কন্যা থাকে আর তার পাশের ঘরে থাকে তার দাসী।

একদিন রাতে বাদশা-কন্যা পালঙ্কের ওপর শুয়ে আছে। কাছে কেউ নেই। এমন সময় ঘরের ওপর থেকে একটা গম্ভীর শব্দ হ'ল,—'বিবি তো গোর্‌জা'। বাদশা-কন্যা চমকে উঠল। কান খাড়া ক'রে রইল। আবার শব্দ হ'ল,—'বিবি তো গোর্‌জা'। তিনবার এমন শব্দ হবার পর আর কিছু শোনা গেল না। ভয়ে ভয়ে বাদশা-কন্যা কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন রাতে বাদশা-কন্যা বিছানায় শুয়ে আবার ঐ একই কথা তিনবার শুনতে পেলে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাদশা-কন্যা মনমরা হ'য়ে রইল। তেমন খাওয়া-দাওয়া করলে না। কেবল রাতের ঐ কথা চিন্তা করতে লাগল।

বাদশা-কন্যাকে মনমরা হ'য়ে থাকতে দেখে তার দাসী তাকে জিজ্ঞেসা করলে, 'শাহাজাদী, তোমার কী হয়েছে? তুমি কিছুই ভাল ক'রে খাচ্ছো না, সব সময় মনমরা হ'য়ে আছো'। বাদশা-কন্যা দু'রাতের ঘটনা বললে।

দাসী কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বাদশা-কন্যাকে ব'ললে, 'শাহাজাদী, তুমি কোনো চিন্তা-ভাবনা ক'রো না। এবার যখনই শব্দ শুনতে পাবে—'বিবি তো গোরজা, অমনি তুমি ব'লে উঠবে— গোর্জা। তারপর যা হয় হবে।'

দাসীর কথা শুনে বাদশা-কন্যার মন আরও চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

তৃতীয় দিন রাতে বিছানায় বাদশা-কন্যা শুয়েছে। আবার সেই শব্দ— 'বিবি তো গোর্জা'।

সাহস ক'রে বাদশা-কন্যা বললে, 'গোর্জা'। একথা বলা মাত্রই বাদশা-কন্যা দেখতে পেলে, ঘরের ওপর থেকে তার সামনে মানুষের দু'টো পা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে মেঝের ওপর প'ড়ল। তারপর দুটো হাত, তারপর একটা মাথা, শেষে ধড়টা প'ড়ল। বাদশা-কন্যা খুব ভয় খেয়ে গেল। তবুও বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে আড়-চোখে সব দেখতে লাগল। সে দেখলে, মানুষের কাটা অঙ্গগুলো আস্তে আস্তে যোগ হ'য়ে আস্তো এক সুন্দর যুবক হ'য়ে গেল। যুবকটি মেঝের ওপর উঠে ব'সল। বাদশা-কন্যা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেসা করলে, 'কে? কে তুমি?' যুবক মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে বাদশা-কন্যার স্বামী বাণিজ্য ক'রে বাড়ি ফিরে অন্ধকারেই ঘরের দরজায় ঘা দিলে, 'দরজা খোল, আমি এসেছি।'

স্বামী বাড়িতে এসে প'ড়েছে। এদিকে অপরিচিত যুবক মেঝের ওপর ব'সে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে। বাদশা-কন্যা চিন্তায় প'ড়ে গেল, কী করা যায়; তার স্বামী যদি ঘরে ঢুকে এ অবস্থা দেখে তবে তাকে আর আস্তো রাখবে না। ভয়ে ভয়ে সে যুবককে ব'ললে, 'তুমি যে-ই হও, তাড়াতাড়ি পালঙ্কের নীচে ঢুকে পড়, আমার স্বামী এসে গেছে। আমাকে এ যাত্রা রক্ষে করো। যদি সময় ও সুযোগ পাই পরে তোমার সঙ্গে কথা ব'লবো।' যুবক পালঙ্কের নীচেয় ঢুকে লুকিয়ে রইল।

এবার বাদশা-কন্যা ঘরের দরজা খুলে হেসে স্বামীর সামনাসামনি হ'ল।

সদাগরও হাসিমুখে বাদশা-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পালঙ্কের ওপর এসে ব'সল।

বাদশা-কন্যা হাসিমুখে স্বামীকে ব'ললে, 'ওঘরে চল, খাওয়া-দাওয়া ক'রে এসে গল্প করা যাবে।'

সদাগর ব'ললে, 'না, এখন খাবো না, তোমার জন্যে একটা জিনিস আমি বিদেশ থেকে এনেছি, সেটা আগে দেখাই।'

—'কী জিনিস?'

'তোমার জন্যে একটা মুক্তোর মালা নিয়ে এসেছি।'—এই ব'লে জামার পকেট

থেকে মুক্তোর মালাটা বার ক'রে বাদশা-কন্যার গলায় পরিয়ে দিতে গেল। বাদশা-কন্যা মালাটা তাড়াতাড়ি ক'রে দেখতে গেল। হাত লেগে মালা ছিঁড়ে মুক্তোগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে প'ড়ল। কয়েকটা মুক্তো ছিট্‌কে পালঙ্কের নীচের দিকে গড়িয়ে গেল।

সদাগর তাড়াতাড়ি মুক্তো কুড়োতে লাগল। কুড়োতে কুড়োতে পালঙ্কের নীচে তার চোখ প'ড়ে গেল। দেখলে, সেখানে এক সুন্দর যুবক লুকিয়ে আছে। তাই দেখে সদাগর চম্‌কে উঠলো বটে কিন্তু মুখে কিছু না বলে মুক্তো ক'টা কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলোকে আবার মালায় পূরণ করে বাদশা-কন্যাকে ব'ললে, 'চলো, আমরা ছাদে যাই। সেখানে চাঁদের আলোয় মুক্তোর মালা আমি তোমার গলায় পরিয়ে দোব।'

বাদশা-কন্যা তাতেই রাজি হ'ল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে ছাদে গেল। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝিকমিক করছে, সমুদ্রের জলে চাঁদের আলো পড়েছে। সদাগর বাদশা-কন্যাকে ব'ললে, 'চলো, ছাদের কাণায় বসে দু'জনে সমুদ্রের ঢেউ দেখিগে।'

বাদশা-কন্যা ছাদে গেল। কথা কইতে কইতে সদাগর বাদশা-কন্যাকে এক ধাক্কা মেরে ছাদ থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। বাদশা-কন্যা ঝপাং ক'রে যেয়ে পড়ল সমুদ্রের অথৈ জলে। আর সদাগর চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'আমার অনুপস্থিতিতে ঘরের মধ্যে অন্য যুবককে নিয়ে আসার এই শাস্তি।'

সমুদ্রের জলে প'ড়ে বাদশা-কন্যা কিছুক্ষণ সাঁতার দেবার পরে দেখতে পেলে, তার সামনে একটা কাঠের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেই কাঠের গুঁড়িটা সে ধ'রে ফেললে। কাঠের গুঁড়ি জলে ভেসে যায় আর বাদশা-কন্যাও কাঠ ধ'রে ভেসে ভেসে যায়। বহুদূর যাবার পরে কাঠের গুঁড়ি সমুদ্রের কিনারায় এসে ঠেকল। তখন সকাল হ'য়ে সূর্য উঠছে। বাদশা-কন্যা কাঠের গুঁড়ি ছেড়ে দিয়ে জল থেকে উঠে সমুদ্রের ধারে একটা গাছের তলায় ভিজে কাপড়ে চুপচাপ ব'সে ভাবতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে বাদশা-কন্যার স্বামীর দূর সম্পর্কের এক বোনের স্বামী শিকার করতে এসে বাদশা-কন্যাকে দেখতে পেয়ে এবং তার অবস্থা দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। দু'জনে কেউ কাউকে চেনে না। কাজেই তাদের সম্পর্কের কথাও কেউ জানে না। বাদশা-কন্যা তার নিজের আসল পরিচয় এদের কাছে গোপন রাখলে।

শিকারী বাদশা-কন্যাকে একটা আলাদা ঘরে রেখে দিলে। শিকারীর বৌ ঘরে যুবতী মেয়ে দেখে স্বামীর ওপর বিরক্ত হ'ল। সে ভাবলে, হয়ত এই মেয়েটিকে তার স্বামী বিয়ে করবে ভেবেই বাড়িতে নিয়ে এসেছে। একদিন সে তার স্বামীকে ব'লেই ফেললে, 'তুমি আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারো? বাড়িতে মেয়ে কী জন্যে নিয়ে এসেছো—তা কি আমি বুঝতে পারছি না ভেবেছো?' বেচারী স্বামী মহা ফ্যাসাদে প'ড়ল। সে তার বৌকে ব'ললে, 'মেয়েটির ওপর কেমন ব্যবহার ক'রলে তুমি খুশি হও?'

শিকারীর বৌ ব'ললে, 'তুমি বাড়িতে রাখো। কিন্তু প্রত্যেক দিন ওকে একশো

ঘা বেত মারো আর ওর মাথায় চামড়ার টুপি পরিয়ে রাখো, তবেই বুঝবো তুমি ওকে বিয়ে ক'রবে না।'

—'বেশ, তুমি যদি খুশি হও আমি তা-ই ক'রবো।'

এরপর প্রতিদিন শিকারী বাদশা-কন্যাকে একশো ঘা বেত মারে আর তার মাথায় সব সময় চামড়ায় টুপি পরিয়ে রাখে।

এইভাবে কিছুদিন চ'লল। একদিন সদাগর কী মনে ক'রে তার দূর সম্পর্কের এই বোনের বাড়িতে বেড়াতে এল। বোন খুব খুশি হ'য়ে সদাগরকে আপ্যায়ন করলে। বোন কথায় কথায় সদাগরকে তার স্বামীর কুড়িয়ে আনা মেয়েটির কথা বললে। সদাগর সেকথায় তেমন কান দিলে না। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তেই শিকারীর বৌ বাদশা-কন্যাকে ব'ললে, 'ওগো, বড়মানুষের মেয়ে, আমার এক বড় ভাই এসেছে, সে ওঘরে শুয়েছে। তুমি তার পায়ে ভাল ক'রে তেল-টেল দিয়ে তবে নিজের ঘরে শুতে যাবে। যাও, দেরি ক'রো না।'

আদেশ পেয়ে বাদশা-কন্যা শিকারীর বৌয়ের বড় ভাইয়ের পায়ে তেল দিতে পাশের ঘরে চ'লে গেল। ঘরে ঢুকেই বাদশা-কন্যা দেখলে, তারই স্বামী শুয়ে আছে। মুখে কোনো কথা না ব'লে পায়ে তেল দিতে লেগে গেল। সদাগর পা তলার দিকে চাইতেই দেখলে, তারই বৌ তার পায়ে তেল দিচ্ছে। ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে প'ড়ল। তারপর ব'ললে, 'তুমি এখানে?'

বাদশা-কন্যা কথা না ব'লে কেবল কাঁদতে লাগল। সদাগর বারবার জিজ্ঞেসা করায় বাদশা-কন্যা একে একে সব ব'লতে লাগল। রাতে তার ঘরে যুবকের আবির্ভাব এবং পালঙ্কের নীচে তাকে রাখা, তারপর কেমন ক'রে কাঠের গুঁড়ি ধ'রে ভেসে এসে এখানে হাজির হাওয়া—সবকথাই সে তার স্বামীকে জানালে। একশো ঘা বেত ও চামড়ার টুপির কথাও গোপন রাখলে না। সদাগরও নিজের ভুলের কথা ভেবে খুব লজ্জিত হ'ল। বাদশা-কন্যার হাত ধ'রে ব'ললে, 'আমি বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আমাকে তুমি মাপ্ করো।' বাদশা-কন্যা ব'ললে, 'তোমার কোন দোষ নেই। আমার ভাগ্যে এ-কষ্ট ছিল। ভাগ্যের লিখন কেউ-ই খণ্ডন করতে পারে না।'

সদাগর বললে, 'আমারও অনেক কষ্ট গেছে। যা' হবার হ'য়েছে। এবার আমার সঙ্গেই তুমি বাড়ি চলো।' বাদশা-কন্যার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। পরের দিন সকালে বাদশা-কন্যাকে নিয়ে সদাগর তার নিজের বাড়ীতে চ'লে গেল। তারপর সমুদ্রের ধারে তা'দের সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে চাকর-বাকর নিয়ে তারা সুখে বাস করতে লাগল।

চিংড়ি ও কাক

কোনো গাঁয়ের পাশে একটা দিঘি ছিল। সেই দিঘিতে অনেক পদ্মফুল ফুটে থাকত। একটা পদ্মফুলের ওপর বসে বসে একটা চিংড়ি মাছ একদিন সকালে রোদ পোয়াচ্ছে। এমন সময় একটা কাক উড়ে যেতে যেতে চিংড়ি মাছটাকে দেখতে পেলে। চিংড়ির কাছে কাক এসে বললে, 'এই চিংড়ি, তোকে আমি খাবো।' চিংড়ি শুঁড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'কি, তুই আমাকে খাবি? ছি, ছি, সকালে উঠে তুই কত জায়গায় কত কী ময়লা খেয়েছিস, এখনো মুখ ধুসনি। বাসি মুখে তুই আমাকে খেতে এসেছিস? যা, নদীতে যেয়ে ভাল ক'রে মুখ ধুয়ে আসগে, তারপর আমাকে খাবি।' কাক বললে, 'নদীতে মুখ ধুয়ে এলে আমি তোকে খেতে পাবো—এই কথা? আচ্ছা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।' এই ব'লে সে চিংড়ি মাছের কাছ থেকে উড়ে গেল। উড়ে উড়ে যেয়ে হাজির হ'ল নদীর ধারে। নদীর ধারে ব'সে কাকটা সুর ক'রে বলতে লাগল—

'এ নদী,
দে পানি, ধুই ঠোঁটটি,
খাই চিংড়ি মাছটি।'

কাকের কথা শুনে নদী বললে, 'দেশের যে রাজা সে এখনো আমার পানিতে মুখ ধোয়নি, আর তুই কাক, কত কী ময়লা খেয়েছিস, তোকে এত সকালে আমি পানিতে মুখ ডুবুতে দোব না। তবে কুমোর বাড়ি থেকে যদি লোটা আনতে পারিস তা হ'লে এক লোটা পানি তোকে আমি দিতে পারি।' নদীর কথা শুনে কাক উড়ে উড়ে চলল লোটা আনতে কুমোরবাড়ি। সেখানে যেয়ে দেখলে, কুমোররা চাকে কাদা দিয়ে হাঁড়ি, কলসী, অনেক কিছুই তৈরী ক'রছে। কুমোরদের বাড়ির চালে ব'সে কাকটা বারবার বলতে লাগল—

'এ কুমোররা,
দে লোটা, তুলি পানি, ধুই ঠোঁটটি,
খাই চিংড়ি মাছটি।'

কাকটার কথা বার কতক শুনে এক কুমোর কাককে বললে, 'লোটা তৈরী ক'রে দোব, কাদা চাই, কাদা আনগে যা।' এবার কাকটা উড়ে কাদার কাছে গেল। কাদাকে বলতে লাগল—

'এ কাদা, আয় কাদা,
দিই কুমোরকে, বানাক লোটা,

তুলি পানি, ধুই ঠোঁটটি
খাই চিংড়ি মাছটি।'

কাকের কথা শুনে কাদা বললে, 'কাদা তো নিবি, খুঁড়বি কেমন ক'রে? বন থেকে হরিণের শিং আনগে যা, তবে তো কাদা পাবি?' কাকটা এবার হরিণের শিং-এর সন্ধানে উড়ে চলল। যেতে যেতে দেখলে, বনের মধ্যে এক জায়গায় হরিণের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরিণদের দেখে একটা গাছের ডালে ব'সে ব'সে কাকটা বলতে শুরু করলে—

'এ হরিংগা,
দে শিংগা, খুঁদি মাটি,
দিই কুমোরকে, বানাক লোটা,
তুলি পানি, ধুই ঠোঁটটি
খাই চিংড়ি মাছটি।'

কাকের কথা শুনে একটা হরিণ মুখ তুলে চাইলে। বললে, 'এমনি এমনি কি শিং দেওয়া যায়? ঘাস আনগে, সেই ঘাস খাবো তারপর তোকে শিং দোব।' হরিণের কথা শুনে কাক আবার উড়ে পড়ল। উড়ে যেয়ে বসল ঘাসবনের পাশে। ঘাসকে বললে—

'এ ঘাস, আয় ঘাস,
দিই হরিণকে, তুড়ু শিং-এরা,
খুঁদি মাটি, দিই কুমোরকে, বানাক লোটা,
তুলি পানি, ধুই ঠোঁটটি
খাই চিংড়ি মাছটি।'

কাকের কথা শুনে ঘাস হাসতে হাসতে বললে, 'ঘাস দিবি হরিণকে? তা বেশ, বেশ। কিন্তু ঘাস কাটবি কেমন ক'রে? ভালো একখানা কাস্তে আনগে যা কামার বাড়ি থেকে।' ঘাসের কথায় কাকটা আবার উড়ে পড়ল। উড়ে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলে, কামারশালে হাপর ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে আর আগুনের পাশে বসে কামার একমনে কাজ ক'রছে। কাকটা যেয়ে ব'সল কামারশালের চালে। বারকতক 'কা' 'কা' শব্দ ক'রলে। তারপরই বলতে লাগল—

'এ কামাররা,
দে কাস্তে, কাটি ঘাস,
দিই হরিণকে, তুড়ু শিং-এরা,
খুঁদি মাটি, দিই কুমোরকে, বানাক লোটা,
তুলি পানি, ধুই ঠোঁটটি
খাই চিংড়ি মাছটি।'

কামার কাকটাকে দেখে মনে মনে ভাবলে—বেশ কাক তো! দু'চারবার হ্যাস্ হুস্ শব্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু কাকটা আবার ফিরে এসে বসল কামারের কাছে। কা কা শব্দ করে আর মুখে ঐ একই কথা বলতে থাকে। কাজের সময় এমন ঝালাপালা করাতে কামার রেগে কাককে বললে, 'কাস্তে নিবি? তা বেশ, বেশ। কী কাস্তে নিবি? কালো কাস্তে, না লাল কাস্তে?' কাক বললে, 'লাল কাস্তে।'

একটা কাস্তেকে শালের আগুনে আচ্ছা ক'রে তাতিয়ে চিমটায় ক'রে ধ'রে কামার কাককে বললে, 'কিসে ক'রে নিবি? ধর্'।

কাক বললে, 'এই হাঁ করে রইনু, আমার ঠোঁটে দে।'

কামার গরম লাল কাস্তেটা কাকের ঠোঁটের কাছে নিয়ে যেয়ে বললে, 'নে, হাঁ কর্।' কাক যেই হাঁ ক'রেছে, অমনি কামার গরম কাস্তেটা কাকের মুখে পুরে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কাকটা ধুড়্ ফুড়্ ধুড়্ ফুড়্ ক'রে ম'রে গেল।

ওদিকে চিংড়ি মাছ মনের আনন্দে আরাম ক'রে দিঘির পদ্মফুলের ওপর ব'সে ব'সে রোদ পোয়াতে লাগল।

———

মোড়ল ও শেয়াল

কোনো গাঁয়ে এক মোড়ল ছিল। মোড়ল থাকত একটা ছোট্ট মাটির ঘরে। তার গায়ে ছিল অসম্ভব ক্ষমতা। সে এমন জেদী ছিল যে, যা ব'লত তাই প্রায় ক'রত।

বাড়ির কিছু দূরে মোড়লের একটা ক্ষেত ছিল। সেই ক্ষেতে রবিফসল খুব ভালই হ'ত। বছরে ঐ ক্ষেত থেকে ফসল তুলে সেগুলো বিক্রী ক'রে মোড়লের অনেক টাকা পয়সা হ'ত। তা দিয়েই তার কোনো রকমে দিন চ'লে যেত।

একবার মোড়ল ঐ ক্ষেতে তরমুজ, কাঁকুড়ের গাছ লাগিয়েছিল। আর বড় বড় তরমুজ, কাঁকুড় হ'য়েও ছিল প্রচুর।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ক্ষেতের ধারে যেয়ে মোড়ল দেখলে—বড় বড় আর পাকা পাকা অনেক তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড় শেয়ালে রাতে খেয়ে গেছে। মোড়ল তো মাথায় হাত দিয়ে বসল। শেয়ালে এমনভাবে ফসল খেলে সে তো কিছুই বিক্রী করতে পারবে না। আর টাকা পয়সাও হবে না। এরকম ভাবতে ভাবতে মোড়ল খুবই মনমরা হ'য়ে বাড়িতে ফিরে এল। শেয়াল আর ফসলের কথা সারাদিন ধ'রে মোড়ল ভাবতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনে অনেক ফন্দী আঁটতে লাগল—কেমন ক'রে শেয়ালদের জব্দ করা যায়।

গাঁয়ের মোড়ল ব'লে তার ঘরে অনেকেই অনেক সময় বহু জিনিসপত্র জমা রেখে যেত, আবার দরকার মতো নিয়েও যেত। একবার জেলেরা তার ঘরে মাছ ধরা ফাঁদী জাল রেখে দিয়েছিল। শেয়ালের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় মোড়লের নজর প'ড়ল ঐ ফাঁদী জালের ওপর। অমনি তার মাথায় একটা ফন্দী এসে গেল। সে ঠিক ক'রে ফেললে—এই ফাঁদী জাল দিয়েই ফাঁদ তৈরী ক'রে সে শেয়ালদের ধ'রবে।

সন্ধ্যে হ'য়ে চারদিক বেশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। মোড়ল সেই অন্ধকারে খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে ক্ষেতের ধারে যেয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়াল। চারদিক নিঃশব্দ। ক্ষেতের মাঝে কেবল শব্দ হ'চ্ছে, 'কড়মড়্, কুড়মুড়্'। মোড়ল বুঝতে পারলে—এ শেয়ালদের কাজ। তারাই অন্ধকারে তরমুজ, কাঁকুড় খাচ্ছে। সে যেমনভাবে এসেছিল ঠিক তেমনই নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে যেয়ে ফাঁদী জালটা কাঁধে নিয়ে আবার হাজির হ'ল ক্ষেতের ধারে।

ফাদী জালটাও ছিল বড় আর বেশ চওড়া। ক্ষেতের যে দিকটা দিয়ে শেয়ালেরা ক্ষেতে ঢুকেছিল সেই দিকটায় খুব সাবধানে সেই ফাঁদী জালকে ফাঁদের মতো ক'রে পেতে দিলে। তারপর অন্ধকারে আস্তে আস্তে গুড়ি-মেরে যেদিকে জাল পেতেছে ঠিক তার বিপরীত দিকে এসে চুপটি ক'রে ব'সে রইল।

ক্ষেতের মাঝে শেয়ালদের তরমুজ কাঁকুড় কামড়ানোর শব্দ হ'চ্ছে—'কড়মড়্

কুড়্‌মুড়্‌'। মোড়লের হাতে ছিল একটা মোটা খেটে লাঠি। সেটা নিয়ে এদিক ওদিক ঢিপ্‌ ঢাপ্‌ ক'রে মাটিতে পেটায় আর মুখে জোর শব্দ করে—'ধো-লে-লে-লে।'

আচম্‌কা এ-রকম শব্দ শুনে তরমুজ কাঁকুড় খাওয়া ফেলে রেখে শেয়ালেরা প্রাণভয়ে পড়ি কি মরি ক'রে দিলে টেনে দৌড়। আর অন্ধকারে বুঝতে না পেরে সবাই যেয়ে প'ড়ল সেই ফাঁদী জালের ভেতর। জালে প'ড়ে যতই নড়ে-চড়ে ততই জালে বেশী ক'রে জড়িয়ে যায়। দেরী না ক'রে মোড়ল ছুটে যেয়ে সেই খেটে লাঠি দিয়ে আচ্ছা রকম ঘা কতক ক'রে দিতে দিতে ব'লতে লাগল, 'বেটা ধূর্ত শেয়াল, তোরা জানিস না, আমি এ গাঁয়ের মোড়ল? আমার ক্ষেতের ফসলের ওপর অত্যাচার! দাঁড়া, তোদের কেমন ক'রে সাজা দিতে হয় দেখাচ্ছি।' এই ব'লতে ব'লতে শেয়ালদের এমনভাবে জালে জড়িয়ে দিলে যাতে তারা আর পালাতে না পারে।

ফাঁদে প'ড়ে শেয়ালেরা সবাই 'হুয়া হুয়া' শব্দে চীৎকার আর কান্না শুরু ক'রে দিলে। তাড়াতাড়ি মোড়ল তার ঘর থেকে কিছু পেটো দড়ি নিয়ে এল। তারপর জাল থেকে একটি একটি করে প্রত্যেক শেয়ালের চারটি পা-কে এককাছে করে ক'ষে বাঁধলে। এমনিভাবে বেঁধে সব শেয়ালকে ক্ষেতের ধারে ফেলে রেখে মোড়ল সোজা বাড়ি যেয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল। মনে মনে ঠিক ক'রলে, সকালে পাড়ার ছেলেদের ডেকে নিয়ে শেয়ালকে আচ্ছা করে ঠ্যাঙাবে।

এদিকে শেয়ালেরা মারধোর খেয়ে কাবু হ'য়ে গেল। বন্দী শেয়ালদের মধ্যে একজন ছিল বেশী ধূর্ত। সে সবাইকে ব'ললে, 'ভাই সব, যে কোনো উপায়ে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। না হ'লে মোড়ল সকালবেলায় এসে আমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবে।' দলের মধ্যে একটা শেয়ালের গায়ে ছিল অসম্ভব জোর। সে বহুক্ষণ কসরৎ ক'রে অতিকষ্টে তার পায়ে বাঁধা পেটো দড়ি ছিঁড়ে ফেললে। তারপর দাঁত দিয়ে সব শেয়ালের দড়ি কেটে দিতে প্রায় ভোর হ'য়ে এল। আলান্ত হ'য়ে শেয়ালেরা নিজেদের বাসার দিকে চ'লে গেল। যাবার সময় সেই বেশী ধূর্ত শেয়ালটা সব দড়িগুলো মুখে ক'রে নিয়ে গেল।

পরের দিন সন্ধ্যেয় যখন সব শেয়াল বনের মধ্যে জমায়েত হ'য়েছে তখন সেই ধূর্ত শেয়ালটা দড়িগুলো মুখে ক'রে এনে সকলের সামনে রাখলে। সবাই তো অবাক। একটা শেয়াল ভয়ে ভয়ে ব'ললে, 'এই দড়িগুলো কী হবে ভাই?'

ধূর্ত শেয়ালটা ব'ললে, 'এগুলো যেমন ক'রেই হোক মোড়লকে পেঁাছে দিতে হবে, নইলে মোড়ল যা' লোক তা'তে আর রক্ষে রাখবে না। হয়ত আবার কোনো ফন্দী এঁটে আমাদের মেরেই ফেলবে।'

সকলেই কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে ক'রলে। একটা শেয়াল কাঁপা গলায় বললে, 'তা হ'লে কী হবে ভাই!'

ধূর্ত শেয়ালটা আবার ব'ললে, 'দড়িগুলো মোড়লকে পেঁাছে দিতেই হবে। আমাদের মধ্যে যে সব থেকে বলবান তাকেই যেতে হবে।'

বলবান শেয়ালটা এতক্ষণ চুপচাপ ব'সে সব কথা শুনছিল। সে এবার মুখ খুললে। ব'ললে, 'আমি একা যেতে পারব না। তোমরা যদি আমার পেছনে যাও তবেই আমি দড়িগুলো নিয়ে মোড়লের বাড়ি যেতে পারি।'

সকলে তা'তে মত দিলে। তারও একদিন পরে গুটি গুটি ক'রে শেয়ালের দল রাতেরবেলায় মোড়লের বাড়ির দরজার কাছে এল। সকলের সামনে আছে সেই বলবান শেয়ালটা। ঘরের মধ্যে মোড়লের নাকের শব্দ হ'চ্ছে —'ঘররর্-ঘ, ঘররর্-ঘ'। সবাই বুঝলে, মোড়ল খুবই ঘুমোচ্ছে। একটা শেয়াল ভয়ে ভয়ে ডাক দিলে, 'মোড়ল ভাই, ঘরে আছো?' শেয়ালের ডাকে মোড়লের ঘুম ভেঙে গেল। বুঝতে পারলে, শেয়ালের দল তার বাড়িতে এসেছে। মোড়ল বিছানায় ব'সে কিছুক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। আবার একটা শেয়াল ডাক দিলে, 'মোড়ল ভাই, মোড়ল ভাই, ঘরে আছো? আমরা শেয়াল, তোমার সেই দড়িগুলো দিতে এসেছি। তুমি একটিবার উঠে দড়িগুলো নাও।' সব বুঝতে পেরে মোড়ল তাড়াতাড়ি একটা মতলব ঠিক ক'রে ফেললে। অনেকগুলো কাস্তে ছিল ঘরের মধ্যে। তা থেকে একটা ধারাল কাস্তে আর এক থাবা নুন এনে জানালার ঠিক পাশে চুপটি ক'রে বসল। তারপর গলার স্বরটা অসুস্থ লোকের মতো ক্ষীণ ক'রে ব'ললে, 'আমার জ্বর হ'য়েছে। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যেতে পারবো না। আমার পেটো দড়িগুলো দিতে এসেছো, ভালই করেছো। জানলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে যাও।'

মোড়লের জ্বর, সে এখন উঠতে পারবে না ভেবে শেয়ালদের একটু সাহস হ'ল। একটা শেয়লে ব'ললে, 'কেমন ক'রে দড়িগুলো দোব, মোড়ল ভাই?' গলার স্বর তেমনি ক্ষীণ ক'রে মোড়ল ব'ললে, 'লেজে ক'রে ঠেলে জানলা দিয়ে গলিয়ে দাও। তা' হলেই আমি দড়ি পেয়ে যাবো।'

এই কথা শুনে সব শেয়াল মিলে দড়িগুলো সেই বলবান শেয়ালটার লেজের ডগায় জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে দিলে। আর সে দড়ি সমেত তার লেজটা জানলার ফাঁক দিয়ে ঠেলতে শুরু ক'রলে।

মোড়ল ব'ললে, 'আমি উঠতে পারছি না। আরও একটু বেশী ক'রে লেজটা ঠেলে দাও।'

শেয়ালটা যখন তার লেজটা ঠেলে ঠেলে গোড়া পর্য্যন্ত ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে তখন মোড়ল লেজটাকে ধ'রে কাস্তে দিয়ে এক প্যাঁচে কচ্ ক'রে কেটে দিয়ে সেখানটায় নুন দিয়ে দিলে। কাটা ঘায়ে নুন লেগে জ্বালায় শেয়ালটা 'বাবারে, বাবারে', ব'লে যন্ত্রনায় ছটফট ক'রতে ক'রতে দিলে টেনে এক দৌড়। আর অন্য শেয়ালেরা তাই দেখে যে যেদিকে পারলে পড়ি কি মরি ক'রে ছুটে মোড়লের বাড়ির অনেক দূরে পালিয়ে গেল।

এরপর বেশ দিন কতক কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যের ঠিক আগে মোড়ল ভিনু

গাঁ থেকে নিজের বাড়ি ফিরছে। বনের ভেতর দিয়ে পথ। প্রায় গাঁয়ের কাছে এসে প'ড়েছে। সেই বনের মধ্যে ছিল শেয়ালদের বাসা। শেয়ালেরা দেখতে পেয়ে মোড়লকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে 'হুক্কি হুয়া, হুক্কি হুয়া' চীৎকার ক'রছে আর ব'লছে, 'মোড়ল, আজ আর আমরা ছাড়ছি না। সবাই মিলে তোমাকে মনের আনন্দে খাবো।'

মোড়ল মহামুশকিলে প'ড়ে গেল। কিন্তু ভয় খেলে না। রাস্তার পাশেই ছিল এক বড় তালগাছ। মোড়ল ছুটে যেয়ে সর্‌সর্‌ তর্‌তর্‌ ক'রে একেবারে তালগাছের মাথায় উঠে চুপটি ক'রে ব'সে রইল।

শেয়ালের দল তালগাছটাকে ঘিরে ভাবতে লাগল—কী করা যায়! শেষে ঠিক ক'রলে, যেমন ক'রে তারা কাঁঠাল খায় তেমনি ভাবে একজনের কাঁধে একজন, তার কাঁধে আর একজন ক'রে উঠে তালগাছের ডগায় উঠবে। তারপর মোড়লকে ধ'রবে।

ঐ রকম যুক্তি শুনে সেই লেজকাটা বেঁড়ে শেয়ালটা বললে, 'আমি সবার নীচে মাটিতে থাকবো। আমি মোড়লের কাছে যাচ্ছি না।'

সবাই তাতে সম্মত হ'ল। বেঁড়ে শেয়াল নীচে মাটিতে বসল। তার কাঁধে ব'সল একজন, তার কাঁধে আর একজন। এমনি ক'রে যখন তালগাছের গলা পর্যন্ত শেয়াল পেঁছে গেছে তখন মোড়ল ভাবলে—এবার ওরা আমাকে ধ'রে ফেলবে। তালগাছের একটা শুক্‌নো বাগড়া হাতে ক'রে নাড়তে নাড়তে মোড়ল ব'ললে,

'তাল খর্‌ খর্‌ খর্‌,
সব শালাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে শালাকে ধর।'

বেঁড়ে শেয়াল তো সবার নীচেই ছিল। মোড়লের ছড়া শুনে সে ভাবলে - তা হ'লে মোড়ল তো আমাকে ধ'রবে! ফস্‌ ক'রে কাঁধটা ফস্‌কে নিয়ে বেঁড়ে শেয়াল দিলে টেনে এক দৌড়। সঙ্গে সঙ্গে ধুপ্‌ধাপ্‌, ধুপ্‌ধাপ্‌ ক'রে শেয়ালেরা পড়ল মাটিতে। কারো পা ভাঙল, কারো গা ছ'ড়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

মোড়ল একটানা শুক্‌নো তালবাগড়া দুলিয়ে দুলিয়ে ব'লে চ'লেছে—

তাল খর্‌ খর্‌ খর্‌
বেঁড়ে হোক, খোঁড়া হোক সব শালাকেই ধর্‌।'

এই শুনে শেয়ালেরা যে যেদিকে পারলে অতিকষ্টে দৌড়ে বনের মধ্যে যেয়ে লুকিয়ে প'ড়ল। তারপর মোড়ল গাছ থেকে নেমে মনের আনন্দে বাড়ি চ'লে গেল।

তাঁতি ও কাক

কোনো গাঁয়ে একঘর তাঁতি বাস করত। তাঁতি আর তাঁতিবৌ ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। বাড়ির পাশেই ছিল একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। সেই বটগাছে থাকত একটা কাক। কাকটা ছিল ভীষণ ধূর্ত। সে পাড়ায় গেরস্থর বাড়িতে যেত। আর গেরস্থের বৌ একটু অন্যমনস্ক হ'লেই খাবার জিনিস ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে আসত। কাকটা নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করত। মনে মনে ভাবত—মানুষেরা কি বোকা! 'মারবো' ব'লে তাড়া করলেও ওরা আমাদের মারতে পারে না। মানুষের ধমকানিকে অগ্রাহ্য ক'রে আমার খাদ্য খপাখপ্ করে নিয়ে আমি পালিয়ে আসতে পারি।

এদিকে তাঁতি আর তাঁতিবৌ বেশ সুখে সংসার করে। তাঁতির ছিল একটা তাঁত আর তাঁতিবৌয়ের ছিল একটা ঢেঁকি। তাঁতে কাপড়, গামছা বুনে সেগুলো বাজারে বিক্রী ক'রে তাঁতির কিছু লাভ হ'ত। কিন্তু এত অল্প আয়ে তার সংসার ভালভাবে চ'লত না। কিছুদিন পরে কাপড়ের বাজার মন্দা হওয়ায় তাঁতির সংসার চালানো ভার হ'য়ে উঠল। সারাদিন ঠিকমত স্বামী-স্ত্রীর আহারের সংস্থান হয় না। সংসারের এই অবস্থা হওয়াতে তাঁতিবৌ একদিন তার স্বামীকে ব'ললে, 'আমাদের তো একটা ঢেঁকি আছে। তুমি আমাকে দু'এক মণ ধান কিনে দাও। আমি সেই ধান সেদ্ধ-শুকনো ক'রে ঢেঁকিতে ভানবো। আর যা চাল পাবো তা' বিক্রী ক'রে আমাদের চ'লে যাবে।'

তাঁতি ভেবে ব'ললে, 'চ'লে তো যাবে ব'লছো, কিন্তু ধান কিনবো কী দিয়ে? টাকা কোথায় পাবো?' তাঁতিবৌ একটু ভেবে নিয়ে ব'ললে, 'আমার দু'গাছা রুপোর বাউটি আছে। তুমি ও দু'টো বাজারে নিয়ে যেয়ে বিক্রী ক'রে দাও। তারপর সেই টাকা দিয়ে ধান কিনে আন।'

বৌয়ের কথাটা শুনে তাঁতি কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর সে বৌকে ব'ললে, 'তবে তাই দাও বাউটি দু'গাছা। কিছু একটা না ক'রলে তো সংসার আর চালানো যাবে না।' যুক্তিমত তাঁতি রুপোর বাউটি দু'গাছা বাজারে বিক্রী ক'রে কিছু ধান কিনে নিয়ে এল। সেই ধান তাঁতিবৌ সেদ্ধ-শুকনো ক'রে ঢেঁকিতে কুটে চাল তৈরী করলে। সেই চাল তাঁতি বাজারে বিক্রী ক'রে এল। এমনি ক'রে ধান কিনে ভানা-কুটো ক'রে সংসার মোটামুটি চ'লে যায়। মাঝে মাঝে লাভের পয়সা থেকে তাঁতি সুতো কিনে এনে তাঁতে কাপড় গামছাও অল্পসল্প বোনে। সেগুলো থেকেও কিছু রোজগার হয়।

তাঁতিবৌ যে ধান সেদ্ধ ক'রে উঠোনে রোদে শুকোতে দেয়, তাঁতি তাঁত বুনতে বুনতে সেগুলো আগলায়, যাতে কাক-পক্ষী এসে না খায়।

তাঁতির বৌ উঠোনে ধান শুকোয়। আর সেই কাক বটগাছের ডালে ব'সে ব'সে লক্ষ্য করে। কাকটা মাঝে মাঝে গাছ থেকে উড়ে এসে খপ্ ক'রে একমুখ ধান নিয়ে আবার উড়ে পালায়।

একদিন কাকটা তাঁতির উঠোনে ধান খেতে এসেছে। তাঁতি তাঁত বুনছে আর উঠোনের দিকে চাইছে। কাকের ধান খাওয়া দেখে তাঁত বুনতে বুনতেই তাঁতি হ্যাস্ হুস্ শব্দ ক'রলে। কাকটা গ্রাহ্য ক'রলে না। এক মুখ ধান নিয়ে উড়ে পালাল। সেগুলো খেয়ে কাকটা আবার ধান খেতে এসেছে দেখে তাঁতি কাপড় বুনতে বুনতে ব'ললে, 'ব্যাটার কাক, আবার এসেছিস্? তোকে ঢেঁকি ছুঁড়ে মারবো।' কাক আবার এক মুখ ধান নিয়ে পালিয়ে গেল। কাকটা ধানগুলো খেয়ে গাছের ডালে ব'সে ব'সে ভাবলে, তাঁতি তো আমাকে ঢেঁকি ছুঁড়ে মারবো ব'ললে। কিন্তু মারলে কই? গেরস্থরা আমাদের ভয় খাওয়ানোর জন্যে অমন বলে। আমি আবার যাই। এই ভেবে কাকটা আবার তাঁতির উঠোনে ধান নিতে এল। তার সাহস অনেকখানি বেড়ে গেছে। তাঁত বুনতে বুনতে তাঁতি আবার চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, 'ব্যাটার কাক, আবার এসেছিস্? এবার নির্ঘাত ঢেঁকি ছুঁড়ে মারবো।'

কাকটা তাঁতির কথা গ্রাহ্য ক'রলে না। মনে মনে ভাবলে, অমন ঢেঁকি ছুড়ে তো আগের বারেও মারবে ব'লেছিল। ও' মারবে না। শুধু মুখেই ব'লছে। কাকটা লাফাতে লাফাতে আবার উঠোনে এসে যখন খপাখপ্ খপাখপ্ ক'রে মুখে ধান পুরতে আরম্ভ ক'রেছে ঠিক সেই সময় তাঁতি তার মাকুটা বোঁ ক'রে ছুঁড়ে মারলে কাকটাকে। মাকুটা লেগে কাকের একটা পা ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে গেল। খোঁড়া পা নিয়ে কা কা ক'রতে ক'রতে কাকটা উড়ে যেয়ে ব'সল সেই বটগাছটার ডালে। ভাঙা পায়ের ভীষণ যন্ত্রনায় ছটফট ক'রতে ক'রতে কাকটা ভাবলে, তার থেকে বোকা বোধহয় এ-জগতে আর কেউ নেই। মানুষই সব জীবের থেকে বুদ্ধিমান।

খোঁড়া কাকটা তাঁতির বাড়িতে আর কোনদিন আসেনি। কিছুদিন পরে কাকের ভাঙা পা ঘা হ'য়ে প'চে গেল। না খেতে পেয়ে একদিন গাছের ডালে কাকটা ম'রে ঝুলতে লাগল।

বাঘের বিয়ের ঘটকালি

কোনো গাঁয়ে এক নাপিত ছিল। সে একদিন ভিন গাঁ থেকে কামিয়ে-জুমিয়ে বাড়ি ফিরছিল। ঠেক্‌কোর দুপুর-রোদ। নাপিত আলান্ত হ'য়ে বনের ধারে রাস্তার পাশে এক বটগাছের ছায়ায় ব'সে বিশ্রাম ক'রছে। এমন সময় এক বাঘ বন থেকে বেরিয়ে পড়তেই নাপিত খুর, ভাঁড় গাছতলায় ফেলে রেখে প্রাণ নিয়ে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা ক'রলে। কিন্তু পারলে না। বাঘ তিন লাফে তার সামনে এসে তাকে আটকে ফেললে।

নাপিতকে বাঘ ব'ললে, 'তোমাকে দেখে আমি এনু, আর তুমি কিনা দৌড়ে পালাচ্ছো?'

ভয়ে ভয়ে নাপিত ব'ললে, 'পালাবো নাতো কী ক'রবো? না পালালে রক্ষে আছে? তুমি তো আমাকে খেয়ে ফেলবে।'

বাঘ ব'ললে, 'তুমি যদি আমার একটা কাজ ক'রে দাও তবে তোমাকে আমি খাবো না। ছেড়ে দোব।'

নাপিত ব'ললে, 'বল, কী কাজ ক'রতে হবে।'

বাঘ বললে, 'আমার বৌ নেই। যদি একটা বাঘিনী জোগাড় ক'রে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিতে পার তবেই তোমাকে আমি ছেড়ে দোব। নচেৎ এখুনি তোমায় খাবো।'

নাপিত একটু সাহস পেলে। বাঘকে ব'ললে, 'এই কথা? বিয়ের ঘটকালি করা আমার বেশ অভ্যেস আছে। ঘটকালি ক'রে কত লোকের বিয়ে দিয়ে দিনু, আর তোমার জন্যে একটা বাঘিনী জোগাড় করে দিতে পারবো না? খুব পারবো। তবে খালি হাতে ওসব কাজ করা যায় না। কিছু খরচ-খরচা ক'রতে হয়।'

বাঘ বললে, 'বেশ, বল কী দিতে হবে তোমায়?'

নাপিত বললে, 'টাকাকড়ি, সোনাদানা যাহোক আগাম দিতে হবে বৈকি।'

বাঘ ব'ললে, 'টাকাকড়ি কোথায় পাবো? তোমাকে সোনার গয়না কিছু দিতে পারি। তা' পেলে হবে?'

নাপিত ব'ললে, 'ওসব পেলে তো খুব ভালই হয়। সোনার গয়না বাঘিনীকে দিলে সে সহজেই রাজি হয়ে যাবে।'

এবার বাঘটা বনের মধ্যে ছুটে গেল। আগে যেসব মেয়েমানুষ খেয়েছিল তাদের হাড়গোড়ের সঙ্গে গয়নাও অনেক বনের মধ্যে ছিল। সেইসব গয়নার অনেকগুলোই পিঠে ক'রে ব'য়ে এনে নাপিতের সামনে রাখলে। গয়না দেখে নাপিত অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'তুমি এত গয়না আমাকে দেবে?'

বাঘ ব'ললে, 'তুমি আমার জন্যে কত কষ্ট ক'রবে। আমাকে সংসারী ক'রবে। আর তোমাকে আমি কিছু দোব না, তা' কী ক'রে হয়? এ আর এমন কী গয়না। যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন তোমাকে আরও অনেক দামী দামী গয়না দোব।'

'বেশ, বেশ, তাই দিও।' এই বলে নাপিত গয়নাগুলো কাপড়ের খুঁটে বাঁধতে

বাঁধতে ব'ললে, 'খুব অল্পদিনের মধ্যেই আমি তোমাকে বাঘিনী খুঁজে দিচ্ছি। এখন তাহলে আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

বাঘ ব'ললে, 'বেশ যাও, কিন্তু আমার কথা মনে থাকে যেন। তা নাহ'লে তোমাকে যেখানে পাবো সেখানেই আমি খাবো।'

'আচ্ছা।'—ব'লেই নাপিত সোনাদানা নিয়ে বাড়ি চ'লে গেল।

দামীদামী সোনার গয়না পেয়ে নাপিত তার অবস্থা ফিরিয়ে ফেললে। অনেক জমিজমা কিনলে। ভাল বাড়িঘর ক'রলে। বেশ আরামে দিন কাটাতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে বাঘের কথা একেবারে ভুলে গেল।

এদিকে বাঘ নাপিতের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে যখন বুঝলে—নাপিত আর আসবে না তখন মনের দুঃখে বনের পাশে নদীর ধারে যেয়ে ব'সে রইল। বাঘ চরাট করে না, খায়না-দায়না। কেবল মনমরা হ'য়ে নদীর ধারে ব'সে দিন কাটায়।

নদীর ধারে অন্য এক বনে আর এক বাঘ তার বাঘিনীকে নিয়ে সুখে বাস ক'রত। একদিন এক তাঁতি সেই বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় বাঘটা তাঁতিকে আগলে ফেললে। তাঁতি ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। বাঘ তাঁতিকে ব'ললে, 'আজ তোকে আমরা বাঘ-বাঘিনীতে মিলে খাবো।'

তাঁতি একটু বুদ্ধি ক'রে ব'ললে, 'দেখ্, আমাকে খাস্‌না। আমি জেতে তাঁতি। রঙ্ বেরঙের কাপড় বুনে বাজারে বিক্রী করি। আমি তোর বৌকে ভাল কাপড় দোব।'

বাঘ ব'ললে, 'বেশ, কই দে কাপড়।'

তাঁতি ব'ললে, 'আজ সব কাপড় বিক্রী হ'য়ে গেছে। আমি বাড়ি যেয়ে বেশ মজবুৎ ক'রে সুন্দর কাপড় বুনে রাখবো। তুই তোর বৌকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়ি যাবি। তোর বৌ খুশিমত কাপড় নিয়ে আসবে। আজ আমাকে ছেড়ে দে?'

বাঘ তাঁতিকে ছেড়ে দিলে। কয়েকদিন পরে বাঘিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাতের বেলায় বাঘ তাঁতির বাড়িতে যেয়ে হাজির হ'ল। বাঘের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে তাঁতির ঘুম ভেঙে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বাঘ বাঘিনীর সামনে এল।

বাঘ ব'ললে, 'এই তো আমার বৌকে সঙ্গে করে এনেছি। এবার কাপড় দে।'

তাঁতি ব'ললে, 'আমি মনের মতো ক'রে কাপড় বুনে রেখেছি। কিন্তু আমাদের দেশের নিয়ম নতুন কাপড় প'রে দোলায় চ'ড়তে হয়। না হ'লে নতুন কাপড় বৌয়েদের সয় না।'

বাঘ ব'ললে, 'তাই নাকি! বেশ, বৌকে কাপড় পরিয়ে দোলায় চড়িয়ে দে।'

তাঁতি ব'ললে 'তোদের দু'জনকেই দু'টো দোলায় চ'ড়তে হবে।'

বাঘ ব'ললে, 'তাতে আমার অমত নেই। কিন্তু দোলা কেমন?'

তাঁতি একটু হেসে ব'ললে, 'দাঁড়া, বাড়ির ভেতর থেকে দু'টো দোলা আনছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁতি ঘর থেকে দুটো চটের থলে নিয়ে এসে বাঘ-বাঘিনীর সামনে দাঁড়াল। ব'ললে, 'এই হ'চ্ছে দোলা। দু'জনে দু'টোর মধ্যে ঢুকে চুপটি করে ব'সবি।'

বাঘ আর বাঘিনী নতুন কাপড় প'রে দুজনে দুটো চটের থলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অমনি তাঁতি দু'টো থলের মুটি এঁটে বেঁধে দিলে। তারপর হাঁকডাক ক'রে লোক জড়ো ক'রে ফেললে।

লোকজন লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটে এল। তারপর দুড়দাড় ক'রে বাঘটাকে পিটিয়ে মেরে ফেললে। আর থলে সমেত বাঘিনীকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে এল।

থলের ভেতর বাঘিনী নদীর জলে ভেসে ভেসে চ'লল।

যে বাঘটা নাপিতকে বাঘিনী খুঁজে দিতে ব'লেছিল সে তো আগে থেকেই মনমরা হ'য়ে নদীর ধারে ব'সেছিল। কী একটা ভেসে যেতে দেখে বাঘটা নদীর জলে ঝাঁপ দিলে। থলেটা টানতে টানতে ভিতেয় নিয়ে এল। তারপর থলেটা দাঁতে ক'রে ছিঁড়ে ফেলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বাঘিনী।

বাঘের খুব আনন্দ হ'ল। ভাবলে, নাপিত তাহ'লে তার কথা রেখেছে। সে-ই এই বাঘিনীকে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বাঘ-বাঘিনী সুখে বনের মধ্যে বাস ক'রতে লাগল। একদিন বাঘ ঠিক ক'রলে, নাপিত ঘটকালি ক'রে তার বড় উপকার ক'রেছে। তাকে কিছু সোনাদানা, টাকাকড়ি দিয়ে আসতে হবে।

এই ভেবে বাঘিনীর পিঠে প্রচুর সোনাদানা চাপিয়ে বাঘিনীকে সঙ্গে নিয়ে বাঘ নাপিতের বাড়ির দরজায় এসে হাজির হ'ল।

বাঘ ডাক দিলে, 'নাপিত ভাই, নাপিত ভাই, ঘরে আছো?' বাঘের ডাক শুনে নাপিতের বৌ নাপিতকে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললে, 'কী ব্যাপার গো! নাচদুয়ারে বাঘ এসে ডাকাডাকি ক'রছে কেন?'

নাপিত বিছানায় এতক্ষণ শুয়েছিল। ধড়্মড়্ ক'রে উঠে ঝোড়কা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরে দেখলে, সত্যিই দু' দু'টো বাঘ। বাঘের ঘটকালির কথা নাপিতের মনে পড়ে গেল। সে সবকথা তার বৌকে ব'ললে। তার বৌ ভয়ে কাঁপতে লাগল।

নাপিত দু'টো বাঘ দেখে ভাবলে, হয় সেই বাঘটা তার বন্ধুকে নিয়ে তাকে খেতে এসেছে, নাহ'লে বাঘটার বাঘিনী মিলে গেছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে বাঘ ব'ললে, 'নাপিত ভাই, তুমি আচ্ছা ঘটকালি ক'রলে বটে! নদীর ধারে ব'সে ব'সে আমি বাঘিনী পেয়ে গেছি।'

নাপিত ঘরের ভেতর থেকেই ব'লতে ব'লতে বেরিয়ে এল, 'দেখলে তো, আমি কত পাকা ঘটক। ঘরে ব'সে আছি অথচ আমার ঘটকালির চোটে তোমার বাঘিনী মিলে গেল।'

বাঘ হেসে ব'ললে, 'সেজন্যেই তো তোমাকে দু'জনে মিলে অনেক কিছু দিতে এসেছি। এগুলো তোমার ঘটকালির জন্যে তোমাকে দিনু।' এই বলে সেই সব সোনাদানা নাপিতের উঠোনে নামিয়ে দিয়ে বাঘ-বাঘিনী চ'লে গেল। নাপিতও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারপর খুব বড়লোক হ'য়ে সুখে বাস ক'রতে লাগল।

চিংড়িরাণী ও কাক

একটি পুকুরে একদিন সকালে শালুকপাতার ওপর ব'সে ব'সে একটি চিংড়ি রোদ পোয়াচ্ছিল। এমন সময় এক কাক উড়ে যেতে যেতে তা'কে দেখে যেই খেতে যাবে অমনি চিংড়ি জলে লাফিয়ে প'ড়ল।

পুকুরের জলে অনেক রকমের মাছ। চিংড়ি প্রথমে কাতলার কাছে গেল। কাতলাকে ব'ললে, 'কাতলাদাদা, কাতলাদাদা, ঘরে আছো?' কাতলা ব'ললে, 'কে রে এমন ক'রে ডাকাডাকি করে?'

চিংড়ি ব'ললে, 'আমি চিংড়িরাণী।'

কাতলা ব'ললে, 'দাও বোনকে পিড়ে পানি।'

তারপর কাতলাকে চিংড়ি ব'ললে, 'দাদা, একটি মুনসি দেবে?'

কাতলা ব'ললে, 'কী মুনসি?'

চিংড়ি ব'ললে' 'তিন-চারটে রবিবার করনু, শালুকপাতায় গা শুকোনু। তা'তে কাক বলে, খাইবোল, খাইবোল। আমি তা'তেও পারি। লো ব'ললে কেন?'

কাতলা ব'ললে, 'আমি এ-বিচার ক'ত্তে পারবো না। রুইয়ের কাছে যাও।' চিংড়ি, রুইমাছের কাছে গেল। তা'কেও অমনি ক'রে ব'ললে। সব শুনে রুই ব'ললে, 'আমি এ-বিচার ক'ত্তে পারবো না। তুমি বোয়ালের কাছে যাও। যদি পারে তো সে-ই কিছু পারবে। চিংড়ি বোয়ালের কাছে যেয়ে সব ব'ললে। বোয়াল তাকে কাঁকড়ার কাছে যেতে ব'ললে। এবার চিংড়ি কাঁকড়ার কাছে যেয়ে কাঁকড়াকে ব'ললে, 'কাঁকড়াদাদা, কাঁকড়াদাদা, ঘরে আছো?'

কাঁকড়া ব'ললে, 'কে ডাকাডাকি করে?'

চিংড়ি জবাব দিলে, 'আমি চিংড়িরাণী।'

কাঁকড়া ব'ললে, 'দাও বোনকে পিড়ে পানি।'

চিংড়ি ব'ললে, 'দাদা, একটি মুনসি দেবে?'

কাঁকড়া ব'ললে, 'কী মুনসি?'

চিংড়ি ব'ললে, 'তিন-চারটে রবিবার করনু, শালুকপাতায় গা শুকোনু। তা'তে কাক বলে, খাইবোল খাইবোল। আমি তা'তেও পারি।' লো ব'ললে কেন?'

'আচ্ছা, আমি দেখছি কী ক'ত্তে পারি।' এই ব'লে কাঁকড়া জলের ধারে মরার মতো প'ড়ে রইল। তাই দেখে কাক ভাবলে, কাঁকড়া ম'রে গেছে। সে কাঁকড়াকে খেতে গেল। যেই কাকটা তার ঠোঁট কাঁকড়ার কাছে নিয়ে গেছে অমনি কাঁকড়া তার দাড়া দিয়ে চিমটে ধ'রলে কাকের গলাটা। কাক ছটফট ক'রে ম'রে গেল। তাই দেখে চিংড়ি আনন্দে নাচতে নাচতে ব'লতে লাগল. 'কাঁকড়াদাদা খুব বাহাদুর, কাঁকড়াদাদা খুব বাহাদুর।'

খেঁকশেয়ালের মরণ

কোনো গাঁয়ের পাশে মাঠের ধারে কাঁটালগাছের নীচে মাটিতে গর্তের মধ্যে বাস করত একটা খেঁকশেয়াল। কাঁটাল ধ'রলে শেয়ালটা গাছের ওপর উঠে দেখত, কাটাল পাকল কি না।

একদিন রাখালছেলের দল গরু চরাতে চরাতে দূর থেকে খেঁকশেয়ালকে কাঁটাল-গাছের ওপর দেখতে পেয়ে গেল। রাখালদের মধ্যে যে বড় সে ব'ললে, 'খেঁকশেয়ালটাকে যেমন ক'রেই হোক মারতে হবে।' সব রাখাল তার কথাতেই সায় দিলে।

ওদিকে খেঁকশেয়াল রাখালদের হাবভাব বুঝতে পেরে গাছ থেকে নেমে গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল।

রাখালেরা শেয়ালকে গাছের ওপর দেখতে না পেয়ে আবার যুক্তি করতে লাগল, কী ক'রে শেয়ালটাকে মারা যায়।

বড় রাখাল ব'ললে, 'সবাই তোরা বনের লতাপাতা নিয়ে আয়। ও'গুলো কাঁটালগাছের চারদিকে জমা কর। তারপর শুকিয়ে গেলে ঠিকসময়ে আগুন ধরিয়ে দোব। তাহ'লেই খেঁকশেয়ালটা পুড়ে মরবে। অন্য সব রাখাল বড় রাখালের কথা মেনে নিয়ে বন থেকে লতাপাতা ছিঁড়ে এনে কাঁটালগাছের চারদিকে গোল ক'রে সাজিয়ে দিলে। তারপর প্রতিদিন রাখালেরা লক্ষ্য করতে লাগল, কখন শেয়ালটাকে আবার দেখা যায়।

দিন দু'য়েক বাদে রাখালছেলের দল দূর থেকে দেখতে পেলে, খেঁকশেয়ালটা কাঁটালগাছে উঠে আপন মনে শুঁকে শুঁকে দেখছে, কোন্ কাঁটালটা পাকা।

রাখালেরা ছুটে যেয়ে কাঁটালগাছটার চারদিকটা ঘিরে ফেললে। তারপর শুকনো লতাপাতায় আগুন জেবলে দিলে। আগুন দাউ দাউ ক'রে জবলতে লাগল, আর রাখালেরা মুখে হো হা শব্দ ক'রে তাদের হাতের লাঠিগুলো মাটিতে ঠুকতে লাগল। এবার খেঁকশেয়াল প্রাণ বাঁচাতে এডাল ওডাল ক'রে লাফাতে আরম্ভ করলে। কিন্তু আগুন তখন এমন জবলছে যে, খেঁকশেয়ালের বাঁচবার আর উপায় থাকল না। কাঁটালগাছের ডালেই সে আগুনের তাপে ম'রে গেল। গাছের পাকা কাঁটাল তার আর খাওয়া হ'ল না।

কাঁকড়া ও শেয়াল

কোনো এক পুকুরের মাঝখানে জলের ওপর পদ্মপাতায় ব'সে ব'সে একটি কাঁকড়া গা শুকোচ্ছিল। এক শেয়াল ঐ পুকুরের পাড় দিয়ে যেতে যেতে কাঁকড়াকে দেখলে। দেখে তার খুব কাঁকড়া খেতে মন হ'ল। পুকুরের জলের ধারে ব'সে কাঁকড়াকে লক্ষ্য ক'রে শেয়াল ব'ললে,

'আংখুড়ি মাংখুড়ি প্রাণেশ্বরী
দুয়ারকে এস না দু'টি গান করি।'

কাঁকড়া বুঝতে পারলে, শেয়াল তাকে খেতে চায়। তাই সে পদ্মপাতার ওপর থেকেই শেয়ালকে ব'লতে লাগল,

'তুই বড় গানীর ব্যাটা গানী, তোকে আমি চিনি,
তুই ওখান থেকে গান কর, আমি এখান থেকেই শুনি।'

একথা শুনে শেয়াল মনমরা হ'য়ে সেখান থেকে চ'লে গেল। আর কাঁকড়া মনের আনন্দে পদ্মপাতার ওপর ব'সে রোদ পোয়াতে লাগল।

এক আশি একশো

নদীর ধারে কোনো এক গাঁয়ে একজন চাষী বাস করত। তার একটা ছোট ক্ষেত ছিল। চাষী সেই ক্ষেতে একবার বেগুন লাগিয়েছিল। প্রচুর বেগুন হ'য়েও ছিল। ক্ষেতের পাশেই ছিল একটা পুকুর। সেই পুকুরের জলে থাকত একটা কাচিম আর একটা বড় শোল মাছ। পুকুরের পাড়ে গর্তের মধ্যে থাকত একটা শেয়াল।

বহুদিন এক-কাছে থাকার জন্যে শেয়াল, কাচিম আর শোলমাছের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব হ'ল। প্রতিদিন রাতে তিন বন্ধুতে মিলে বেড়াতে যেত। ঘুরতে ঘুরতে তাদের লক্ষ্য পড়ল চাষীর বেগুন ক্ষেতের ওপর। গাছে গাছে প্রচুর বেগুন দেখে তাদের মনে খুবই ফূর্তি হ'ল।

শেয়াল, কাচিম আর শোলমাছ প্রতিদিন রাতে চাষীর ক্ষেতে ঢুকে মনের আনন্দে পেট ভ'রে বেগুন খায়। কিছু খায়, কিছু বেগুন আধ খাওয়া করে নষ্ট করে দেয়। গাছও ভেঙে তছনছ করে।

চাষী সকালে বেগুন তুলতে এসে ক্ষেতের অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে হায় হায় করে। বেগুন ও বেগুনগাছ রক্ষা করবার জন্যে অনেক কিছু ক'রলে চাষী। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না। তবুও চাষীর ভাবনা-চিন্তার শেষ নেই।

একবার চাষী বেগুন ক্ষেতে সেচ দিয়েছে। পরের দিন সকালে সে দেখে, বেগুন যারা খেয়েছে তারা চ'লে গেছে বটে কিন্তু ক্ষেতের ভিজে মাটিতে তাদের পায়ের ছাপ রেখে গেছে।

পায়ের ছাপ দেখে চাষী বুঝতে পারলে, শেয়াল, কাচিম এরাই তার ক্ষেতের সব ফসল খেয়ে শেষ ক'রে দিচ্ছে।

একদিন রাতে চাষী ক্ষেতের চারপাশে দড়ির ফাঁদ পেতে এমনভাবে রাখলে যাতে শেয়াল বা অন্য কেউ এলেই ধরা পড়ে যায়।

সন্ধ্যের পরে শেয়াল, কাচিম আর শোলমাছ একসঙ্গে চ'লেছে বেগুন ক্ষেতের দিকে। চাঁদের আলোয় দূর থেকেই তারা দেখতে পেলে, চাষী ক্ষেতের চারপাশে দড়ির ফাঁদ পেতেছে। থম্‌কে দাঁড়াল তিনজনে। তারপর পুকুরের পাড়ে এসে তারা মুখোমুখি ব'সে চিন্তা করতে লাগল। শোলমাছ ভয়ে ভয়ে ব'ললে, 'তা হ'লে কী হবে ভাই! আমাদের বেগুন খাওয়া কি বন্ধ হ'য়ে যাবে?'

শেয়াল হেসে ব'ললে, 'আরে দূর! বুদ্ধির জোরে ওসব ফাঁস্‌টাঁস্‌ এড়িয়ে আমরা ক্ষেতে ঢুকে প'ড়বো। কিছু ভাবনা করতে হবে না।' শোলমাছ ব'ললে, 'কার কত বুদ্ধি আছে ভাই?'

শেয়াল ব'ললে, 'আমার আশি রকমের বুদ্ধি আছে। একটার পর একটা বুদ্ধি খাটিয়ে আমি যে-কোন বিপদ থেকে বেঁচে যাবো।'

কাচিম ব'ললে, 'আমার শত বুদ্ধি। একশোটা বুদ্ধি আমার মাথার মধ্যে গজ্‌গজ্‌ ক'রছে। সেগুলোর কিছু খরচ করলেই আমার আর ভাবনা নেই।'

শোলমাছ চুপ ক'রে ছিল। তাই দেখে কাচিম মুখটা একটু বার ক'রে শোল-মাছকে ব'ললে, 'তোমার ক'টা বুদ্ধি আছে তা'তো তুমি বললে না?'

একথা শুনে শোলমাছ মুখটা কাঁচুমাচু ক'রে ব'ললে, 'আমার মাত্র একটি বুদ্ধি আছে। লাফ দেওয়া ছাড়া আর কিছু আমি জানি না। তাহ'লে আমার কী হবে!'

কাচিম হেসে ব'ললে, 'কী আর হবে। আমাদের তো অনেক বুদ্ধি আছে। তার থেকেই তোমাকে না হয় কিছু দোব। তুমি তো আমাদের বন্ধু।

এসব কথাবার্তার পরে শেয়াল ব'ললে, 'এবার তা হ'লে আমাদের যা'র যা' বুদ্ধি আছে কাজে লাগাই এস।'

এমন সময় চাষী হাতে আলো নিয়ে বেগুন-ক্ষেত দেখতে আসছিল। ঐ সব কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে যেতেই সে চেঁচিয়ে ব'ললে 'কে রে, আমার ক্ষেতের ধারে কারা রাতে এমন গজর গজর ক'রছে? দাঁড়া যাচ্ছি!'

চাষীর গলার আওয়াজ পেয়েই শেয়াল দিক্‌বিদিক জ্ঞান না ক'রে দিলে টেনে দৌড়। ক্ষেতের ধার দিয়ে পালাতে যেয়ে তার গলায় দড়ির ফাঁস আটকে গেল। ফাঁদে প'ড়ে শেয়াল সেখানেই লাফালাফি করতে লাগল।

এদিকে কাচিম পড়ি কি মরি ক'রে দৌড়তে লাগল। পাশের চাষ দেওয়া জমিতে ছিল বড় বড় ঢেলা। ঢেলা-বাড়িতে দৌড়তে যেয়ে ঢেলা লেগে উল্টে চিৎপাত হ'য়ে পাগুলো ওপর পানে ক'রে সে ছটফট করতে লাগল। একটুও যাবার আর ক্ষমতা রইল না।

শেয়াল আর কাচিমের অবস্থাটা এতক্ষণ শোলমাছ চুপচাপ দেখছিল। সে এবার ব'ললে,

'আশির গলায় ফাঁসি, শত্তবুদ্ধি চিৎপতাং,
(আর) একবুদ্ধি মারে লাফ ঝপ্‌ ঝপাং।'

এই ব'লে শোলমাছ এক লাফে যেয়ে প'ড়ল পুকুরের জলে।

তারপর চাষী লোকজনকে ডেকে এনে আচ্ছা ক'রে শেয়াল আর কাচিমকে পিটিয়ে মেরে ফেললে।

হাতী ও শেয়াল

একবার এক হাতীর সংগে এক শেয়ালের বন্ধুত্ব হয়। একদিন শেয়াল হাতীকে ব'ললে, 'নদীর ওপারে অনেক আখ আছে। চলো, আখ খেয়ে আসা যাক।'

হাতী ব'ললে, 'আমি তো নদী সাঁতারে পেরোব। তুমি কেমন ক'রে ওপারে যাবে?

শেয়াল ব'ললে, 'আমি তোমার পিঠে চ'ড়ে যাবো।'

হাতী ব'ললে, 'বেশ, তাই চলো।' এই বলে হাতী নদী সাঁতারে পেরোল আর শেয়ালও তার পিঠে চ'ড়ে গেল। নদীর ধারে অনেক আখ গাছ। হাতী ও শেয়াল দু'জনেই খুব ক'রে খেতে লাগল। চাষীরা জানতে পেরে লাঠি-ঠ্যাঙা নিয়ে ছুটে এলো। শেয়াল বনের মধ্যে লুকিয়ে প'ড়ল। কিন্তু হাতী পারল না। চাষীরা হাতীকে খুব ক'রে মারলে। মার খেয়ে হাতী আবার বনে ফিরে এল। কিছু দিন পরে হাতীর সঙ্গে শেয়ালের দেখা। হাতী শেয়ালের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলে না। শেয়ালকে জব্দ করবার জন্য হাতী একদিন মরার মতো প'ড়ে রইল। শেয়াল এসে তাই দেখে ভাবলে, হাতী ম'রে গেছে। হাতীকে খাওয়া যাবে। এই ভেবে প্রথমে সে হাতীর মেটে খাবার জন্য হাতীর পেছন দিক দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। যেই

শিয়াল হাতীর পেটে ঢুকেছে অমনি হাতী পেছনটা টিপে বন্ধ ক'রে দিলে। দম্-বন্ধ হয়ে শেয়াল পেটের মধ্যে ছটফট করতে করতে হাতীকে ব'ললে, 'ভাই, একবার পেট থেকে বার ক'রে দাও, আর কোনোদিন তোমাকে কষ্ট দোব না।' অনেক কাঁদাকাটার পর হাতী তাকে পেট থেকে বেরুতে দিলে। হাঁপ ছেড়ে শেয়াল বাঁচল এবং প্রাণ নিয়ে বনের ভেতর পালাল। আর কোনদিন হাতীর কাছে এল না।

ছোটই বড়

কোনো বনে একটা বাঘ ও একটা হরিণ বাস ক'রত। বাঘের দুটো বাচ্ছা ছিল আর হরিণেরও দু'টো বাচ্ছা।

প্রতিদিন রাতে বাঘ শিকারে বেরুত আর হরিণও ভোর ভোর বনের মধ্যে চ'রতে যেত। একদিন বাঘের খুব জ্বর এসেছে। বাচ্ছাদের বনের মধ্যে বাসায় রেখে জ্বর-গায়ে ভোর বেলায় শিকারে বেরিয়েছে। হরিণও সেই সময়ে চরাট করতে যাচ্ছে। যে রাস্তা দিয়ে বাঘটা যাচ্ছে হরিণও সেই রাস্তা ধরেছে। বাঘ একটু আগে আগে আর তারই পেছনে পেছনে হরিণটাও যাচ্ছে।

বাঘের এত জ্বর এসেছে সে আর চ'লতে পারছে না। রাস্তার একপাশে ব'সে ব'সে কাঁপছে। হরিণটা দূর থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছে বাঘের খুব জ্বর এসেছে। সে আস্তে আস্তে বাঘের কাছে এল। বাঘের খুব কাছ ঘেঁষে ব'সল। তারপর হরিণ বাঘটার গাল জিব দিয়ে চাটতে লাগল। বাঘও বেশ আরাম পেতে লাগল। চোখ মেলে চেয়ে বাঘ ব'ললে 'কেরে, হরিণ?'

হরিণ বাঘের গাল চাটতে চাটতেই ব'ললে, 'হ্যাঁ, আমি। তোমার খুব জ্বর হ'য়েছে। তুমি কাঁপছো। তাই তোমার গাল চেটে দিচ্ছি।'

বাঘ আর কিছু ব'ললে না। চুপ ক'রে চোখ বুজে ব'সে রইল। এত চমৎকার ক'রে হরিণ বাঘের গাল চেটে দিচ্ছিল যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই বাঘের জ্বর একেবারে ছেড়ে গেল।

বাঘের জ্বর ছেড়ে যেতেই বাঘ ব'লতে লাগল,

'হায়রে অভাদ্রা বর্ষাকাল,
হরিণ চাটে বাঘের গাল।
শোনরে হরিণ তোরে কই,
সময় বুঝে সকল সই।'

কিছুক্ষণ পরে বাঘ একদিকে চ'লে গেল আর হরিণও অন্যদিকে চ'রতে গেল।

বনের পশু ধরবার জন্যই সেই বনের একপাশে এক শিকারী জাল পেতে রেখেছিল। হরিণ চ'রতে চ'রতে হঠাৎ সেই জালে প'ড়ে গেল। জালে প'ড়ে হরিণ লাফালাফি ক'রতে ক'রতে ভীষণভাবে জড়িয়ে গেল। শিকারী অবশ্য তখন সেখানে ছিল না।

জালের মধ্যে লাফালাফির চোটে হরিণ নির্জীব হ'য়ে প'ড়ল। পাশেই একটা ইঁদুরের গাড়ার মধ্যে একটা ইঁদুর ছিল। গাঁড়া থেকে ইঁদুরটা বার হ'য়ে হরিণের অবস্থাটা অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য ক'রলে। তারপর হরিণকে বললে, 'কে, দাদা হরিণ ?'

হরিণ জালের ভেতর থেকে ব'ললে, 'কেরে, ভাই ইঁদুর ?' ইঁদুর ব'ললে, 'হ্যাঁ দাদা, তুমি তো দেখছি শিকারীর জালে প'ড়েছ ? শিকারী এলেই তো তোমাকে ধ'রে ফেলবে !'

হরিণ ব'ললে তাহ'লে কী হবে ভাই ! আমার কি বাঁচবার কোনো উপায় নেই ?'

'আচ্ছা, আমি তোমায় এ-বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রছি'।—এই ব'লে ইঁদুরটা জালের সব দড়ি একটি একটি ক'রে দাঁত দিয়ে কেটে দিলে। হরিণ শিকারীর জাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের বাসার দিকে চ'লে গেল।

ঐ ইঁদুরটা প্রতিদিন মাঠময় খুঁজে বেড়ায় কোন্ চাষীর কী ফসল আছে। একদিন ইঁদুর মাঠে ফসল খুঁজছে। এমন সময় একটা চিল ইঁদুরটাকে দেখতে পেয়ে তার পেছনে পেছনে ধাওয়া ক'রলে। ভয়ে ইঁদুরটা ছুটতে ছুটতে হরিণের বাসায় এসে হাজির হ'ল। দেখলে, হরিণ তখন তার বাচ্ছা দুটোকে দুধ দিচ্ছে। ইঁদুর হাঁপাতে হাঁপাতে হরিণকে ব'ললে, 'দাদা, আজকে আমার খুবই বিপদ। তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমায় রক্ষে করো।' হরিণ ইঁদুরের জন্যে কিছু ক'রলে না। ইঁদুরকে ব'ললে, 'তুই যখন অতবড় জালটাকে তোর ঐ ছোট ছোট দাঁত দিয়ে কাটতে পারিস তখন তোর অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। তুই সব পারিস। তুই এখনই এখান থেকে চলে যা, তোকে আশ্রয় দিতে আমি পারবো না।'

হরিণের কাছে আশ্রয় না পেয়ে ইঁদুর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অন্য জায়গায় চ'লে গেল।

শেয়াল ও ছাগল

কোনো গাঁয়ের পাশে এক পুকুরের ধারে কাঁকড়া ধরবে ব'লে এক শেয়াল লেজ ডুবিয়ে চুপ করে ব'সেছিল। এমন সময় একটা ছাগল এসে শেয়ালের সামনে প'ড়ে গেল। ছাগলের খুব ভয় হ'ল। সে শেয়ালের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তার গুণগান ক'রে ব'লতে লাগল,

'সোনার আঁচির, সোনার পাঁচির,
সোনার সাত পাট দেয়াল।
স্বর্ণের কুণ্ডল কর্ণে ব'সে আছেন
আমার বাবা ঠাকুর শেয়াল।'

ছাগলের মুখে গুণগান শুনে শেয়াল মনে মনে খুবই খুশি হ'ল। ছাগলকে ব'ললে, 'ব'সো ভাই ছাগল, ব'সো।' ছাগল ভয়ে ভয়ে ব'সল। শেয়াল মনে মনে ঠিক ক'রলে, সে ছাগলকে খাবে। কিন্তু ছাগল উদ্ধারের পথ খুঁজছিল। এমন সময় কোথা থেকে একটা কুকুর এসে শেয়ালকে তাড়া করতেই শেয়াল দৌড় দিলে। ছাগলও সেখান থেকে দৌড়ে পালাল। ছাগলকে পালাতে দেখে শেয়াল ছুটতে ছুটতেই ব'ললে, 'ভাই ছাগল, তুমি পালাচ্ছো কেন? তুমি ওখানে থাকো।'

ছাগল দূর থেকেই ব'ললে,

গুয়ের আঁচির, গুয়ের পাঁচির
গুয়ের সাতপাট দেয়াল।
গুগ্‌লি কানে ব'সে আছে
গু-খেকোর ব্যাটা শেয়াল।'

এই ব'লে ছাগল পালাল। শেয়ালও মন খারাপ ক'রে বনের মধ্যে চ'লে গেল।

শোকার্ত বক

কোনো জায়গায় এক বক ও এক উকুন থাকত। দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। নদী, পুকুর, খালবিল থেকে বক মাছ ধ'রে ঠোঁটে ক'রে ব'য়ে নিয়ে আসত আর উকুন সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে রাখত। তারপর বক এলে দু'জনে মিলে সেই পোড়া মাছ আরাম ক'রে খেত।

একদিন বক নদী থেকে একটা বড় বোয়াল মাছ ধ'রে নিয়ে এসেছে। বক বোয়াল মাছকে উকুনের কাছে ফেলতেই সেটা মাটিতে তড়াং তড়াং ক'রে লাফাতে লাগল। উকুনের খুব ফুর্তি। উকুন বককে ব'ললে, আজ মাছটা বেশ জ্যান্ত আর খুব বড় আছে হে! পুড়িয়ে দু'জনে তোফা খাওয়া যাবে।'

বক হেসে ব'ললে, 'তুমি আচ্ছা ক'রে খড়-কুটোর আগুনে ওটাকে ঝলসে রাখ, আমি আরও মাছ পাই নাকি দেখি।' এই ব'লে বক উড়ে আবার মাছের সন্ধানে বেরিয়ে প'ড়ল।

উকুন কিছু কুটি জোগাড় ক'রে তা'তে আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর সেই জ্যান্ত বোয়াল মাছকে আগুনে ফেলে দিতেই মাছটা ছটফট ছটফট ক'রে লাফাতে লাগল। আগুন ছিটকে এসে প'ড়ল উকুনের ওপর।

কিছুক্ষণের মধ্যে বোয়াল মাছ আর উকুন দু'জনেই আগুনে পুড়ে ম'রে পড়ে রইল সেখানে।

বক মাছ ধ'রে ফিরে এসে দেখলে, বোয়াল মাছও পুড়েছে আর উকুনও পুড়ে মরে প'ড়ে আছে। বন্ধুর মৃত্যুতে বক শোকে পোড়া বোয়াল মাছকে ছুঁলে না। মনের দুঃখে উড়ে যেয়ে নদীর কিনারায় জলের ধারে চুপ ক'রে ব'সে রইল। নদীর জল বেশ পরিষ্কার। জলের ভেতর অনেক দূর পর্যন্ত মাছ দেখা যায়। নদীর জলে মাছেরা ঘুরছে ফিরছে, বকের কাছে আসছে। কিন্তু বক তাদের কাউকে ধ'রছে না। তাই দেখে একটা মাছ সাহস ক'রে বকের কাছে এসে ব'ললে, 'ও ভাই বক, তুমি তো আজ কোনো মাছকে ধ'রছো না। তোমার কী হ'য়েছে?'

বক মাছকে ব'ললে,

'উকুনের শোগে
বগা ভোগে।'

এই বলা মাত্র নদীর জল ঘোলা হ'য়ে গেল। আর একটি মাছকেও দেখা গেল না। বকটা নদীর ধার থেকে উড়ে গেল।

মাঠের মধ্যে একটা এঁড়ে গরু মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছিল। বকটা উড়ে উড়ে সেই এঁড়ে গরুটার কাছে এসে ব'সল। বক চুপচাপ ব'সে আছে দেখে এঁড়ে গরু

তাকে ব'ললে, 'তোমার কী হ'য়েছে ভাই ? তুমি অমন মনমরা হ'য়ে ব'সে আছ কেন ?'

বক ব'ললে,

''উকুনের শোগে
বগা ভোগে।
পানি হ'ল ঘোলা।'

বকের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই এ'ড়ে গরুটার লেজটা সম্পূর্ণ খ'সে গেল। বক সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয় ভেবে উড়ে উড়ে যেয়ে ব'সল এক বটগাছের মাথায়।

বহুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখে বটগাছ বককে ব'ললে, 'আচ্ছা ভাই বক, তুমি বহুক্ষণ অমন চুপ ক'রে ব'সে আছ কেন ? তুমি তো কই চরাট ক'রতে যাচ্ছো না ? কী হ'ল তোমার ?'

বক এবার মুখ খুললে,

'উকুনের শোগে
বগা ভোগে।
পানি হ'ল ঘোলা
এ'ড়ে হ'ল বেঁড়ে।'

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বটগাছের সব পাতা খ'সে ঝর্‌ঝর্‌ করে নীচে প'ড়ে গেল। বটগাছটা নেড়া হ'য়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল।

বকটা এবার উড়তে উড়তে এসে এক জায়গায় দেখলে, একটা বাড়িতে দাঁড়ে একটা টিয়াপাখী ব'সে আছে। দাঁড়ের এক পাশে বক এসে ব'সল। টিয়াপাখী দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি কথাও ব'লতে পারে মানুষের মতো। বক নিঝুম হ'য়ে ব'সে আছে। তাই দেখে টিয়াপাখী ব'ললে 'ও ভাই বক, তুমি মনমরা হ'য়ে ব'সে আছ কেন ? তোমার কী হয়েছে বলতো ?'

বক মনের দুঃখে ব'ললে,

'উকুনের শোগে
বগা ভোগে।
পানি হ'ল ঘোলা,
এ'ড়ে হল বেঁড়ে।
বট হ'ল নেড়া।'

বকের একথা শেষ হ'তেই টিয়াপাখীর চোখ দু'টো টেরা হয়ে গেল। সে আর সোজা দিকে চাইতে পারলে না। টিয়াপাখী বককে ব'ললে, 'একি ভাই, আমি আর সোজা দিকে চাইতে পারছি না। আমি যে টেরা হ'য়ে গেনু !'

টিয়ার কথার জবাব না দিয়ে বক সেখান থেকে শোঁ ক'রে উড়ে পড়ল। উড়ে উড়ে

যেয়ে ব'সল এক কুলগাছের ওপর। কুলগাছটার কুল এত মিষ্টি যে, পথ দিয়ে যেই যাক একটা দু'টো কুল সে মুখে দিয়ে যাবেই। পাখীতেও খায় অনেক।

মনের দুঃখে বক সেই কুলগাছের ডালে চুপ ক'রে ব'সে রইল। বককে চুপচাপ ব'সে থাকতে দেখে কুলগাছ ব'ললে, 'ও ভাই বক, আমার কুল এত মিষ্টি! সবাই খায়। কই, তুমি তো একটাও খাচ্ছো না? তোমার হ'য়েছে কী?'

বকটা কুল গাছকে ব'ললে,

'উকুনের শোগে
বগা ভোগে।
পানি হ'ল ঘোলা,
এঁড়ে হ'ল বেঁড়ে,
বট হ'ল নেড়া,
টিয়া হ'ল টেরা।'

বকের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই কুলগাছের সব কুল টোকে জোঁদা হ'য়ে গেল। গাছের টোকো কুল আর কেউ মুখে দিতে পারলে না।

এবার বকটা উড়ে এসে ব'সল এক রাজবাড়িতে। রাজবাড়ির ভেতর বকটা এক জায়গায় ঝিম্-মেরে ব'সে রইল।

রাণী বহুক্ষণ ধ'রে বকটাকে লক্ষ্য ক'রছিল। বকের একটু কাছে এসে রাণী আপন মনে ব'লতে লাগল, 'বকটা আবার কোথা থেকে এল?'

অমন সুন্দর বকটা চুপচাপ ব'সে আছে কেন? ওর কী হ'য়েছে কে জানে?' রাণীর কথা শুনে বক ব'লতে আরম্ভ ক'রলে,

'উকুনের শোগে
বগা ভোগে।
পানি হ'ল ঘোলা,
এঁড়ে হ'ল বেঁড়ে,
বট হ'ল নেড়া,
টিয়া হ'ল টেরা,
কুল হ'ল জোঁদা।'

একথা ব'লেই বক উড়ে যেয়ে যেখানে রাজা লোকজন নিয়ে সলা-পরামর্শ ক'রছিল ঠিক তার পাশটিতে ব'সে প'ড়ল।

আর এদিকে বকের কথা ফুরোতেই রাণী নাচতে শুরু ক'রলে। এমন নাচ নাচতে লাগল যে, রাণীর নাচ কেউ আর থামাতে পারলে না।

রাজাকে তার লোকজন জানিয়ে দিয়ে এল, 'ঐ বকটা কী সব ব'লে উড়ে যাবার পর থেকেই রাণী নাচতে লেগে গেছে।'

রাজা বককে দেখে ব'ললে, 'এই বকটা আবার রাণীর কাছে যেয়ে কী এমন ব'ললে? আরে বকটা নিঝুম হ'য়ে ব'সে আছে! কী হ'য়েছে ওর? রাজার কথা শেষ হ'তেই বক ব'লতে শুরু ক'রলে,

'উকুনের শোগে
বগা ভোগে।
পানি হ'ল ঘোলা,
এঁড়ে হ'ল বেঁড়ে,
গাছ হ'ল নেড়া,
টিয়া হ'ল টেরা,
কুল হ'ল জোঁদা,
রাণী হ'ল নাচন্তী।'

একথা শেষ হ'তেই রাজা গান গাইতে আরম্ভ ক'রলে। রাজা এমন একটানা গান ধ'রলে যে, সে গান শুনে সবাই মুগ্ধ হ'য়ে যেতে লাগল। রাণীর নাচ আর রাজার গানের বিরাম নাই দেখে রাজবাড়ির সবাই চিন্তিত হ'য়ে উঠল।

শেষে রাজার একজন তীরন্দাজ এক তীরে বকটাকে মেরে ফেললে। বকটা ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল।

বাঘ ও বক

এক বাঘ ও এক বকের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। বাঘ বনে থাকত। আর তার বাসার কাছেই একটা তেঁতুলগাছে বাস ক'রত বক।

বাঘ একদিন তার বন্ধু বককে ব'ললে, 'এক কাজ করি এস।' বক বাঘের মুখপানে চেয়ে ব'ললে, 'কী কাজ?'

বাঘ ব'ললে, 'আখের গুড় কিন্তু খেতে বড় মিষ্টি। তাই ব'লছি, দু'জনে মিলে আখ চাষ করি এস।'

বক হেসে ব'ললে, 'তা বড় মন্দ বল নি। কিন্তু আখ চাষ ক'রতে গেলে আগে তো জমি চাই। সে জমি কোথায়?'

বাঘ ব'ললে, 'এই বনের ধারেই কাঠা খানেক জমি প'ড়ে আছে। নদীর জল এসে এসে পলি প'ড়ে ও-জমির মাটি বেশ ভাল হ'য়ে আছে। ওটাতেই দু'জনে মিলে আখ চাষ ক'রবো।'

বাঘ আর বক দু'জনে মিলে যুক্তি ক'রে জমি চ'ষতে লেগে গেল। বাঘ নখে

ক'রে আর বক তার ঠোঁটে ক'রে মাটি আঁচড়াতে জমির মাটি আলগা হ'য়ে গেল। তারপর আগাছাগুলো বাঘ উঁচে উঁচে এক কাছে গাদা দিতে লাগল আর বক সেগুলো ঠোঁটে ক'রে ব'য়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে এল। জমি তৈরী হ'য়ে গেলে বক ব'ললে, 'জমির মাটি তৈরী তো হ'ল। কিন্তু কিছু সার না দিলে তো আখ বেশ ভাল হবে না। তার কী ক'রবে?' মাঠে এক চাষী জমিতে সার ছড়াচ্ছিল। তাকে দেখিয়ে বাঘ বককে ব'ললে, 'ঐ যে দূরে জমিতে এক চাষী সার ছড়াচ্ছে। আমি হাউ হাউ ক'রতে ক'রতে ও'কে খেদড়া দোব। তা হ'লেই ও'সব ফেলে রেখে পালাবে। সেই তালে তুমি ঠোঁটে ক'রে ঐ সার ব'য়ে এনে আমাদের জমিতে ফেলবে।'

বাঘ তাই ক'রলে। বাঘ দেখে চাষী জমিতে সার ছড়ানো ফেলে 'বাবারে, বাঘে খেয়ে ফেল্‌লে রে' ব'লে চীৎকার ক'রতে ক'রতে পালিয়ে গেল। সেই তালে বক সব সার ঠোঁটে ক'রে ব'য়ে ব'য়ে এনে জমিতে ছড়িয়ে দিলে।

এবার বক বাঘকে ব'ললে, 'সার তো দেওয়া হ'ল। আসল জিনিসই তো এবার দরকার।'

বাঘ বললে, 'কী?'

বক বললে, 'আখের ডগা চাই-তো?'

বাঘ একটু হেসে ব'ললে, 'সে আর এমন কী ব্যাপার? ঐ দেখ লোকেরা জমিতে আখের ডগা বসাচ্ছে। আমি আবার তেমনি ক'রে খেদড়া দোব। আর তুমি একটি একটি ক'রে ডগা ব'য়ে এনে জমিতে ফেলবে।'

দুজনে তাই ক'রলে। আখের ডগাও মিলে গেল। দু'জনে সেই জমিতে আখের ডগা বসিয়ে ফেললে। দেখতে দেখতে আখ বেড়েও গেল খুব।

বাঘ একদিন বককে ব'ললে, 'আখ বেশ ভাল হ'য়েছে হে! কিন্তু ছোট্ দিয়ে আখ বাঁধতে পারলে আরও ভাল হ'ত।'

বক ব'ললে, 'তার জন্যে আর ভাবনা কী! আর একবার খেদড়া-খেদড়ি ক'রলেই হ'ল। তা হ'লেই তো ছোট্ যোগাড় হ'য়ে যাবে।' বাঘ হেসে ব'ললে, 'লোক পেলে তো খেদড়াবো? সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো!'

'আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি দেখে আসছি।' এই ব'লে বক শোঁ ক'রে উড়ে চ'লে গেল। একটু পরে এসে বাঘকে ব'ললে, 'এখান থেকে দশ পনের কিতে তফাতে কয়েকটা লোক এইমাত্র আখ বাঁধতে শুরু ক'রেছে। তাদের পাকানো ছোট্ জমির আলে প'ড়ে আছে। দেখ, যদি কিছু ক'রতে পার।'

বাঘ ব'ললে, 'চল, আবার তেমনি ক'রেই ছোট্ যোগাড় ক'রে আনিগে।' এই ব'লে দু'জনে চ'লে গেল। বাঘের ডাকে প্রাণ নিয়ে লোকগুলো পালাতেই সেই ছোট্ নিয়ে এসে বাঘ আর বক দু'জনে মিলে তাদের আখের জোড় বেঁধে দিলে।

আখ তৈরী হ'য়ে যেতেই বাঘ ব'ললে, 'এবার আখ মেড়ে গুড় তো ক'রতে হবে ? আখশাল কেমন ক'রে পাওয়া যাবে ?'

'আমি দেখেছি কোন্ আখশাল ফাঁকা যাচ্ছে।' এই ব'লে বক উড়ে উড়ে আখশালের সন্ধান ক'রতে লাগল। একদিন সন্ধান পেয়ে গেল। বাঘকে ব'ললে, 'অমুক আখশালে আজ আখমাড়া বন্ধ আছে।'

বাঘ ব'ললে, 'তবে আর দেরী নয়। আজই আমরা আখ মেড়ে ফেলবো।'

দু'জনে মিলে আখ ক'রতে লেগে গেল। বাঘ দাঁত দিয়ে কাটে আর বক আখপাতা ছাড়িয়ে আগড়দা বাঁধে।

তারপর দু'জনে সব আখ সন্ধ্যের পরে আখশালে ব'য়ে নিয়ে এল। এবার কলে বক আখ খাওয়াতে লাগল আর কলের বেড়ে কাঠটা বাঘ ঘুরোতে লাগল। সব আখ মাড়া হ'য়ে যেতেই রস কড়াইয়ে দিয়ে বাঘ জ্বাল দিতে লাগল আর বক একটা কাঠি নিয়ে ঘাঁটতে লাগল।

গুড় তৈরী হ'য়ে গেল। গরম গুড় ডাবায় একটা লাবড়ে দিয়ে বাঘ ফাঁটতে লাগল।

আগে থেকে বক চারটে খালি কেনেস্তারা যোগাড় ক'রে রেখেছিল। তা'তেই গরম গুড় ভ'রে দিলে। চার কেনেস্তারা গুড় হ'ল।

সকাল হ'তেই বাঘ মুখ-হাত ধুতে পুকুর ধারে চ'লে গেল। অমনি বক সেই চার কেনেস্তারা গুড় ঠোঁটে ক'রে ব'য়ে নিয়ে তেঁতুলগাছের ওপর চ'লে গেল।

মুখ-হাত ধুয়ে বাঘ আখশালে ফিরে এসে দেখলে, বকও নেই আর গুড়ও নেই।

খুঁজতে খুঁজতে বাঘ সেই তেঁতুলগাছের নীচে যেয়ে দেখলে, গাছের ডালে বক ব'সে ব'সে দিব্যি গুড় খাচ্ছে। বাঘ নীচে থেকে বককে ব'ললে, 'তুমি যে চার কেনেস্তারা গুড়ই নিয়ে গেলে ? আমার ভাগের গুড় কই ?' গুড় খেতে খেতে বক ব'ললে, 'গুড় তোমাকে আমি দোব না। খেতে খেতে এক আধটু যা নীচেতে প'ড়বে তাই তুমি চেটে চেটে খাবে।'

বকের কথা শুনে বাঘ রেগে চীৎকার ক'রতে লাগল। বাঘের চীৎকারে বক একটু আনমনা হ'য়ে যেতেই এক কেনেস্তারা গুড় তেঁতুলগাছের ওপর থেকে নীচে মাটিতে প'ড়ে গেল। বক কক্ কক্ ক'রে ব'লে উঠল, 'ওটা যখন নীচেয় প'ড়েই গেল তখন ঐ কেনেস্তারার গুড় তুমিই খাও গে।'

বাঘ ব'ললে, 'ভাগে আমি আর একটা তো পাই ?'

বক ব'ললে, 'না। আর তোমাকে দোব না। তুমি আমার যা পার ক'রবে।'

বাঘ সেই এক কেনেস্তারা গুড় নিয়ে রাগে গরগর ক'রতে ক'রতে বাসায় চ'লে গেল। বাঘ মনে মনে ভাবে, আমার বুদ্ধিতেই আখ চাষ হ'ল। আমি পরিশ্রমও ক'রনু বেশী। আর বক আমাকেই ফাঁকি দিলে!

বাঘের খুব রাগ হ'ল। বনের মধ্যে সে থাকে আর ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য রাখে বক কোথায় যায়। একদিন বাঘটা দেখলে, দূরে একটা পুকুরে জলের ধারে বকটা মাছ খাবার জন্যে চুপ ক'রে ব'সে আছে। বাঘ খুব সাবধানে পা টিপে টিপে পুকুর পাড়ের আড়ালে আড়ালে যেয়ে বকটার ঠিক পেছনে একটু দূরে একটা গাছের পাশে অল্পক্ষণ দাঁড়াল। তারপর তাক বুঝে ছুটে যেয়ে 'হাউ' ক'রে ধ'রলে বকের গলাটা। বক কোক্ কোক্ ক'রতে ক'রতে ব'ললে, 'ভাই আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে সব গুড় দিয়ে দোব। আমি অন্যায় ক'রেছি।'

বাঘ বকের গলাটা কামড়ে ধ'রেই ব'ললে, 'গুড়ের আমার দরকার নেই। তোমার মতো বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে আমি আর ছাড়ছি না।' এই ব'লে দাঁত দিয়ে বকের গলাটা কচ ক'রে কেটে দিলে। তারপর গোটা বকটাকে কড়্মড়্ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে নিয়ে বাসায় ফিরে এসে ঘুমোতে লাগল।

কুণি আর বুনি

কোনো গাঁয়ে এক বামুন বাস করত। সে একদিন জন-কিরষেণদের জন্যে মাঠে জলখবার নিয়ে গেছে। জমির আলে জলখাবার নামিয়ে বামুন একটু অপেক্ষা করছে। জমির ধারেই ছিল একটা বন। সেই বনে থাকত একটা মেয়ে-ভূত। বনে থাকত ব'লে তার নাম বুনি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বামুন হঠাৎ শুনতে পেলে —কে যেন নাকি সুরে ব'লছে, 'কুঁণি"কে" ব'লো বুনির পুত হ'য়েছে, মাসীর কাঁছে" কাঁপ"ড় চে"য়ে"ছে"।'

বনের ভেতর থেকে দু' তিনবার এরকম কথা শোনা গেল। তা শুনে বামুন একটু ভয় খেয়ে 'রাম' নাম জপতে লাগল। জনেদের জল খাওয়া শেষ হ'লে বামুন বাড়ি ফিরে এল। চান-টান সেরে পুজো করতে যাবার আগে বামুনের ভূতের কথা মনে প'ড়ে গেল। বামনীকে ডেকে ব'ললে, 'ওগো শুনছ!' বামনী ঘরসংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল। তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছে এসে ব'ললে, 'কেন, কী ব'লছ?'

বামুন বললে, 'আজ যখন জমিতে জনেদের জন্যে জলখাবার নিয়ে গেসনু তখন বন থেকে কে যেন নাকি সুরে বললে, 'কুণিকে ব'লো বুনির পুত হ'য়েছে'। কী ব্যাপার বল দিকিন্?' কথাটা শেষ হতে না হতেই বামুনের বাড়ির এঁদো কোণ থেকে নাকি সুরে একটা কথা এল, 'ক" দি"বসে, ক"খ"ন হ"ল"?'

বামুন বামনী দু'জনেই থতমত খেয়ে চুপচাপ। দু'জনেই বুঝতে পারলে,

তাদের বাড়ির কোণে আর একটা মেয়ে-ভূত। সে কোণে থাকে বলে তার নাম কুণি। বামুন ভয়ে-ময়ে কোণের ভূতকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'মাসীর কাছে কাপড় চেয়েছে।'

কুণি বললে, 'মাসী কাঁপড় কোঁথায় পাঁবে ?'

বামুন কোনো দিকে না চেয়ে বললে, 'তোমার কিচ্ছু চিন্তা নেই। আমি তোমায় কাপড় দোব।'

কুণি বললে, 'তুঁমি কোঁথায় পাঁবে ?'

ভয়ে বামনীর গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। বামুন বললে, 'আমি পুজোয় যে কাপড় পেয়েছি তোমাকে তাই দোব। কুণি বললে, 'তঁবে তাঁই এঁকখাঁনা দাঁও।'

একখানা কাপড় এনে ভয়ে ভয়ে বাড়ির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বামুন বামনী দু'জনেই ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল। বামুন যখন চ'লে যাচ্ছে তখন কুণি আবার ব'ললে, 'ব'লে দিঁয়ে যাঁও, কোঁথায় আঁছে, কোঁন্ মাঠেঁতে ?'

বামুন পেছন না ফিরেই বললে, 'দখিন মাঠের তালতলায়, বনের ধারেতে।'

এই কথা শোনা মাত্রই কুণি হাওয়ায় ভর দিয়ে শোঁ শোঁ ক'রে দিলে টেনে এক ছুট।

এদিকে বামুন বামনী দু'জনেই ভয়ে কাঠ হ'য়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

শাঁকের ঘণ্ট

কোনো গ্রামে এক জমিদার ছিল। জমিদারবাবুর মস্তবড় পাকাবাড়ি। অনেক লোকজন খাটত তার বাড়িতে। ঐ গ্রামের কাছেই ছিল একটা বড় পুকুর। সেই পুকুরের পাড়ে ছিল শ্মশান। আর সেই শ্মশানের একপাশে ছিল একটা পুরনো শেওড়া গাছ। সেই শেওড়া গাছে থাকতো একটা শাঁকচিন্নি।

শাঁখা আর শাঁকের ওপর ভীষণ লোভ ছিল ঐ শাঁকচিন্নির।

গ্রামের জমিদারবাবুর ছেলের বিয়ে। খুব ধুমধাম। বহু লোকজন নিমন্ত্রিত। অনেক মেয়ে-কুটুমে ঘর ভ'রে গেছে। বেশ কয়েকদিন ধ'রে কত লোক জমিদারবাড়ি আসছে যাচ্ছে। জোর খাওয়া-দাওয়াও চ'লছে। শ্মশানের শেওড়াগাছটা থেকে ঐ শাঁকচিন্নি সবই লক্ষ্য ক'রছিল।

বিয়ের পরের দিন বিরাট ভোজের আয়োজন হয়েছে জমিদারবাড়িতে। পুরুষ মানুষদের খাওয়ার শেষে মেয়েরা খেতে ব'সেছে। মেয়েদের খাওয়া চ'লছে পুরোদমে। সন্ধ্যের পরে চারদিক অন্ধকার হ'য়ে গেছে। বিয়েবাড়িতে আলো জ্বলছে।

শাঁকচিন্নিটা গুটি গুটি ক'রে এসে হাজির হ'ল বিয়েবাড়িতে। মেয়েদের খাওয়া-দাওয়া তখনও চ'লছে। আর একটি দল খেলেই খাওয়ার পর্ব শেষ। মেয়েরা লম্বা সার ক'রে ব'সে ব'সে খাচ্ছে। যারা পরিবেশন ক'রছে তারা প্রত্যেকের কাছে যেয়ে জিজ্ঞেসা ক'রছে, 'আপনাকে আর কী দোব?' যে যা চাইছে তাকে তাই দেওয়া হ'চ্ছে। পরিবেশনকারীদের মধ্যে একজনের হঠাৎ লক্ষ্য প'ড়ে গেল, একটি মেয়ে একটু পাশে খেতে ব'সেছে। পরনে তার লাল পেড়ে শাড়ী। সেই শাড়ীটা দিয়ে তার আপাদমস্তক ঢাকা। ঘোমটাটি খুবই লম্বা ক'রে দিয়ে সে তার মুখটা সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে। আর কিছুটা উবু হ'য়েও সে ব'সেছে। অনেকেই দেখছিল, তার হাত দু'টো বিরাট লম্বা এবং খুব কালো কালো। দেখে মনে হ'চ্ছে—পুড়ে যেন কালো হ'য়ে গেছে। পরিবেশনকারী লক্ষ্য ক'রলে, সে কিছুই খাচ্ছে না। তাই সে ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কই, আপনি তো কিছু খাচ্ছেন না? আপনাকে কী দোব?'

মেয়েটি ঘোমটার আড়াল থেকে নাকি সুরে ব'ললে, 'আমাকে শাঁকের একটু ঘণ্ট দাও না?'

সেকথা শুনে সবাই তো অবাক। শাঁকের আবার ঘণ্ট কি রে বাবা! যে মেয়েরা খাচ্ছিল তারা সবাই ওই মেয়েটির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালে। একজন ব'ললে, 'হ্যাঁ

গা, তুমি কোথাকার ? কে তুমি ?' মেয়েটি ঘোমটার ভেতর থেকে আবার নাকি সুরে বললে, 'এ গাঁয়েই আমি থাকি। ওই শ্মশানের পাশে শেওড়া গাছটায় আমার বাসা। আমার যে নাম এককালে ছিল সে নাম আমার নেই। আমি এখন শাঁকচিন্নি।' এই ব'লেই শাঁকচিন্নিটা উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়ল। ভয়ে কাঠ হ'য়ে সবাই দেখতে পেলে, মেয়েটি খুব লম্বা হ'তে আরম্ভ করল। লম্বা হ'তে হ'তে জমিদারবাবুর দোতলা বাড়ির কার্নিশে ঠেকে গেল। তারপর সরু আর লম্বা লম্বা পা দু'খানার একটা এখানে আর একটা ওখানে ফেলে চ'লতে শুরু করলে। তাই দেখে যে যেদিকে পারলে 'বাপরে মরিরে' ক'রে দিলে টেনে দৌড়।

'আমাকে এ'কটু শাঁকের ঘণ্ট দিলে না ? তোমরা আমাকে এ'কটু শাঁকের ঘণ্ট দিলে না ?' —এই কথা বার-বার ব'লতে ব'লতে শাঁকচিন্নিটা শ্মশানের ধারে সেই শেওড়া গাছটায় চ'লে গেল।

মাণিকে ভূতের দুর্দশা

কোনো গাঁয়ে এক বিধবা বুড়ি ছিল। তার ছেলে মাণিক অল্প বয়সেই মারা যায়। ঐ বিধবা খুবই কষ্টের সঙ্গে একাই বাড়িতে বাস করে। পোড়া পেটের জন্যে ঘর-সংসারের কাজকর্ম তাকে ক'রতে হয়।

মাণিকের মায়ের ঘরের এক পাশে একটা বড় তালগাছে একটা ভূত বাস ক'রত।

মাণিকের মা প্রতিদিন ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে ময়লা ঝাঁটাটা সেই তালগাছের গোড়ায় দু'চার ঘা মেরে পরিষ্কার ক'রে নিত।

ময়লার গন্ধে ভূতের তালগাছে ওঠা-নামা ক'রতে খুবই অসুবিধে হ'ত।

একদিন ভূতটা মানুষের রূপ ধ'রে মেয়েটির সামনে এসে ব'ললে, 'দেখ্, প্রতিদিন তুই ময়লা ঝাঁটা ঐ তালগাছের গোড়ায় মারিস্ না। আমার ওঠা-নামা ক'রতে খুবই অসুবিধে হ'চ্ছে।'

মাণিকের মা ব'ললে, 'কে রে তুই ? তোর অসুবিধে হচ্ছে তো আমার কি ?'

ভূতটা ব'ললে, 'আমি তোর ছেলে, মাণিক।'

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে ব'ললে, 'না, তুই আমার ছেলে কেন হ'তে যাবি ? আমার ছেলে মাণিক কবে আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে।'

ভূত ব'ললে, 'না গো, আমারও নাম মাণিক। আমি এই তালগাছটায় থাকি।'

মাণিকের মা ব'ললে, 'তুই মানুষ ন'স। তুই তো তাহ'লে ভূত ?'

ভূত ব'ললে, 'হ্যাঁ মা। তুই আর যেন তালগাছে ময়লা ঝাঁটা মারিস না।'

মাণিকের মা ব'ললে, 'বেশ ক'রবো মারবো। তুই আমাকে কী দিবি তাই তালগাছে ঝাঁটা মারা আমি বন্ধ ক'রবো ?'

ভূতটা ব'ললে, 'মা, তোকে আমি ভাল রকম পাওনা পাইয়ে দোব, তুই তালগাছে ঝাঁটা মারা বন্ধ কর।'

মেয়েটি ব'ললে, 'তুই তো ব্যাটা মাণ্‌কে ভূত। তুই কিভাবে আমাকে পাওনা পাইয়ে দিবি ?'

ভূতটা মাণিকের মাকে ব'ললে, 'দেখ্‌, আমি দেশের বহু মেয়েকে একের পর এক ধ'রবো। আমি যাকে ধ'রবো সেই মেয়েটির মুখ দিয়ে বলাবো, মাণিকের মা নাহ'লে আমাকে কেউ ছাড়াতে পারবে না। তারপর তোকে ডাকতে লোক আসবে। তুই যাবি। তাহ'লেই আমি মেয়েটিকে ছেড়ে দোব। আর তুইও তোর পাওনা পাবি।'

মাণিকের মা ব'ললে, 'তা নাহয় যাবো। যেয়ে কী ব'লবো ?'

মাণ্‌কে ভূত ব'ললে, 'এক গাছা ঝাঁটা হাতে ক'রে যাবি। গেরস্থর সঙ্গে টাকার চুক্তি ক'রে নিবি আগেই। তারপর ঝাঁটা হাতে মেয়েটির কাছে যেয়ে ব'লবি,

যাবি তো যা,
নইলে ময়লা ঝাঁটা খা।

এই বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি মেয়েটিকে ছেড়ে চ'লে যাবো। আর তুই তোর পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিবি।'

তারপর মাণ্‌কে ভূত এ-গাঁয়ের সে-গাঁয়ের অনেক বড় বড় লোকের মেয়েকে ধ'রলে। মাণিকের মায়ের ঘন ঘন ডাক আসতে লাগল। ভূত ছাড়িয়ে মাণিকে মায়ের অনেক টাকা-পয়সা হ'য়ে গেল।

একদিন মাণ্‌কে ভূত মাণিকের মাকে ব'ললে, 'এত হাঁটাহাঁটি ক'রে কত আর এ-গাঁ সে-গাঁ করবি ? তার চেয়ে এক কাজ করি। বিরাট এক জমিদারের মেয়েকে আমি ধ'রবো। তুই তাকে ছাড়াতে যেয়ে দশ হাজার টাকা চাইবি। দশ হাজার টাকা পেলে তোরও বেশ কিছুদিন কোথাও যেতে হবে না আর আমিও নিশ্চিন্তে থাকবো।'

তাই হ'ল। এক জমিদার-কন্যাকে মাণ্‌কে ভূত যেয়ে ধ'রলে। ডাক প'ড়ল মাণিকের মায়ের। মাণিকের মা বাড়ি থেকে বার হবার সময় সঙ্গে একটা কুপো নিয়ে গেল। কুপোটা বরাবর লুকিয়েই রাখলে সে।

জমিদার-কন্যার পাশে ব'সে মাণিকের মা কিছুক্ষণ বিজবিজ ক'রলে। তারপর ঝাঁটা হাতে নিয়ে ব'ললে,

'যাবি তো যা
নইলে ময়লা ঝাঁটা খা।'

অমনি মাণ্‌কে ভূত জমিদারের কন্যাকে ছেড়ে একটা তেঁতুলগাছের ডাল ভেঙে

দিয়ে চ'লে গেল। সবাই তা দেখে অবাক হ'ল। জমিদার তার কথামতো মাণিকের মাকে দশ হাজার টাকা দিলে।

টাকা নিয়ে মাণিকের মা বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। পথে মাণ্‌কে ভূতের সঙ্গে দেখা। মাণিকের মা ভূতকে ব'ললে, 'বাবা মাণ্‌কে, তোরও বড় কষ্ট হ'চ্ছে রে! কতবার গাছের ডাল ভাঙতে হ'চ্ছে। যাওয়া-আসাও তোকে কম ক'রতে হ'চ্ছে না। আজ আমি অনেক পাওনা পেয়েছি। তোকে আজ আর হেঁটে যেতে দোব না। তোকে কোলে ক'রে নিয়ে যাবো।'

ভূত ব'ললে, 'তুই আবার আমোকে কেমন ক'রে কোলে নিবি?'

মাণিকের মা কুপোটা বার ক'রে ব'ললে, 'এই কুপোটার মধ্যে তুই ঢোক্‌। কোলে ক'রে আমি বাড়ি পর্যন্ত তোকে নিয়ে যাবো।'

মাণ্‌কে ভূত তাই ক'রলে। সরু হ'য়ে কুপোটার ভেতর ঢুকে গেল। মাণিকের মা কুপোর মুখটা ভাল ক'রে এঁটে সেটা কোলে নিয়ে চ'লল। যেতে যেতে মাঠের মধ্যে মাটিতে গর্ত ক'রে কুপোটা পুঁতে দিয়ে মাটি চাপা দিলে। তারপর বাড়ি চ'লে গেল।

মাণ্‌কে ভূত মাটির তলায় কুপোর মধ্যে ছট্‌ফট্‌ ক'রতে ক'রতে ম'রে গেল। আর কোনোদিন সেই তালগাছটায় আসতে পারলে না।

দুষ্টু জিন

কোনো এক নদীর ধারে একটি ছোট্ট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে অধিকাংশ মুসলমান পরিবারের বাস। এক পরিবারে একটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। তার বিয়ে-থা হয়নি। কারণ, মেয়েটিকে জিনে পেয়েছিল। তার আচার-ব্যবহারে সেকথা জানতে কারো বাকি ছিল না।

বিয়ে-থা দিতে না পারলেও মেয়েটির বাড়ির সবাই অনেক সময় তার দ্বারা খুব উপকার পেত। জিনকে মেয়েটি যখন যা' ব'লত সে তাই ক'রত।

যদি কোনোদিন বাড়িতে হঠাৎ কুটুম এসে প'ড়ত মেয়ের মা মেয়ের কাছে যেয়ে ব'লত, 'তাইতো মা, ঘরে কিছুই নেই, অথচ কুটুম এসে প'ড়ল। এখন কী দিয়েই কুটুমের যত্ন-খাতির করি!' কথাটা শুনতে পেলেই জিন কিছু সময়ের জন্যে মেয়েটিকে ছেড়ে দিত। তারপর একরাশ ফল, মিষ্টি, তরি-তরকারি এনে ঝপাঝপ্ ক'রে ফেলে দিত মেয়েটির সামনে।

এইভাবে কিছুদিন বেশ চ'লল। সবাই দেখল, মেয়েটি দিনে দিনে খুব রোগা হ'য়ে যাচ্ছে। এজন্য বাপ-মায়েরও খুব চিন্তা হল। কিন্তু ভাবনা-চিন্তা ক'রেও তো লাভ নেই। কারণ জিনটা যা বদ্‌মায়েশ তা'তে অন্য কিছু করতে গেলে সে হয়ত বাড়ির সকলের খুব ক্ষতি ক'রে দেবে। তাই সবাই মিলে ঠিক ক'রে নিয়েছে, ঐ একটা মেয়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছে যাক্ জিনকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

এইভাবে আরও কিছুদিন কাটল। মেয়েটির অনেক বয়স হ'য়ে এল। জিন এবার তাকে ছেড়ে দিয়ে পাশের বাড়ির অন্য একটি রূপসি মেয়েকে ধ'রলে। এই মেয়েটির বয়স কম। তার বাপ-মা, ভাই-বোন সবাই আছে। মেয়েটির ধরণ-ধারণ দেখে কারো বুঝতে বাকি রইল না, মেয়েটিকে জিনে পেয়েছে।

এখানেও জিনটা বাড়ির লোকেদের দরকার মতো জিনিস এনে দেয়। কিন্তু মেয়ের বাপ-মা তাদের মেয়ের ঐ অবস্থা দেখে খুব মনমরা হ'য়ে থাকে। ভাবে, জিন ছাড়িয়ে মেয়েকে যেভাবেই হোক সারিয়ে তুলতে হবে।

অনেক চিন্তা ক'রে মেয়ের বাবা একদিন রোজা আনতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর যাবার পর ঐ জিনটা মানুষের রূপ ধ'রে তা'কে আটকালে। মেয়ের বাবাকে জিন ব'ললে,' এই, কোথায় যাচ্ছিস? এখুনি ফিরে চ' বলছি!'

মেয়ের বাবা একটু থতমত খেয়ে গেল। দেখলে, তার সামনে ধপধপে ফরসা সুন্দর চেহারার বিরাট এক লম্বা লোক। মেয়ের বাবা ব'ললে, 'কে তুমি বাবা?' জিন ব'ললে, 'আমি যেই হই। তুই যদি রোজা ডাকতে যাবি তবে এখানেই তোর ঘাড়টা মটাক্ ক'রে মটকে তোকে শেষ ক'রে দোব।'

মেয়ের বাবা কিছুটা বুঝতে পেরে হাতজোড় ক'রে ব'ললে, 'ফিরে যাচ্ছি বাবা।'

তারপর বাড়ি এসে সে চিন্তা ক'রতে লাগল। ভাবনা-চিন্তা ক'রতে ক'রতে সেও শুকিয়ে গেল।

চুপচাপ কিছুদিন থাকবার পর ভেতরে ভেতরে মেয়ের বাবা আবার রোজা আনবার চেষ্টা ক'রতে লাগল।

এদিকে জিবনটাও তা' বুঝতে পারলে। একদিন মেয়ের বাবা যেই পুকুরে চান ক'রতে নেমেছে অমনি জিবনটা হাওয়ায় ভর ক'রে শোঁ শোঁ ক'রে এসে দিলে তার ঘাড়টা ম'টকে। তিন ছেলে পুকুরে নেমে বাবার মরা দেহটা জল থেকে তুলে আনলে। সবাই মনে ক'রলে, হয়ত কোনোকিছু ভেতরে অসুখ-বিসুখ ছিল, তাই চান ক'রতে যেয়ে জলে ডুবে ম'ল।

বাবা মারা যাবার পর তিনছেলে তাদের বোনকে সারাবার চেষ্টা ক'রতে লাগল। বুঝতে পেরে জিবন একদিন তাদের ব'ললে, 'যদি তোরা আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করিস তবে আমি তোদের মাকেও মেরে ফেলবো। আর তোদিকেও রেহাই দোব না।'

তিন ভাই ভয়ে আর কিছু ক'রলে না।

একবার আশ্বিন মাসে খুব বড় ঝড় হ'য়ে গেল। দেশের বহু গাছ-পালা ঘর-বাড়ি ভেঙ্গে প'ড়ে গেল। অনেক ঘরের চালের খড় উড়ে গেল। যে ঘরটিতে জিবনটা ঐ মেয়েটিকে আশ্রয় ক'রে থাকত সে ঘরটির কিন্তু কিছুই হ'ল-না। জিবনটা ঐ ঘরে আরামে থাকে আর মাঝে মাঝে পাশের বাড়িতে একটি গাছে হাওয়া খেতে যায়।

যে বাড়িতে জিবনটা হাওয়া খেতে যায় সে বাড়িতেও ছিল তিন ভাই। দু' ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল আর একজনের তখনও হয়নি। তাই একটা নতুন ঘর করবার জন্যে ঐ গাছটা কুড়ুল দিয়ে কাটতে মনস্থ ক'রলে। একদিন কাটতেও গেল। কিন্তু ঐ জিবন আড়াল থেকে বিকট এক শব্দ ক'রে ব'ললে, 'যদি গাছটা তোরা কাটিস তবে তোদের সবাইকে শেষ ক'রে দোব।' ভয়ে তিনভাই গাছটাকে আর কাটলে না।

এইভাবে গ্রামের আরও লোক ঐ জিবনের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য ক'রতে লাগল।

একবার মুসলমানদের একটা পরব ছিল। পরবের দিন সন্ধ্যের সময় সব বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া চ'লছে। জিবনটা ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়িতে এসে ঢুকে প'ড়ল। সে-বাড়িতে থাকে দু'ভাই। বড় ভাইয়ের জোয়ান বয়স। তার বিয়ে-থা হ'য়েছে। ছোটভাই নাবালক। দু'ভাই একসঙ্গে খেতে বসেছিল। বড় ভাইয়ের আগে খাওয়া হয়ে গেল। সে হাত-মুখ ধুয়ে দাওয়ার একপাশে ব'সে আরাম ক'রে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছিল। আর ছোটভাই তখনও ব'সে ব'সে খাচ্ছে। কালো কুকুরের রূপ ধ'রে সেই জিবনটা ঐ সময়ে উঠোনের একপাশে থাবা দিয়ে ব'সে আছে। ছোট ভাই খাচ্ছে আর হাড়ের টুকরাগুলো ছুড়ে ছুড়ে কালো কুকুরটার দিকে ফেলছে। কুকুরের বেশ ধরে জিবনটা হাড় কড়মড়্ ক'রে চিবিয়ে খাচ্ছে।

দুষ্টু জিনেরা সাধারণতঃ শ্মশানের পোড়া কয়লা এবং মরা জন্তুর হাড়গোড় খেতে খুব ভালবাসে। জিনটা তাই ছেলেটির এঁটো হাড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে।

মিশমিশে কালো কুকুরটাকে দেখে ছেলেটির কেমন যেন ভয় হ'ল। সে খাওয়া ফেলে একটা মোটা খেঁটে নিয়ে এসে এক ঘা দিলে কুকুরটাকে। লাঠির ঘা খেয়ে জিন রেগে ছেলেটাকে মেয়ে ক'রে দিলে। তারপর দাওয়ায় উঠে ছেলেটির পাতের বাকি খাবার খেতে লাগল।

বড়ভাই দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল। এদিকে পিদিমটা টিমটিম করে জ্বলছিল। সেই আলোতে বড়ভাই হঠাৎ লক্ষ্য ক'রলে, ছোটভাইয়ের পাতের খাবার একটা বড় কালো কুকুরে খাচ্ছে আর তারই একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা চোদ্দ-পনের বছরের মেয়ে। বড়ভাই ভাবতে লাগল, তাদের বাড়িতে তো ওরকম কোনো মেয়ে নেই! তাছাড়া ছোট ভাই-ই বা গেল কোথায়!

কুকুরটাকে ভালভাবে লক্ষ্য ক'রতেই সে বুঝে নিলে, ওটা কুকুর নয়, অন্যকিছু। আর সে-ই তার ছোটভাইকে ছেলে থেকে মেয়ে ক'রে দিয়েছে।

এই ভেবে বড়ভাই কুকুরটাকে ধরবার চেষ্টা ক'রতেই কুকুররূপী জিন দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ছুটে পালাল। কুকুরও ছুটছে, তার পেছনে পেছনে বড়ভাইও ছুটছে। অনেক ছুটোছুটি ক'রেও কুকুরটাকে বড়ভাই ধ'রতে আর পারেনা। তবুও সে কুকুরের পেছু ছাড়লে না। সে ঠিক লক্ষ্য রেখেছে কুকুরটাকে।

বহু মাঠ-ঘাট পেরিয়ে কুকুর একটা জঙ্গলে যেয়ে ঢুকল। বড়ভাইও হাজির হল সেখানে। সেই জঙ্গলের মধ্যে ছিল একটা সুড়ঙ্গ পথ। সেই সুরঙ্গের ভেতর দিয়ে ছুটে চ'লল কুকুর আর পেছনে বড়ভাই। সুড়ঙ্গ শেষ হতেই প'ড়ল এক বিরাট ময়দান। সেই ময়দান শেষ হ'তেই আর একটা সুড়ঙ্গ পথ। সেই পথ ধ'রে কুকুরের পেছু পেছু বড়ভাইও যেয়ে হাজির হ'ল এক রাজবাড়ির দরজায়। রাজবাড়ির ভেতর কুকুরটা ঢুকে প'ড়তেই বড়ভাই দেখতে পেলে, কুকুর মানুষের রূপ ধ'রলে। সে আরও দেখলে, রাজবাড়ির ভেতরে বিরাট সভায় বাদশা বিচারে ব'সেছে। বড় ভাইয়ের বুঝতে বাকি রইল না যে, এটা জিনের দেশ। আর ঐ কালো কুকুরটা একটা জিন। সে-ই তুক্ ক'রে তার ছোটভাইকে মেয়েছেলে ক'রে দিয়ে এসেছে।

ঐ জিনটা রাজসভার একপাশে যেয়ে দক্ষিণ মুখে ব'সল। আর বড়ভাই দূরে সিঁড়ির পাশটায় ব'সে ব'সে সব লক্ষ্য ক'রতে লাগল।

বিচার শেষ করে জিনের বাদশা সিঁড়ির দিকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলে, একজন মানুষ তার রাজবাড়িতে ঢুকেছে।

আসন ছেড়ে একপা একপা ক'রে সিঁড়ির কাছে এসে বাদশা গর্জন ক'রে উঠল, 'কে, তুই? এখানে কেন এসেছিস? আর কেমন করেই বা এসেছিস?'

বড়ভাই হাতজোড় ক'রে ব'ললে, 'হুজুর, আমি ইচ্ছে ক'রে আসিনি। আমার

ছোটভাইকে মেয়েছেলে করে দিয়ে ঐ জিনটা এখানে চ'লে এসেছে।' এই বলে আঙুল বাড়িয়ে সভার শেষের দিকে ব'সে থাকা সেই জিনটাকে দেখিয়ে দিলে। জিনের বাদশা জিনটার দিকে তাকাতেই সে ছুটে এসে বাদশার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ল। ব'ললে, 'হুজুর, আমি খুব অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আমাকে মাফ্ করুন।'

জিনের বাদশা ধমক দিয়ে ব'ললে, 'কতদিন তুই সেখানে ছিলি? বল্, কী ক'রেছিস?'

জিন ব'ললে, 'অনেকদিন হুজুর। আমি অন্যায়ও করেছি অনেক।'

তারপর জিনেদের বাদশা সব শুনলে। বড়ভাইকে বাদশা ব'ললে, 'তুমি মানুষ। এখানে তোমার থাকা চ'লবে না। তোমাকে তোমার নিজের দেশে ফিরে যেতেই হবে।'

বড়ভাই ব'ললে, 'হুজুর, আমি দেশেই ফিরে যাবো। কিন্তু আমার ছোটভাইয়ের কী হবে?'

জিনেদের বাদশা ব'ললে, 'তারজন্যে তুমি কিছু ভেবো না। সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি।' এই ব'লে তার হাতে একটা তাবিজ দিলে। তারপর আবার ব'ললে, 'এই তাবিজটা তোমার ছোট ভাইয়ের হাতে পরিয়ে দেবে। তাহ'লেই সে আবার ছেলে হয়ে যাবে।'

এবার বাদশা সেই জিনটাকে ব'ললে, 'তুই যে অপরাধ ক'রেছিস তার শাস্তি হিসেবে তোকে আমি হত্যা করবার ব্যবস্থা ক'রছি।'

একথা শুনে জিনটা বাদশার পা দু'টো ধ'রে লুটোপুটি ক'রে কেঁদে কেঁদে ব'লতে লাগল, 'হুজুর, এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করুন। এমন কাজ আর কখনো ক'রবো না।'

জিনেদের বাদশা একটু নরম হ'ল। ব'ললে, 'আচ্ছা, এত যখন কান্নাকাটি ক'রছিস তখন এবারের মতো তোকে ক্ষমা করনু। তবে তুই আবার সেই কালো কুকুরের বেশ ধ'রে ঐ মানুষটিকে ওর দেশে যাবার রাস্তা ধরিয়ে দিয়ে আস্‌গে।'

আদেশ পেয়ে জিনটা কুকুরের রূপ ধ'রে বড়ভাইকে ময়দান, সুড়ঙ্গ, জঙ্গল পার ক'রে দিয়ে আবার জিনের দেশ ফিরে গেল।

বড়ভাই দেশে ফিরে ছোটভাইয়ের হাতে তাবিজটা পরিয়ে দিতেই সে আবার মেয়েছেলে থেকে বেটাছেলে হ'য়ে গেল। সবাই খুব খুশি হ'ল। সেই জিনটাও আর কোনোদিন এদেশে এল না।

বোষ্টমীর ছেলে ও রাক্ষসীর ছেলে

কোনো গাঁয়ে এক বোষ্টম ও এক বোষ্টমী বাস করত। তাদের একটি মাত্র ছেলে। ছেলের বয়স কম। নাম তার অশথডাল।

বোষ্টম বোষ্টমী অশথডালকে নিয়ে একটা কুঁড়েঘরে বাস ক'রত। লোকের দুয়ারে দুয়ারে বোষ্টম ভিক্ষে ক'রে আনত। আর তাই দিয়েই কোনো রকমে তাদের দিন চ'লে যেত।

ভিক্ষে ক'রতে ক'রতে বোষ্টম মাঝে-মধ্যে বহুদূরের গাঁয়ে চ'লে যেত।

একদিন বোষ্টম এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে যেতে যেতে বনের ধারে প্রকাণ্ড এক বাড়ি দেখতে পেলে। পা পা ক'রে বাড়ির দরজায় যেয়ে উঁকি মেরে দেখলে, ভেতরে বড় বড় ধানের গোলা। বোষ্টম বুঝলে, এটা বেশ বড়লোকের বাড়ি। কিন্তু লোক-জনের তেমন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও সে ডাক দিলে, 'মা, কিছু ভিক্ষে দাও।'

মানুষের গলার শব্দ শুনে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক রাক্ষসী। বোষ্টমকে দেখে ব'ললে, 'বোষ্টম ঠাকুর, দুয়ারে দাঁড়িয়ে কেন গো! বাড়ির ভেতরে এস। জলটল খাও। বিশ্রাম কর। তারপর ভিক্ষে নিয়ে বাড়ি যাবে।'

বোষ্টম ব'ললে, 'এক ঘর ঘুরলে তো আমার চ'লবে না। পাঁচ ঘরে না গেলে আমার হবে কেন?'

রাক্ষসী ব'ললে, 'আজ তোমায় অন্য কোথাও যেতে হবে না। এখান থেকেই বাড়ি যাবে। তোমাকে আমি অনেক কিছু দোব।'

রাক্ষসী বোষ্টমকে বেশ আদর-যত্ন ক'রে জলটল খেতে দিয়ে একটা ঘরে বিশ্রাম ক'রতে দিলে। বোষ্টম বিশ্রাম ক'রতে ক'রতে লক্ষ্য ক'রলে, বাড়ির মধ্যে বিশেষ লোকজন নেই বটে, কিন্তু রান্নাঘরে প্রচুর জিনিসপত্র। উননের ওপর বিরাট এক বোকনো বসান। তাতে রান্না হ'চ্ছে। খাওয়া-দাওয়ারও বড় রকমের আয়োজন। দুপুরে খাবার সময় একটা বিরাট থালায় নানা রকম ভাল ভাল তরি-তরকারি সাজিয়ে দিয়ে একটা পাড়ালীতে এক পাড়ালী খিচুরী দেওয়া হ'য়েছে। খাবার দেখে বোষ্টমের চক্ষু চড়কগাছ। সে রাক্ষসীকে ব'ললে, 'আমি জেতে বোষ্টম। এত খাবার আমি কখানো খাইনি। আজও খেতে পারবো না।'

রাক্ষসী ব'ললে, 'যা' পারবে খাও। বাকি প'ড়ে থাকবে।'

বোষ্টম তাই ক'রলে।

খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রতে লাগল। তার মনের মধ্যে কেবলই চিন্তা হ'তে লাগল,

কে এই মেয়েটি ? কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেসা ক'রতে পারছে না। এর মধ্যে রাক্ষসী বার কতক উঁকি মেরে দেখে গেল, বোষ্টম কী ক'রছে।

এক সময় রাক্ষসী তার কাছে এসে ব'ললে, 'তোমার বাড়িতে আর কে কে আছে ?'

বোষ্টম ব'ললে, 'আমার ঘরে বৌ আছে আর একটি ছেলে আছে।'

রাক্ষসী ব'ললে, 'কী নাম তোমার ছেলের ?'

সে ব'ললে, 'আমার ছেলের নাম অশথডাল।'

রাক্ষসী বললে, 'বেশ বেশ, আমারও একটি ছেলে আছে। তার নাম মুসুরডাল। তা এক কাজ কর তুমি। তোমার ছেলে বৌকে এখানে আনগে। আমার এই বিরাট বাড়ি তো ফাঁকাই প'ড়ে আছে। তোমরা এখানে থাকবে। তোমাকে আর ভিক্ষে ক'রতে হবে না।'

একথা শুনে বোষ্টমের একটু লোভ হ'ল। সে ব'ললে, 'বেশ, তাই হবে। কবে তাদের এখানে আনবো ?'

রাক্ষসী ব'ললে, 'কালই তুমি তাদের এখানে নিয়ে আসবে। আমি ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে রাখছি।'

তারপর রাক্ষসী বোষ্টমকে অনেক কিছু দিলে। বোষ্টম সেগুলো ঝোলায় ভ'রে নিয়ে বাড়ি চ'লে গেল।

রাক্ষসী মনে মনে ভাবলে, বোষ্টম আর বোষ্টমের বৌ ছেলে তিনটেকেই বেশ মজা ক'রে খাওয়া হবে।

বোষ্টম বাড়ি এসে পেঁছতেই বোষ্টমী ঝোলাটায় উঁকি মেরে দেখে অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'এসব ভাল ভাল জিনিস কোথায় পেলে গা ?'

বোষ্টম সব কথা বোষ্টমীকে ব'ললে। বিরাট বাড়িতে যেতে বোষ্টমীও রাজি হ'ল।

পরেরদিন ভোর ভোর উঠে বোষ্টম তার বৌ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরিয়ে প'ড়ল।

সেই বিরাট বাড়ির দরজায় এসে হাজির হ'তেই বোষ্টমীর লক্ষ্য পড়ল, দুয়ারের বাইরে অনেক পয়সা ছড়ান আছে। বোষ্টমী সেগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে আঁচলে রাখতে লাগল। তাই দেখে বোষ্টম হেসে ব'ললে, 'কী সামান্য পয়সা কুড়োচ্ছো ? ভেতরে যেয়ে দেখবে চল। ওসব সামান্য পয়সার আর দরকার নেই।'

বোষ্টমী অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'তাই নাকি ! বেশ, তাই চল।'

তারা তিনজনে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই রাক্ষসী মানুষের গন্ধ পেয়ে তাদের কাছে ছুটে এল। সঙ্গে তার ছেলে মুসুরডালও এসে পাশে দাঁড়াল। খুব আদর-যত্ন ক'রে রাক্ষসী তাদের একটা আলাদা ঘরে থাকতে দিলে। বোষ্টম, বোষ্টমী আর তাদের ছেলে অশথডাল বেশ আরামে রাক্ষসীর বাড়িতে থাকতে লাগল। ভালমন্দ খেয়ে

খেয়ে তাদের চেহারাও বেশ ভাল হ'য়ে গেল। রাক্ষসীও মনে মনে ভাবতে লাগল, এবার মজা ক'রে ওদের তিনজনকে বেশ খাওয়া যাবে।

এদিকে রাক্ষসীর ছেলে মুসুরডালের সঙ্গে বোষ্টমের ছেলে অশথডালের খুব ভাব হ'ল। দু'জনে একসঙ্গে পাঠশালায় পড়তে যায়, খেলাধুলোও করে একসঙ্গে।

কিছুদিন থাকার পরে বোষ্টমীর কেমন কেমন মনে হ'তে লাগল। একদিন পাঠশালায় খাবার জন্যে ছেলের হাতে দুধের পাত্র দিয়ে ব'ললে, 'বাবা অশথডাল, পাঠশালায় খাবার খেতে যেয়ে যেদিন দেখবি দু'ধের রঙ্ লাল সেদিন বুঝবি, আমরা ভালই আছি। আর যেদিন দেখবি দুধ নীল হ'য়ে গেছে সেদিন বুঝবি, তোর বাপ মা আর নেই। যে কেউ তাদের সাবাড়ে দিয়েছে।' একথা শোনবার পর প্রতিদিন পাঠশালায় খেতে যেয়ে অশথডাল দুধের রঙ্ লক্ষ্য করে। প্রতিদিনই দুধের রঙ্ লাল থাকে। সে খায়।

একদিন লক্ষ্য ক'রলে, দুধের রঙ নীল হ'য়ে গেছে। চম্‌কে গেল। তারপর কাঁদতে লাগল।

তার কান্না দেখে মুসুরডাল কাছে এসে ব'ললে, 'অশথডাল, তুই কাঁদছিস কেন রে? তোর কী হ'য়েছে?'

কাঁদতে কাঁদতে অশথডাল ব'ললে, 'মুসুরডাল, আমার সর্বনাশ হ'য়ে গেছেরে!'

মুসুরডাল ব'ললে, 'কী হ'য়েছে তোর?'

অশথডাল ব'ললে, 'আমার বাপ-মা আর বেঁচে নেই রে! তাদিকে যে হোক মেরে ফেলেছে অথবা খেয়ে ফেলেছে।'

মুসুরডাল ব'ললে, 'সে কি রে!'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মুসুরডাল অশথডালকে ব'ললে, 'তুই কাঁদিস না ভাই। যে তোর বাপ-মাকে মেরে ফেলেছে আমি তাকে ছাড়বো না।' এই ব'লে মুসুরডাল বাজার থেকে একটা বড় ছোরা কিনে নিলে। তারপর অশথডালকে ব'ললে, 'চ', বাড়ি যেয়ে আগে দেখিগে, কী ব্যাপার।'

এই বলে ছোরা হাতে মুসুরডাল বাড়ির দিকে ছুটল। সঙ্গে অশথডালও গেল।

দু'জনে ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখলে, ঘরের উঠোন রক্তে লাল হ'য়ে গেছে। রাক্ষসী বোষ্টম-বোষ্টমীকে ব'সে ব'সে খাচ্ছে। অশথডাল ও ছেলেকে ঘরে ঢুকতে দেখে রাক্ষসীটা বোষ্টম-বোষ্টমীর হাড় চিবোতে চিবোতে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়ল। তারপর বিরাট লম্বা জিব বার ক'রে অশথডালকে খাবার জন্যে এগিয়ে এল। মুসুরডাল তার মাকে বাধা দিলে। অশথডালকে পেছনে রেখে সে তার মাকে বললে, 'খবরদার ওকে খাবি না। আগে আমাকে খা। তারপর ওকে খেতে পাবি।'

রাক্ষসী তার ছেলেকে ব'ললে, 'সরে যা সামনে থেকে। খাবার জন্যেই তো ওদিকে এতদিন আমি পুষেছি। ওর মা বাবাকে খেয়েছি। এবার ওকেও খাবো।'

ছেলে মাকে বাধা দিয়ে ব'ললে, 'না, কখ্খনো ওকে খেতে আমি দোব না।'

রাক্ষসী ব'লল, 'সরে যা বাবা। বাধা দিস না।'

ছেলে ব'ললে, 'বাধা আমি দোবই। আর তুই ওর বাপ-মাকে কেন খেলি বল।'

রাক্ষসী রেগে বললে, 'বেশ ক'রেছি।'

এভাবে মা-বেটায় কথা কটাকাটি হ'তে হ'তে রাক্ষসী তার ছেলেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অশথডালকে ধ'রে ফেললে! মুসুরডাল সঙ্গে সঙ্গে উঠেই তার মায়ের পিঠে মারলে ঝেড়ে এক ছোরা।

ছোরা খেয়ে রাক্ষসী ছটফট ক'রতে ক'রতে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ল।

অশথডাল তার মা-বাবাকে হারালে। আর মুসুরডালও তার মাকে মেরে ফেললে। দু'জনেরই দিন কতক বেশ মন-মেজাজ খারাপ হ'য়ে রইল।

তারপর অশথডাল ও মুসুরডাল দু' বন্ধু একই সঙ্গে বাস ক'রতে লাগল।

রাক্ষস ও দুই বন্ধু

রাজার ছেলে দুবরাজডাল আর রাক্ষসীর ছেলে রাক্ষসডাল। দু'জনের খুব বন্ধুত্ব। দিন যায়, মাস যায়। দু'বন্ধু বড় হ'য়ে ওঠে। একদিন দু'বন্ধু বিদেশে বেড়াতে গেল। অনেক মাঠ, জঙ্গল পেরিয়ে এক গাঁয়ে যেয়ে হাজির হ'ল। তারা গাঁ ঘুরে দেখলে, একঘর বামুন ছাড়া আর সে গাঁয়ের কেউই বেঁচে নেই। বামুন-বাড়ীতে উঁকি মেরে দেখলে, বামুন মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে। একবন্ধু বামুনকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'এত ভাবছেন কেন? কী হ'য়েছে?'

বামুন ব'ললে 'এই গাঁয়ের পাশে যে জঙ্গল আছে সেখানে একটা রাক্ষস থাকে। সে রাতে চরাটে যায়, দিনে জঙ্গলে ফিরে আসে। প্রত্যেক দিন তাকে একটি ক'রে লোক দিতে হবে। সে-লোক ভোর ভোর রাক্ষসের বাসায় যাবে। আর রাক্ষস তাকে তিনটি প্রশ্ন করবে। উত্তর দিতে না পারলে তাকে খাবে। এমনি ক'রে অনেক লোককে রাক্ষস খেয়ে ফেলছে। আজ আমার ছেলের পালা। তাই ভাবছি।' রাক্ষসডাল ব'ললে, 'তাই নাকি! ভাববেন না। আমরা আজ দু'বন্ধুতে যাবো। আপনার ছেলেকে যেতে হবে না।'

খুব ভোর ভোর দুবরাজডাল আর রাক্ষসডাল দু'জনে রাক্ষসের বাসায় যেয়ে হাজির হ'ল। দুবরাজডাল বন্ধুকে ব'ললে, 'কী হবে?' রাক্ষসডাল দুবরাজডালকে শিখিয়ে দিলে, 'যখন রাক্ষস এসে ব'লবে কে জাগে? ব'লবে—রাক্ষসডাল জাগে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে রাক্ষস হাঁকাড় দিতে দিতে এল। এসেই জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কে জাগে?'

দুবরাজডাল ব'ললে, 'রাক্ষসডাল জাগে।' রাক্ষসটা ভয় খেয়ে গেল। তিন বারের বার জিজ্ঞেসা করতেই ভুল ক'রে ব'লে ফেললে, 'দুবরাজডাল জাগে।' আর যায় কোথা! রাক্ষস ছুটে যেয়ে দুবরাজডালের চুলের মুটি ধরলে। তখনই রাক্ষসডাল নিজের মূর্তি ধ'রে রাক্ষসকে এই মার তো সেই-মার। রাক্ষস মার খেয়ে চীৎকার করতে লাগল। খুব মার দিতেই রাক্ষস দেশ ছেড়ে পালাল। বামুনের ছেলে বেঁচে গেল। বামুন দু'বন্ধুকে আশীর্বাদ ক'রলে। তারপর দু'বন্ধু দেশে ফিরে গেল।

কিছুমিছু

কোনো গ্রামে একজন গেরস্থ ছিল। মাঝামাঝি তার অবস্থা। তার একটি বেটা-ছেলে হ'য়েছিল। ছেলের বয়স মাত্র দু'বছর।

পাশের বাড়িতে দূরে গ্রাম থেকে একজন মেয়ে-কুটুম এসেছিল। মেয়েটি তার এক বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে একদিন ঐ গেরস্থর বাড়িতে বেড়াতে এল। কুটুম-মেয়েটির সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রতে ক'রতে গেরস্থ ব'ললে, 'তোমার মেয়ের সঙ্গে যদি আমার ছেলের বিয়ে দাও তবে খুবই ভাল হয়।'

মেয়েটি হেসে ব'ললে, 'যখন বড় হবে তখন নাহয় তাই হবে।' গেরস্থ ব'ললে, 'যখন বড় হবে, নয়। যদি রাজি হও তবে পুতুল খেলার মতো বিয়েটা দিয়ে দিই।'

মেয়েটি আবার হেসে ব'ললে, 'বেশ, আমার মেয়ের বাবা দু'দিন বাদে আমাকে নিতে আসবে। তখন তার মতামত জেনে তোমায় ব'লবো।'

মেয়েটি তখনকার মতো তার আত্মীয়ের বাড়ি চ'লে গেল। দিন দু'এক বাদে ঐ মেয়েটির স্বামী তার বৌকে নিতে এল। স্বামীকে একসময়ে সে পাশের বাড়ির গেরস্থর ছেলের ও তার বাবার ইচ্ছের কথা ব'ললে। সব শুনে মেয়েটির স্বামী ব'ললে, 'আমাদের মেয়ে ছোটই বা হ'ল, ওরা যখন সব খরচ-খরচা ক'রে পুতুল খেলার মতো বিয়ে দিতে চাইছে তখন আমাদের আর আপত্তির কী আছে? কথায় বলে, যাচা বর আর কাচা কাপড় ছাড়তে নেই।'

মেয়েটি তার স্বামীকে নিয়ে পাশের বাড়ির ঐ গেরস্থর কাছে গেল। কিছু কথা-বার্তার পর বিয়েটা দেওয়াই সকলে ঠিক ক'রলে। খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ে হ'য়ে গেল। দু'বছরের বর আর এক বছরের কনের বিয়ে দেখতে বিয়েবাড়ি লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেল।

বিয়ের পর দু' বেয়াই-এ কথা হ'ল, ছেলে ও মেয়ে যখন সাবালক হবে তখনই অনুষ্ঠান ক'রে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো হবে। তবে তার আগে প্রথমে ছেলে যেন একবার শ্বশুরবাড়ি ঘুরে আসে। আরও ঠিক হ'ল, এখন কোন রকম কুটুম্বিতে হবে না। কারণ ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই লেখাপড়া শিখবে। তাদের পড়াশোনার যেন ক্ষতি না হয়। এই সব যুক্তি-যাক্তা ক'রে মেয়ে নিয়ে মেয়ের বাপমা নিজেদের বাড়ি চ'লে গেল।

তারপর কয়েক বছর পরে ছেলে যখন একটু বড় হ'ল তখন তাকে পাঠশালায় ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। পাঠশালার পড়া শেষ ক'রে ছেলের আর বেশী পড়াশোনা হ'ল না। তাই ছেলে বাড়িতে টুমুকি-টামুকি কাজ করে আর পাড়ায়, আমতলায়, গাছতলায় ঘুরে-ঘারে বেড়ায়। ছেলের বয়স হ'চ্ছে। ছেলে প্রায় সাবালক হ'য়ে উঠেছে। বাড়ির কোনো কাজ তেমন মন দিয়ে করেও না, দেখেও না। তাই দেখে ছেলের মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছেলের বাবা একদিন ব'ললে, 'এবার একটা মেয়ে দেখে ছেলের বিয়ে না দিলে বোধকরি ছেলের সংসারে মন ব'সবে না।'

ছেলের মা গালে হাত দিয়ে ছেলের বাবার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে, 'আই মা, সেকি কথা গো! তুমি ভুলে গেছ নাকি? ছেলেবেলায় তুমিই তো খোকার বিয়ে দিলে।' ছেলের বাবা হেসে ব'ললে, 'দেখেছ, আমার তো মনেই ছিল না। সত্যিই তো বটে! তাহ'লে কাল-ই বেয়াইকে চিঠি লিখে দিই—মেয়ে যেন তারা পাঠিয়ে দেয়।' ছেলের মা ব'ললে, 'বেশ, সেই ব্যবস্থাই করো।'

চিঠি লিখে দিতেই বেয়াই জবাবে জানালে, একবার যেন জামাইকে ওখানে পাঠানো হয়। পাড়ার লোকে জামাই দেখবে। তারপর অনুষ্ঠান ক'রে জিনিস-পত্রসহ মেয়েকে জামাইয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

চিঠি পেয়ে ছেলের বাবা ছেলেকে কাছে ডেকে ব'ললে, 'বাবা, তোমার শ্বশুর চিঠি দিয়েছে। তোমাকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে।'

ছেলে বাবার কথা শুনে অবাক হ'য়ে বাবাকে ব'ললে, 'কী সব ব'লছ, বাবা? তোমার কি মাথা-টাতা খারাপ হ'য়ে গেছে নাকি?'

ছেলের মা কাছে এসে ছেলেকে ব'ললে, 'না বাবা, তোর বিয়ে আমরা দিয়েছি। তোর বাবা ঠিকই ব'লছে।'

তারপর ছেলে তার বাপ মায়ের কাছ থেকে সব কথা শুনলে। সব ঘটনা জানবার পরে ছেলের মনের মধ্যে কেমন যেন হ'তে লাগল।

বাবা ছেলেকে ব'ললে, 'তাহ'লে কালই তুই তোর শ্বশুরবাড়ি চ'লে যা। অমুক গ্রামের অমুক তোর শ্বশুর। গ্রামের কাছে যেয়ে শুধিয়ে নিলেই লোকে তোর শ্বশুরবাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

নানান সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে ছেলে সে-রাতটা যাহোক ক'রে কাটালে।

পরের দিন সকালে চান-টান ক'রে ভাল জামাকাপড় প'রলে। মনের আনন্দে বিশেষ কিছু খেতে পারলে না। ছেলে বাড়ি থেকে যখন বার হ'তে যাচ্ছে তখন তার বাবা আট আনা পয়সা নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বললে, 'বাবা, শুধুহাতে শ্বশুরবাড়ি যেতে নেই। রাস্তায় যেখানে বাজার হাট পাবি সেখান থেকে কিছুমিছু কিনে নিয়ে তবে শ্বশুরবাড়ি যাবি।'

ছেলে মাথা নেড়ে 'আচ্ছা' ব'লে বাবা মাকে প্রণাম ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ল।

দু'একটা গ্রাম পার হ'য়ে যেতেই রাস্তায় একটা বাজার প'ড়ল। সেদিন আবার হাটবার। হাটে বহু লোক জিনিসপত্র বেচা-কেনা ক'রছে। ছেলের মনে প'ড়ে গেল, আট আনা দিয়ে তার বাবা কিছুমিছু কিনে নিয়ে যেতে ব'লেছে।

সে প্রথমে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গেল। দোকানদারকে ব'ললে, 'আমাকে অন্য কিছু দিওনা। এই আট আনার কিছুমিছু দাও।'

দোকানদার ব'ললে, 'আমার দোকানে কিছুমিছু ব'লে কোন খাবার নেই। তুমি অন্য কোথাও দেখ।'

ঘুরতে ঘুরতে ছেলেটি এক মুদির দোকানে গেল। দোকানদারকে সেই একই কথা বললে, 'আমাকে আট আনার কিছুমিছু দাও।'

মুদি ছেলেটির মুখের পানে চেয়ে একটু হেসে ব'ললে, 'কিছুমিছু আবার কী? তুমি অন্য কোথাও দেখ। এখানে ওসব পাওয়া যায় না।'

ছেলেটি সেখান থেকে আবার অন্য দোকানে গেল। সেখানেও ঐ এক অবস্থা। শেষে হাটে যারা মাটিতে ব'সে ঝাঁকায় জিনিসপত্র বিক্রী করছিল তাদের জিজ্ঞেসা করতে শুরু ক'রলে। লোকে ছেলেটির কথায় বিরক্ত হ'য়ে উঠতে লাগল।

হাটের কিনারায় একজন লোক ব'সে ব'সে ঝাঁকায় ক'রে ওল বিক্রী ক'রছিল। ছেলেটি তার কাছে যেয়ে ব'ললে, 'ও ভাই, আমাকে আট আনার কিছুমিছু দাও না?'

দু'তিনবার এরকম বলাতে ওল বিক্রেতা বিরক্ত হ'য়ে ব'ললে, 'এই গোল গোল যেগুলো আমি বেচছি এগুলোই কিছুমিছু। নাও না কত নেবে?'

ছেলেটি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ব'ললে, 'দাও, দাও ভাই, আমাকে আট আনার দাও।'

ওল বিক্রেতা তার ঝাঁকা থেকে বড় বড় দু'টো ওল তুলে নিয়ে ছেলেটির হাতে দিয়ে ব'ললে, 'নাও। দাও আট আনা।' ওল বিক্রেতাকে আট আনা পয়সা দিয়ে ছেলেটি ওল দু'টো গামছায় বেঁধে পথ চ'লতে লাগল।

কখন কোন সকালে ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। পথ চ'লতে চ'লতে তার খুব খিদে পেয়ে গেছে। সে ভাবছে, দু'টো 'কিছুমিছু' শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেয়ে কী হবে। তার চেয়ে খিদে যখন পেয়েছে তখন একটা খাওয়া যাক। আর যেটা একটু কেমী বড় সেটা নিয়ে গেলেই শ্বশুরবাড়ির লোকে খেয়ে আলা হ'য়ে যাবে।

এরকম ভাবতে ভাবতে পথে একটা পুকুরের পাড়ে গাছতলায় এসে ব'সল। গামছা থেকে একটা ওল নিলে। খিদের চোটে ওলটায় পরপর তিন চারটে কামড় দিয়ে কচমচ ক'রে চিবোতে লাগল। যেই চিবিয়েছে অমনি মুখের ভেতরটা জোর কুটকুট ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে। কিছু ওলের রস পেটেও চ'লে গেছে।

ছেলেটি 'ওগো বাবাগো, ওগো মাগো' ব'লে চীৎকার ক'রছে আর মাথা চালাচালি ক'রছে। তার মুখ দিয়ে লালা ভাঙছে আর সে হ্যাস্ হুস্ শব্দ করছে। সমস্ত মুখে যন্ত্রনা শুরু হ'য়ে গেছে। গলায়, জিবে ছুঁচ ফোটানোর মতো যন্ত্রনা হ'চ্ছে। মুখের ভেতরটা হালহাল ক'রছে। কান, মুখ, চোখ সবই লাল হ'য়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে এত লালা ঝরছে যে, তার ভাল ক'রে কথা বেরোচ্ছে না। বারবার সুরুৎ সুরুৎ শব্দ ক'রে মুখের লালা টানছে আর ব'লছে, 'ওরে বাবারে, আর খাবো না গো, কী ভুল ক'রেছি গো!' এরকম ব'লছে আর পথ চ'লছে। মুখের লালা যেন ঝরণার মতো বেরিয়ে আসছে। বন্ধ আর হ'চ্ছে না। পথে চ'লছে আর নিজের মুখের লালাকে উদ্দেশ ক'রে ব'লছে, 'আর আসিস না। ওরে বাবারে, আর আসিস না।' কিন্তু এত ব'লেও মুখের লালা আসা বন্ধ হ'চ্ছে না। ঐ ভাবে বারবার টেনে টেনে ব'লছে আর পথ চ'লছে।

এক জায়গায় এসে দেখলে, মাঠে রাস্তার ধারেই একটা নালায় জল যাচ্ছে আর সেখানে একজন লোক 'আড়া' পেতেছে। সেই সবে মাত্র দু' একটি পুঁটিমাছ আড়ায় প'ড়তে শুরু ক'রেছে। ছেলেটি আড়ার পাশে ব'সে জলে কুলকুচি ক'রে মুখটা ভালভাবে ধুয়ে ফেললে। কিন্তু তাতেও যন্ত্রনা কম হ'ল না। সে আড়ায় মাছপড়া দেখছে আর মুখের লালাকে উদ্দেশ করে ব'লছে, 'ওরে বাবারে. আর আসিস্ না! ওরে বাবারে, আর আসিস্ না।'

যে লোকটি আড়া পেতেছিল সে পাশেই কোথায় ছিল। সেখান থেকেই ছেলেটিকে লক্ষ্য ক'রলে। দেখলে, ছেলেটি তার আড়ার মাছ দেখছে আর মুখে শব্দ ক'রছে, 'আর আসিস না?'

আড়ার মালিক একটা লাঠি নিয়ে ছুটে এসে ছেলেটিকে আচ্ছা ক'রে ঘা কতক ধরিয়ে ব'ললে, 'ব্যাটা, আমার আড়ায় একটার বেশী দুটো মাছ আসবে না? বল্, 'একটা আসিস তো দু'টো আয়।'

মার খেয়ে জামাইছেলে মুখের লালা টানে আর ব'লে চলে, 'একটা আসিস তো দু'টো আয়। একটা আসিস তো দু'টো আয়।' ওলের কুটকুটুনি বিন্দুমাত্র কমেনি। এবার তার মুখটা আরও লাল হ'য়ে ফুলতে শুরু ক'রেছে। পথ চ'লছে আর ঐ একই কথা মুখে ব'লছে। কিছুদূর যাবার পর দেখছে পথের ধারে শ্মশানে জন কয়েক লোক একটা মড়া নিয়ে হাজির হ'ল।

জামাইছেলে যন্ত্রনায় মুখে হ্যাস্ হুস্ শব্দ করে আর ঐ একই কথা বলে।

শ্মশানের লোকে ছেলেটির কথা শুনে ভাবলে, আচ্ছা বদমায়েশ ছোকরা তো! অমঙ্গুলে কথা বলছে! তারা চৌদোলের বাঁশ নিয়ে তিনচারজন ছেলেটির কাছে ছুটে এসে ব'ললে, 'এই ব্যাটা, হ্যাস্ হুস্ ক'রছিস্ আর কী বলছিস্?'

জামাইছেলে তেমনি মুখে লালা টেনে টেনে ব'লতে লাগল, 'একটা আসিস তো দু'টো আয়। ওরে বাবারে, একটা আসিস তো দু'টো আয়।'

শ্মশানের লোকজন জামাইছেলেকে চৌদোলের বাঁশে ক'রে আচ্ছা রকম ঘা কতক ধরিয়ে দিয়ে ব'ললে, 'ব্যাটা, খবরদার অমন অমঙ্গুলে কথা মুখে আনবি না। তাহ'লে মেরে শেষ ক'রে দোব।'

ছেলেটি লালা টেনে কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে, 'তবে কী বলবো?'

একজন বললে, 'ব'লবি, এমন দিন যেন কারো না হয়।'

ছেলেটি মারধোর খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চ'লে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবলে, কী কুক্ষণে ঘর থেকে বার হ'য়েছিনু। মার খেয়ে খেয়ে গা-গতরে ব্যথা হ'য়ে গেল! মুখে তেমনি ক'রে ব'লে ব'লে চ'লতে লাগল, 'ওরে বাবারে, এমন দিন যেন কারো না হয়।'

পথে একদল বরযাত্রী বর নিয়ে বিয়ে দিতে যাচ্ছিল। বরযাত্রীদের একজনের কানে ছেলের কথাটা গেল। সে পাশের বরযাত্রীকে বললে, 'দেখ, দেখ, ছোকরাটা হ্যাস্ হুস্ ক'রছে আর কী যেন ব'লতে ব'লতে যাচ্ছে।'

বরযাত্রীদের কয়েকজন ছেলেটির কথা শুনতে পেয়ে তার কাছে ছুটে এল। তারপর তার গলায় গামছা দিয়ে আচ্ছা ক'রে মার দিতে দিতে ব'ললে, 'ব্যাটা, এমন দিন যেন কারো না হয়? এমন শুভ দিনে তুই এরকম অশুভ কথা ব'লছিস্? বল্, এমন কথা আর ব'লবি না।' মারখেয়ে ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে, 'ওরে বাবারে, আর ব'লবো না গো! তবে আমি কী ব'লবো?'

একজন ব'ললে, 'বল্ ব্যাটা, এমন দিন যেন সবার হয়।' জামাইছেলে কাঁদতে কাঁদতে 'আঃ উঃ হ্যাস্ হুস্' শব্দ ক'রছে আর ব'লতে ব'লতে যাচ্ছে—'ওরে বাবারে, এমন দিন যেন সবার হয়।'

এবার ছেলেটি আর এক গ্রামে যেয়ে ঢুকল। সেই সময় ঐ গ্রামের তিন চারটি বাড়িতে আগুন লেগেছে। বহু লোকজন ছুটোছুটি ক'রে আগুন নেভানোর চেষ্টা ক'রছে। ছেলেটি সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। কিন্তু মুখে এক নাগাড়ে ব'লে চ'লেছে, 'এমন দিন যেন সবার হয়। ওরে বাবারে, এমন দিন যেন সবার হয়।'

কথাটা কয়েকজন গ্রামবাসীর কানে গেল। তারা ছেলেটিকে ঘা কতক ধরিয়ে দিয়ে ব'ললে, 'এই ব্যাটা, তোর খুব আমোদ হয়েছে নয়? তাই তুই এমন কথা ব'লছিস্?'

মার খেয়েও ছেলেটি যেমন ব'লছিল তেমনিই ব'লতে লাগল, 'এমন দিন যেন সবার হয়।'

গ্রামবাসীরা ভীষণ রেগে যেয়ে ছেলেটিকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে সোজা সেই জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিলে। আগুন থেকে সে আর বেরিয়ে আসতে পারলে না। বেচারার শ্বশুরবাড়িও আর যাওয়া হ'য়ে উঠল না।

তিনতা

এক বামুনের অনেক জমিজমা ছিল। আর ছিল একশো একটা গরু। গাই গরু দুধ দিত আর বলদ দিয়ে চাষের কাজ হ'ত। গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরী হ'ত আর সার হিসেবে জমিতে দিয়ে বামুন বেশ ভালই ফসল পেত।

গরুগুলো মাঠে চরাবার জন্যে বামুন একটা রাখাল রেখেছিল। রাখালের চেহারা হাড়িগিল্লের মতো। তার পেটটা ছিল পিলে-পেটা, কথাগুলো একটু খোঁণা খোঁণা আর জড়ানো।

প্রতিদিন রাখাল ঐ একশো একটা গরুকে বনে চরাতে নিয়ে যেত। সারাদিন গরুগুলো বনে চ'রে বেড়াত। আর রাখাল বনের ধারে গাছতলায় গামছা পেতে শুয়ে ঘুমোত। সন্ধ্যের একটু আগে গরুগুলো বন থেকে বার ক'রে তাড়িয়ে বামুনের বাড়িতে নিয়ে আসত।

ঐ বনের পাশে ছিল একটা ছোট্ট নদী। নদীতে বর্ষা ছাড়া অন্য সময় জল প্রায় থাকতই না। নদীর অপর পারে ছিল আরো ঘন বন। সেখানে বাঘ ও বাঘিনী বাস ক'রত। বাঘ বাঘিনী নদী পার হ'য়ে কখনো কখনো এপারে শিকারের সন্ধানে আসত।

একদিন রাখাল গরুগুলো মাঠ থেকে বামুনের গোয়ালে এনে খুঁটোয় বাঁধতে যেয়ে দেখলে, তিনটে খুঁটো ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। রাখাল বুঝতে পারলে, তিনটে গরু নেই। সে বামুনকে কিচ্ছুটি ব'ললে না। রাতে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার সময় বামুন রাখালকে ব'ললে, 'হ্যাঁরে ব্যাটা, সব গরু গোয়ালে এসেছে তো?' কোনো কথা ব'লতে গেলে রাখালের ভালভাবে জিব্ উল্টোয় না। সে বামুনকে ব'ললে, 'তিন্তা নেই।' বামুন বুঝলে, রাখাল ব'ললে 'চিন্তা নেই'। সে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিছানায় যেয়ে আরাম ক'রে শুয়ে প'ড়ল।

পরের দিন রাখাল আবার গরু ছেড়ে নিয়ে গেল এবং সন্ধ্যের সময় গোয়ালে বাঁধতে যেয়ে খুঁটোর সংখ্যা দেখে বুঝলে, আজও তিনটে গরু নেই। সেদিনও বামুন

রাতে রাখালকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কিরে ব্যাটা, আজ গরু-বাছুর সব ঠিক আছে তো ?'

রাখাল আগের দিনের মতো আজও ব'ললে, 'তিন্‌তা নেই।'

বামুন ভাবলে, চিন্তা নেই।

এমনি ক'রে এক মাস কেটে গেল। কী মনে হ'ল। বামুন একদিন সন্ধ্যের কিছু পরে গোয়ালে ঢুকে দেখলে, আর মাত্র এগারটি গরু আছে। বাকী নম্বুইটি গরু নেই। বামুন তো অবাক। রাগে গর্‌গর্‌ ক'রতে ক'রতে রাখালের কাছে যেয়ে রাখালকে ব'ললে, 'ব্যাটা, গোয়ালে গরু কই রে ?'

রাখাল ভয়ে বামুনের মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। বামুন রাখালের গালে সজোরে এক চড় কষিয়ে দিয়ে ব'ললে, 'তোকে যে আমি প্রতিদিন রাতে শোবার আগে জিজ্ঞেসা করি, গরু সব ঠিক আছে তো ? তুই কী জবাব দিস্‌ ?'

রাখাল বামুনের চড় খেয়ে ব'ললে, 'তিন্‌তা নেই।'

বামুন রাখালের সঙ্গে আর কোন কথা না ব'লে অনেক লোকজন নিয়ে বনের মধ্যে খুঁজতে গেল, যদি তার গরুগুলো পাওয়া যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ঘোপ্‌লা জায়গায় যেয়ে সবাই দেখলে, একরাশ গরুর হাড় গাদা হ'য়ে প'ড়ে আছে। বামুন বুঝলে, এসব তারই নম্বুইটা গরুর হাড়। ওপার থেকে বাঘ এসে দিনের পর দিন তার গরুগুলো হত্যা ক'রেছে, মাংস খেয়েছে আর হাড়গুলো জমা ক'রে রেখেছে। বামুন হায় হায় ক'রতে ক'রতে বাড়ি ফিরে এল।

গানের দাম

এক গাঁয়ে একটি লোক ছিল। সে কাজ ক'রত না। ব'সে ব'সে খেত ব'লে তার বৌ তার সঙ্গে ঝগড়া ক'রত। একদিন তার বৌ তাকে ব'ললে, 'শুধু ব'সে খাচ্চো, গান ক'রেও তো খেতে পার।'

লোকটি ব'ললে, 'কিছু টাকা দাও দিকিন্‌, বিদেশে যেয়ে গান শিখে আসি।' তারপর বৌ লোকটিকে চারটি টাকা দিলে। লোকটি তাই নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল। কিছুদূর যাবার পরে পথে দেখলে, একটা ইঁদুর গর্ত থেকে ঝুর্‌ ঝুর্‌ ক'রে মাটি ফেলছে। লোকটি ভাবলে, এই তো একটা গান মিলে গেছে, 'ঝুর্‌ ঝুর্‌ মাটি পড়ে, তাই রে নারে না।'

কিছুদূর যাবার পরে লোকটি দেখলে, একটা শেয়াল যেতে যেতে পেছন পানে চাইছে। লোকটি ভাবলে, আর একটা গান শেখা হ'ল, 'যায় যায় পেছন পানে চায়, তাই রে নারে না।'

আরো কিছুদূর যাবার পরে এক ছুতোরের সঙ্গে দেখা হ'তেই তার একটা গান মনে এসে গেল। সে ছুতোরকে শুনিয়ে গাইলে, 'কোথা যাচ্ছো ছুতোর ভায়া, তাই রে নারে না।' ছুতোর ভাবলে, ব্যাটার ঠিক টাকা আছে, তাই আমোদে গান ধ'রেচে। লোকটা বাড়ি ফিরে গেল। সেই রাতেই ছুতোর একটা সিঁদকাঠি নিয়ে লোকটার বাড়িতে চুরি ক'রতে গেল।

রাতে বৌ ঐ লোকটিকে ব'ললে, 'কই কী গান শিখে এলে গাও।'

লোকটি গান ধ'রলে, 'ঝুর্ ঝুর্ মাটি পড়ে তাই রে নারে না।'

ওদিকে ছুতোর সেই সময় লোকটির বাড়ির দেওয়ালে সিঁদকাঠি লাগিয়ে দেওয়াল কাটছিল। দেওয়ালের মাটি প'ড়ছিল ঝুর্ ঝুর ক'রে। সে ভাবলে, লোকটা হয়ত বুঝতে পেরে গেছে। এই ভেবে দেওয়াল কাটা বন্ধ ক'রে সেখান থেকে সরে গেল। ছুতোর যাচ্ছে আর ফিরে চাইচে। এমন সময় লোকটি ঘরের মধ্যে বৌকে গান শোনাচ্চে, 'যায় যায় ফিরে ফিরে চায়, তাই রে নারে না।' ছুতোর ভাবলে, লোকটি বুঝতে পেরে গেছে। সে চ'লে যাচ্চে। এমন সময় লোকটি তার বৌকে গান শোনালে, 'কোথা যাচ্চো ছুতোর ভায়া, তাই রে নারে না।' এই শুনেই ছুতোর ছুটে বাড়ি পালালো। বাড়িতে যেয়ে ছুতোর ভাবলে, লোকটি তো সব জেনে ফেলেচে! সকাল হতেই ছুতোর পাঁচশো টাকা নিয়ে লোকটির বাড়িতে এসে কান্না-কাটি ক'রে ব'ললে, 'এই পাঁচশো টাকা নাও, কাউকে কোনো কথা ব'লো না, আর আমি এমন কাজ ক'রবো না।' ছুতোর টাকা দিয়ে বাড়ি যেতেই লোকটি পাঁচশো টাকা বৌয়ের হাতে দিয়ে ব'ললে, 'আমার গান শুনে ছুতোর আমাকে এই টাকা দিলে। এ-গুলো রেখে দাও।' বৌ টাকা পেয়ে খুব খুশি হ'ল। তাদের মধ্যে ঝগড়াও মিটে গেল।

চোরের সঙ্গী

একদিন রাতে সাত জন চোর চুরি ক'রতে যেয়ে সোনা-দানা, থালা-ঘটী সব চুরি ক'রলে। চোরেদের সর্দার বাকি চোরকে ব'ললে, 'মালকড়ি সব মাদুরে জড়িয়ে মড়া-বওয়া ক'রে নিয়ে চ'। তাহ'লে দিনের বেলায় কেউ বুঝতে পারবে না।' মালকড়ি সব মাদুরে বেঁধে কাঁধে ক'রে চোরেরা কাঁদতে কাঁদতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় পথে একটি চতুর লোক মাদুরের ফাঁক দিয়ে মালকড়ি দেখতে পেয়ে ব'লতে সুরু ক'রলে,

'বুঝেছি তোদের ভাব
চক্ষু দু'টো ঢাক।'

চোরের সর্দার কথা বুঝতে পেরে ব'ললে,

'তুইও সংগে সংগে থাক
তোকেও দোব ভাগ।'

লোকটিও তাদের সঙ্গী হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে ব'লে চ'লল,

'এই তো পেনু ভাগ
কেমনে ম'ল বাপ।'

এই ব'লে সেও চোরেদের সঙ্গে মালকড়ির ভাগ নিতে চ'লে গেল।

দুই চোর

দু' গাঁয়ে দু'জন চোর ছিল। একদিন একজন চোর একটা কেঁড়েতে বেশির ভাগ পাঁক দিয়ে ওপরে খানিকটা ঘি ঢেলে কেঁড়েটা মাথায় করে ঘি বেচতে বেরিয়ে প'ড়ল। আর একজন চোর গুড়ের টিন মাথায় নিয়ে গুড় বেচতে বেরুল। তারও টিনের মধ্যে বেশি বালি, শুধু ওপরটায় কিছু গুড়। দু'জনে ঘুরতে ঘুরতে পথের মধ্যিখানে দেখা। গাছতলায় ব'সে কথাবার্তা ব'লতে ব'লতে একজন চোর যেই একটু ঘুমিয়ে প'ড়েছে অমনি অন্যজন তার মাল পাল্টে অপরের মাল নিয়ে সটকান্ দিলে। কেঁড়ে ও টিন পাল্টা-পাল্টি হ'য়ে গেল। যখন বিক্রী কারুরই হ'ল না তখন আবার দেখা। তারা নিজের নিজের জিনিস আবার ফিরিয়ে নিলে। দু'চোরের মধ্যে ভাব হ'য়ে গেল। তারা যুক্তি ক'রে দু'জনেই চাকরী ক'রতে গেল। এক বামুনের বাড়ীতে কাজ পেলে। একজন বামুনের গরু চরায়, অন্যজন ফুলগাছে জল দেয়।

তারা প্রত্যেকদিন পালা ক'রে কাজ করে। একদিন তারা একটা ফুলগাছের গোড়া থেকে এক-হাঁড়ি টাকা পেয়ে গেল। দু'বন্ধু ভাগ ক'রে নিতে যেয়ে একটা টাকা বেশি হ'য়ে গেল। একজন চোর সেটা নিয়ে তার বন্ধুকে ব'ললে, 'এটা আমি নিনু। আমার বাড়িতে যাস। আমি ভাঙানি ক'রে তোকে আট আনা দোব।'

তারপর দু'চোর তাদের নিজের নিজের বাড়ি চ'লে গেল। যে একটা টাকা বেশি নিয়েছে তার বাড়িতে অন্যচোর আট আনা চাইতে গেল। দূর থেকে বন্ধুকে দেখতে পেয়ে ভাবলে, টাকার ভাগ নিতে এসেছে। তাই ফাঁকি দেবার জন্যে মরার মতো প'ড়ে রইল। বন্ধু এসে ডাকাডাকি করলে। সাড়া পেলে না। সব দেখে বন্ধু ক'রলে কি তার পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে শ্মশানে নিয়ে গেল। টাকার ভাগ দিতে হবে ব'লে অন্যচোর সাড়াও দিলে না। মড়ার মতো প'ড়ে রইল। টাকাটা তার ট্যাঁকেই ছিল এবং বেশ জ্ঞানও ছিল। বন্ধুকে নীচে ফেলে রেখে অন্যজন গাছে উঠে ব'সে রইল। রাত হ'ল। একদল ডাকাত রাতে ঐ শ্মশানে এসে কালীপুজো ক'রলে। যে চোর নীচে মড়ার মতো প'ড়ে ছিল সে খিদের জ্বালায় ডাকাতদের কলা খেয়ে ফেলতেই ডাকাতরা তাকে মারতে লাগল। সে বাবাগো, মাগো ব'লে চেঁচাতে শুরু করলে। গাছের ওপর থেকে অন্যচোর ব'ললে, 'তোমরা ভাই ওকে মেরো না!' সব দেখেশুনে ডাকাতরা অবাক হ'য়ে কারণ জিজ্ঞেসা করলে। দু'চোর সব তখন ব'ললে। সব শুনে একজন ডাকাত চোরের ট্যাক্ থেকে টাকাটা নিয়ে খাঁড়া দিয়ে দু'খানা ক'রে দু'চোরের হাতে দিয়ে দিলে। তারা বাড়ি চ'লে গেল।

চার গাঁজাখোর

এক দেশে চার বন্ধু ছিল। তারা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এককাছে বসত আর গাঁজা-টাজা খেত। একদিন এখন বন্ধুদের মধ্যে একজন ব'ললে, 'দৈনিক তো গাঁজা খাওয়া হয়। একদিন মাংস খাওয়া যাক্।' অন্য তিন বন্ধু সায় দিলে। মাংস-ভাত খাবার জন্যে এক এক বন্ধুর ওপর এক এক রকমের মালপত্র আনবার ভার প'ড়ল। কেউ আনবে চাল, কেউ আনবে হাঁড়ি, কেউ মাংস আবার কেউ জ্বালন। দিন ঠিক করে একদিন সন্ধ্যায় সব যোগাড়-যান্তি হ'ল। প্রথমে চার বন্ধু একটান ক'রে গাঁজা খেয়ে নিলে। তারপর উনুন তৈরী হ'ল। ভাত রাঁধতে সুরুও ক'রে দিলে। একজন ব'ললে, 'তেল আন গে যা রে!' এ-কথায় একজন একটা বোতল নিয়ে গাঁয়ের দোকানে তেল আনতে গেল। তেল আনতে যাবার আগে অন্য তিন বন্ধু তাকে ব'লে দিলে, 'ফাউ নিবি, ফাউ নিতে যেন ভুলিস না।' বন্ধুটি ব'লে

গেল, 'সে আমি নিশ্চয়ই নোব।'

বোতল নিয়ে দোকানে যেয়ে দোকানীকে পয়সা দিয়ে ব'ললে, 'তেল দাও'। সে যা' পয়সা নিয়ে গিয়েছিল সেই পয়সার তেল দিতেই বোতল ভর্তি হ'য়ে গেল। এবার ফাউ নিতে হবে। লোকটি দোকানীকে ব'ললে, 'ফাউ দাও'। দোকানী ব'ললে, 'তুমি আর ফাউ কোথায় নেবে ভাই? বোতল তো তোমার ভর্তি হ'য়ে গেছে।'

আগেকার দিনের বোতল। পেছন দিকটা ডোবা। লোকটা তেলভর্তি বোতল উল্টে বোতলের পেছন দিকটা দোকানীর সামনে ধ'রে ব'ললে, 'ফাউ আমায় নিতেই হবে। এই পিছন দিকেই আমাকে তেলের ফাউ দাও।'

দোকানী ব'ললে, 'ওদিকে তেল যে তোমার সব প'ড়ে গেল, ভাই!'

লোকটি ব'ললে, 'তা' পড়ুক। আমার ফাউ-তো থাকছে।'

লোকটি ফাউ তেল নিয়ে বন্ধুদের কাছে ফিরে আসতেই বন্ধুরা ব'ললে, 'তেল কই রে? সব ফেলে দিয়ে এসেছিস্!'

বন্ধু ব'ললে, 'ফাউ তো এনেছি। ওতেই হবে।'

অন্য বন্ধুরা ব'ললে, 'যা হবার হ'য়েছে, এখন মাংস রান্না কর্।'

ভাত রান্না হ'য়ে গেছে। ভাতের ফ্যান্ গড়াতে দিয়েছে। এবার মাংস রান্না হবে। সব ঠিক-ঠাক ক'রে দেখছে কি—নুন নেই। নুন না হ'লে তো রান্না হবে না। একজন আর একজনকে ব'ললে, 'তুই নুন আনগে যা। দোকানী আবার শুয়ে প'ড়বে। যা যা তাড়াতাড়ি চ'লে যা।' সে ব'ললে, 'এত রাতে আমি নুন আনতে যেতে পারবো না।' আর একজনকে বলা হ'ল। সেও ব'ললে, 'আমি যেতে পারবো না।' এমনি ক'রে কেউ আর নুন আনতে যেতে চাইলে না। শেষে চার বন্ধু গোল হ'য়ে ব'সে রইল। একবন্ধু ব'ললে, 'যে আমাদের মধ্যে প্রথম কথা ব'লবে তাকেই নুন আনতে যেতে হবে।' সবাই ব'ললে, 'বেশ তাই হোক।' এই বলে চারবন্ধু চুপচাপ ব'সে রইল। কেউ কথা বলে না। কিছুক্ষণ পরে একটা কুকুর শুঁকে শুঁকে মাংসের গন্ধ পেয়ে তাদের কাছে এল। এসে মাংস খেতে আরম্ভ করলে। একজন মুখে কথা না বলে কুকুরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে 'উঁ', উঁ', উঁ' শব্দ করলে। অন্য বন্ধুরা দেখলে, কিন্তু কিছু ব'ললে না। কারণ কথা ব'ললেই নুন আনতে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে আর একটা কুকুর এল। সেও মাংস খেতে লাগল। আর এক বন্ধু কুকুরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে 'উঁ', উঁ' শব্দ ক'রতে লাগল। কিন্তু কেউই কথা ব'ললে না। কুকুর দু'টো ইচ্ছে মতো ভাত খেলে, মাংস খেলে। শেষে দুটো কুকুরে মারামারি লেগে গেল। ভাতের হাঁড়ি উল্টে গেল। ভাত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মাংস, ভাত সবই ছত্তিখান হ'য়ে গেল। তবুও চার বন্ধুর কেউই কথা ব'ললে না। রাত ভোর হ'য়ে এল। এমন সময় ঐ গাঁয়ের চারজন পাহারাদার

ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলে, মাঠের মাঝখানে চারজন লোক চুপচাপ ব'সে আছে। তাদের সামনে ভাত, মাংস সব ছড়িয়ে আছে। দেখে তারা অবাক হ'য়ে গেল। একজন পাহারাদার ব'ললে, 'এ-ভাই, তোমরা চুপচাপ ব'সে আছ কেন? তোমাদের এসব ব্যাপার কী?' কেউ কথা বলে না। কারণ, কথা ব'ললেই নুন আনতে যেতে হবে।

পাহারাদারদের মধ্যে একজন ব'ললে, 'এরা কি বোবা, না কালা। কথা বলে না কেন?'

পাহারাদারদের প্রত্যেকের হাতে একটি ক'রে খেটে লাঠি ছিল। একজন পাহারাদার হাতের কুদুমো খেটে দিয়ে একজনকে ঘুঁজলে দিয়ে ব'ললে, 'এই শালা, কথা বলছিস্ না কেন?'

লাঠির ঠেলা খেয়ে লোকটা উল্টে প'ড়ে গেল কিন্তু কথা ব'ললে না। পাহারাদার কুদুমোটা নিয়ে পাশের লোকটিকে দিলে দু' গুঁতো। সে দু' গুঁতো খেয়ে উল্টে প'ড়ে গেল। প'ড়েই কেঁদে কেঁদে ব'লতে লাগল, 'অ্যাঁ, শালা, আমার বেলায় দুবার গুঁতো, ওর বেলায় একবার!' পাহারাদার চারজন ঐ কথা শুনে অবাক। তারা ব'ললে, 'তোমাদের ব্যাপার কী? ভাত মাংস সব ছড়িয়ে আছে, তোমরাও চুপচাপ ব'সে আছ।' তখন চার বন্ধু সব ব'ললে। একবন্ধু ব'ললে, 'যে দু' গুঁতো খেয়েছে সে-ই কথা ব'লেছে। তাকেই নুন আনতে যেতে হবে।'

পাহারাদার চারজন ব'ললে, 'আর নুন এনেই কী হবে? ওদিকে তো সব ফর্সা। মাংস তো সব কুকুরে শেষ করে দিয়েছে!'

এক বন্ধু ব'ললে, 'তাও তো বটে! আর নুন এনেই কী হবে। চ' ঘর চ'। আজকের সবই নষ্ট হ'য়ে গেল।' এই বলে চার বন্ধু বাড়ি চ'লে গেল। পাহারাদাররাও সেখান থেকে চ'লে গেল।

এই আর সেই

এক ছিল বামুন আর তার বৌ। তারা বড়ই গরীব। লোকের মুখে বামুন বহুকাল থেকে শুনে আসছে, লুচি খেতে নাকি খুবই ভাল। কিন্তু বামুনের ভাগ্যে লুচি আর কোনোদিন জোটেনি। লুচি দেখতেই বা কেমন তাও বামুনের জানা নেই। বামুনের লুচি খেতে বড় ইচ্ছে হ'ল। একদিন সে তার মনের ইচ্ছেটা বামনীকে জানালে। বামনী স্বামীকে ব'ললে, 'অমুক রাজবাড়িতে যাও। সেখানে রাজা প্রতিদিন বামুনদের লুচি খাওয়ায়।'

বৌয়ের কথা শুনে পরের দিন সকালেই বামুন সেই রাজবাড়িতে যাবার জন্যে বেরিয়ে প'ড়ল। যেতে যেতে পথে একটা খাল পার হ'তে হ'ল। খালে জল ছিল। সেই ঘোলাজলে বামুনের আধখানা কাপড় ভিজে গেল। ভিজে কাপড়েই বামুন রাজবাড়িতে যেয়ে হাজির হ'ল।

রাজা বামুনের দিকে চেয়ে ব'ললে, 'কী প্রয়োজনে এখানে এসেছ?' বামুন একটু থতমত খেয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে রাজাকে ব'ললে, 'আমার তেমন কিছু প্রয়োজন নেই। আমি গরীব বামুন। জীবনে কখনো আমি লুচি খাইনি। মহারাজ, যদি এ গরীব বামুনকে লুচি সেবা করান তবে বড়ই খুশি হই।'

বামুনের কথা রাজা মন দিয়ে শুনলে। তারপর তার ভিজে কাপড়ের দিকে চেয়ে ব'ললে, 'তোমার কাপড় ভিজল কোথায়?'

বামুন ব'ললে, 'পথে একটা খালে একটু জল ছিল। সেই জল পার হ'তে যেয়েই কাপড়ের আধখানা ভিজে গেল।'

বামুনের কথা শুনে রাজা রেগে হাত নেড়ে ব'ললে, 'এই আর সেই?' তারপর বকাঝকা ক'রে রাজবাড়ি থেকে বামুনকে একরকম তাড়িয়েই দিলে। বামুনের লুচি খাওয়া আর হ'ল না।

মনের দুঃখে বামুন বাড়ি ফিরে এল। বামনী হেসে হেসে স্বামীকে ব'ললে, 'কিগো, লুচি খেয়ে কেমন আরাম পেলে?'

কোনো কথা না ব'লে বামুন চুপ ক'রে রইল। বামনীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে স্বামীর আরও কাছে এসে ব'ললে, 'কী হ'ল তোমার? লুচি তাহ'লে খাওয়া হয়নি নাকি?'

বামুন ব'ললে, 'না। রাজা আমাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে।'

তারপর তার বৌকে সব কথা জানিয়ে শেষে ব'ললে, 'এই আর সেই—এ কথার মানে কী?'

বামনী ব'ললে, 'বুঝতে পারলে না? রাজার ওকথা বলার মানে হ'চ্ছে, সামান্য খালের জল পার হ'তে তোমার কাপড় ভিজে গেল, অথচ এমন একদিন ছিল যখন বামুনে সমুদ্র শুষে নিয়েছে।'

বামুন ব'ললে, 'এখন তাহ'লে কী হবে? লুচি খাওয়া আর আমার হ'ল না বোধহয়!'

বামনী সেদিন আর কোনোকথা না ব'লে পরের দিন সকালে বামুনের এক হাতে এক ঘটী জল আর অন্য হাতে পাথরের ছোট্ট একটা নুড়ি দিয়ে ব'ললে, 'তুমি আজ আবার রাজার কাছে এ দু'টো নিয়ে যাও। রাজার হাতে এই নুড়িটা দেবে আর তুমি জলভর্তি ঘটীটা রাজার সামনে ধ'রে রাজাকে ব'লবে, মহারাজ, নুড়িটা ঘটীর জলে ফেলে দিন। দেখবেন, নুড়িটা জলে ভাসবে। রাজা যখন নুড়ি ঘটীর জলে

ফেলবে তখনই নুড়িটা ডুবে যাবে। অমনি তুমি ব'লে উঠবে—সেই আর এই ? তারপর যা ঘটবার তাই ঘটবে।'

বামুন সেই জলভর্তি ঘটী আর নুড়ি নিয়ে রাজবাড়িতে হাজির হ'ল। রাজা দেখেই তাকে চিনতে পেরেছে। বামুনকে ব'ললে, 'তুমি ফের আজ এসেছ ? তোমার মতো বামুনকে আমি লুচি খাওয়াবো না। যাও এখান থেকে।'

বামুন ব'ললে, 'লুচি খেতে আজ আমি আসিনি, মহারাজ। আমার হাতের এই নুড়িটা আপনি ধরুন। তারপর ওটা আমার এই ঘটীর জলে ফেলে দিন। দেখবেন, ওটা জলের ওপর ভেসে ভেসে বেড়াবে।'

রাজা অবাক হ'য়ে ব'ললে 'তাই নাকি ! তবে দাও ওটা। দেখি কেমন ভাসে।' এই ব'লে বামুনের হাত থেকে নুড়িটা নিয়ে ঘটীর জলে ফেলে দিলে। নুড়ি টুপ্ ক'রে জলে ডুবে গেল। রাজা ব'ললে, 'কই হে, তুমি যে ব'ললে, নুড়ি জলে ভাসবে। এযে ডুবে তলিয়ে গেল।'

বামুন হাত নেড়ে ব'ললে, 'সেই আর এই ?' বামুনের কথা শুনে রাজা চমকে গেল। মনে মনে বুঝলে, বামুনের ভিজে কাপড় দেখে বামুনকে অপমান করা হ'য়েছিল। তাই বামুন তাকে আজ উপযুক্ত শিক্ষা দিলে। এককালে ক্ষত্রিয় রাজা সমুদ্রের ওপর শিলা ভাসিয়ে সেতু তৈরী ক'রত। আর আজকের ক্ষত্রিয় রাজা এক টুকরো নুড়িও জলে ভাসাতে পারে না।

রাজা খুব লজ্জিত হ'ল। তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডাকলে। মন্ত্রী কাছে আসতেই রাজা তাকে ব'ললে, 'মন্ত্রী, এই গরীব বামুনকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও। বেশ যত্ন-টত্ন ক'রে একে লুচি খেতে দেবে। যেন কোনো ত্রুটি না হয়। খরচ সবই রাজকোষ থেকে দেওয়া হবে।'

রাজার আদেশে মন্ত্রী বামুনকে খুব আদর ক'রে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। তারপর বৌকে ব'ললে, 'ওগো শুনছ, রাজকোষ থেকে সব খরচা দেবে রাজা। তুমি এক কাজ করো। এই গরীব বামুনকে খুব যত্ন ক'রে ভালরকম তরি-তরকারী ও মিষ্টি-টিষ্টি দিয়ে পেট ভ'রে লুচি খাওয়াবে। বামুন জীবনে কখনো লুচি খায়নি। দেখো, যেন কোনো ত্রুটি না হয়। তাহ'লে রাজা আবার রেগে যাবে।'

মন্ত্রীর বৌ ভীষণ জাঁহাবেজে আর খাণ্ডারী। ছেলেপিলেও হয়নি।

বামুনের দিকে একবার চেয়ে মন্ত্রীর বৌ মুখ বেঁচকে স্বামীকে ব'ললে, 'তা তোমার রাজা যখন ব'লেছে তখন বামুনাটাকে লুচি তো খাওয়াতেই হবে।' মনে মনে ভাবলে, খাওয়াচ্ছি লুচি ! শুটকে বামুনার আবার লুচি খাবার সাধ জেগেছে !

মন্ত্রী বাজার থেকে ঘি, ময়দা, মিষ্টি ইত্যাদি বৌকে এনে দিলে। বামুনকে

ব'ললে, 'বাবাঠাকুরের লুচির ব্যবস্থা ক'রে গেনু। বৌ তোমায় যত্ন ক'রে খাওয়াবে। আমি এখন রাজবাড়িতে চলনু।'

মন্ত্রী রাজবাড়িতে চ'লে গেল। আর মন্ত্রীর বৌ লুচি তৈরী ক'রতে লেগে গেল।

কাজ ক'রতে ক'রতে মন্ত্রীর বৌ লক্ষ্য ক'রলে, বামুনটা মাঝে মাঝে রান্না ঘরের দিকে উঁকি মারছে।

উনোনে ঘিয়ের কড়াই চড়িয়ে একখানা লুচি বেলে গরম ঘিয়ে ফেলে দিতেই 'ছ্যাঁ' ক'রে শব্দ হ'ল। তাই শুনে বামুন চমকে 'বাবারে' ক'রে উঠল।

মন্ত্রীর বৌ হেঁকে বামুনকে ব'ললে, 'তুমি চোখ বুজে থাকবে। চাইলে লুচি তৈরী হবে না। সব লুচি নষ্ট হ'য়ে যাবে।'

বামুন চুপচাপ চোখ বুজে ব'সে রইল।

লুচি তৈরী শেষ ক'রে মন্ত্রীর বৌ যখন হাতের ময়দা জলে ধুচ্ছে তখন বামুন তারদিকে চেয়ে ব'লে উঠল, 'কই মা লক্ষ্মী, লুচি তৈরী হ'ল?'

মন্ত্রীর বৌ রেগেমেগে চেঁচিয়ে ব'ললে, 'এদিকে চাইলে কেন? লুচি ধুয়ে জল হ'য়ে গেল। এবার খাবে কী?'

হাত ধোয়া জলের দিকে তাকিয়ে বামুন ব'ললে, 'লুচি বুঝি গ'লে গেল! বেশ, ঐ গ'লে যাওয়া লুচিই আমি খাবো। তবু লুচি আমাকে খেতেই হবে।' এই ব'লে মন্ত্রীর বৌয়ের হাতধোয়া জল পেট ভ'রে খেয়ে বামুন মন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প'ড়ল।

মাঠে মন্ত্রীর রাখাল গরু চরাচ্ছিল। সে বামুনকে মন্ত্রীর বাড়িতে লুচি খাবার জন্যে ব'সে থাকতে দেখেছিল। বামুনকে মাঠের রাস্তা ধরে যেতে দেখে সে ব'ললে, 'কি বাবাঠাকুর, লুচি খাওয়া হ'ল?'

বামুন সব ব'ললে তাকে। রাখাল শুনে ব'ললে, 'মন্ত্রীর বৌ তোমায় ঠকিয়েছে। তুমি এক কাজ করো। এই মাঠে ব'সে বেলাটা কাটিয়ে দাও। সন্ধ্যে হ'লেই আবার মন্ত্রীর বাড়িতে যাবে। অন্ধকারে দরজায় টোকা দিয়ে গণার মতো নাকি সুরে ব'লবে, ক'ই গো, দ'রজা খোল'। তারপর অন্ধকারেই মন্ত্রীর বৌ তোমাকে ঘরে বসতে দেবে। ঘরে বসিয়ে লুচিমিষ্টি যা দেবে সব খাবে। দেখো, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি যেন একথা ব'ল না।'

রাখালের কথামতো সন্ধ্যের একটু পরেই বামুন অন্ধকারে মন্ত্রীর বাড়ির দরজায় যেয়ে কপাটে তিনটে টোকা দিলে। তারপর গণার মতো নাকি সুরে ব'ললে, 'ক'ই গো, দ'রজা খোল'।'

দরজা খুলে গেল। অন্ধকারেই মন্ত্রীর বৌ তাকে একটা ঘরে বসিয়ে বেশ আদর-যত্ন ক'রে লুচি খেতে দিলে। বামুনও খেলে। খেয়ে আঁচিয়ে অন্ধকারে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে রইল। মন্ত্রীর বৌ তাকে দেখতে পেলে না।

এমন সময় মন্ত্রীর বৌয়ের গণা উপপতি দরজায় এসে তিনটে টোকা দিয়ে ব'ললে,

'ক'ই' গো, দ'রজা খোল'।' মন্ত্রীর বৌ একটু অবাক হ'ল। দরজা খুলে দিলে। ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠল, 'মরণ নেই মিনসের! এই তো খেলে। এখনো তো এঁটো পাত প'ড়ে আছে।'

উপপতি কোনো কথা না ব'লে সোজা যেয়ে সেই এঁটো পাতেই ব'সে প'ড়ল। তারপর ব'ললে, 'আরও দু'চার খানা ফুলকো দেখে লুচি দাও।'

মন্ত্রীর বৌ তাই দিলে।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে বামুন অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে উঠে গেল। তারপর সেখানে চুপচাপ শুয়ে প'ড়ল।

এদিকে মন্ত্রীর বৌয়ের উপপতির আধখাওয়া হ'য়েছে। এমন সময় মন্ত্রী হঠাৎ বাড়িতে এসে ঢুকল। উপপতি পাতের খাবার ফেলে রেখে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেয়ে অন্ধকারেই শুয়ে প'ড়ল। কিন্তু ঘরের ভেতর এতই অন্ধকার যে, বামুন ও মন্ত্রীর বৌয়ের উপপতি দু'জনের কেউই বুঝতে পারেনি—তারা পাশাপাশি শুয়ে আছে।

আধ-খাওয়া পাতের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী তার বৌকে ব'ললে, 'বামুনকে বেশ যত্নটত্ন ক'রে খাইয়েছ তো?' মন্ত্রীর বৌ হাতমুখ খিচিয়ে ব'ললে, 'ঝ্যাঁটা মারো শুটকে বামুনটার মুখে! এত নোংরা? ঐ দেখনা, খেয়েছে আর কেমন পাতের চারিদিকে ছড়িয়েছে।'

মন্ত্রী হেসে ব'ললে, 'ছড়িয়েছে, তা আর কী হবে। ওগুলো পরিষ্কার করিয়ে নিলেই হবে। দাও, আমাকে এবার খেতেটেতে দাও।' রাতে খেয়ে-দেয়ে মন্ত্রী ও মন্ত্রীর বৌ নীচের ঘরে শুয়ে প'ড়ল।

পেট ভ'রে লুচি খাওয়ার জন্যে বামুনের ভীষণ জলতেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে এদিক ওদিক হাতড়ে সে একটা নারকোল পেয়ে গেল। নারকোলের জল খাবে ঠিক ক'রলে। কিন্তু সেটা না ভাঙলে তো আর জল বেরোবে না। ভাঙবার কোথাও কিছু নেই। মেঝেয় হাত বুলিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা তেলাচে গোলমতো বড় জিনিসে হাত প'ড়ল। দু'হাতে নারকোলটা ধ'রে সেই গোলমতো জিনিসের ওপর 'ভুট্' ক'রে জোরে এক ঘা দিতেই নারকোল ভেঙে দু'খানা হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে নাকি সুরে চীৎকার উঠল, 'ওঁরে' বাবারে', গেঁছিঁরেঁ, গেঁছিঁরেঁ!'

সেই তেলাচে গোল জিনিসটি হ'চ্ছে মন্ত্রীর বৌয়ের গণা উপপতির টাক-মাথা।

ওপরের ঘরে দারুণ চেঁচামেচি আরম্ভ হ'য়ে গেল। আর নারকোলের জল ওপর থেকে নীচেয় গদ্ গদ্ ক'রে প'ড়তে লাগল।

মন্ত্রী তার বৌকে ভয়ে ভয়ে ব'ললে, 'কী ব্যাপার!'

মন্ত্রীর বৌ ব'ললে, 'ব্যাপার আবার কী? তোমার পূর্বপুরুষকে তুমি কোনোকালে জলদান ক'রেছিলে? ওঁনারা আজ জল খেতে এসেছে। কী ব্যবস্থা ক'রবে করো। আমি আজ আর এ-ঘরে থাকতে পারবো না।'

মন্ত্রী তাড়াতাড়ি একঘড়া জল নিয়ে ভয়ে ভয়ে একপা একপা ক'রে ওপরের ঘরে যেয়ে অন্ধকারে বসিয়ে দিলে। তারপর গলায় কাপড় দিয়ে ব'ললে, 'বাবারা, আমারই দোষ হ'য়েছে। আমি তোমাদিকে এতদিন জল দিইনি। এই একঘড়া জল বসানো রইল। খেও। আমরা আজ অন্য বাড়িতে যাচ্ছি। তোমরা আজ রাতে আমার বাড়িতে যা খুশি করো।' এই ব'লে মন্ত্রী তার বৌকে নিয়ে অন্যবাড়িতে চ'লে গেল। আর বামুন ও মন্ত্রীর বৌয়ের গণা উপপতি ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে আরাম ক'রে খেলে। তারপর কেউ কারো সঙ্গে কথা না ব'লে নিজের নিজের বাড়ির দিকে চ'লে গেল।

চালাক স্ত্রী ও বোকা স্বামী

কোনো গাঁয়ে এক তাঁতি বাস ক'রত। সে ছিল খুব বেঁটে। কিন্তু তাঁতিবৌয়ের চেহারাটা বেশ লম্বা-চওড়া। তাঁতি আর তাঁতিবৌ দু'জনে সংসার ক'রত বটে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি লেগেই থাকত। সময়ে সময়ে ঝগড়াঝাঁটি ক'রে দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হ'য়ে যেত।

একবার তাঁতি আর তাঁতিবৌ ঝগড়া ক'রে কেউ কারো সঙ্গে কথা ব'লছে না। কিন্তু মুখোমুখি কথা না ব'লে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দু'জনের মধ্যে ছুঁড়ে ছাড়ে কথা হ'চ্ছে। তাঁতিবৌ ভাত রান্না ক'রে ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে শিকেয় তুলে রেখেছে। কথাবার্তা বন্ধ ব'লে স্বামীকে ভাত খেতেও বলছে না। এদিকে তাঁতির খুব খিদে পেয়ে গেছে। সেও বৌকে ভাত বেড়ে দেবার কথা ব'লতে পারছে না। এমন সময় মাঠের ধারে একটা পুকুরে জেলেরা মাছ ধ'রতে যাচ্ছে। তাই দেখে তাঁতিবৌ স্বামীর দিকে পেছন ফিরে ব'ললে,

লোক যাচ্ছে মাছ ধ'রতে
লোক কেন যায় না।'

সেকথা শুনে তাঁতি তার বৌকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললে,

'শিকেয় আছে ভিজে-ভাত
বৌ কেন দেয় না।'

বৌ বললে,

'ঝুড়ীর ওপর ঝুড়ী দিয়ে
বেড়ে কেন খায় না।'

বৌয়ের কথাটা শুনে তাঁতি মনে মনে ভাবলে, যুক্তি বড় মন্দ নয়! ঘরের মধ্যে ঝুড়ী ছিল। দু'তিনটে ঝুড়ী এনে একটার ওপর আর একটা দিয়ে শিকে থেকে ভাতের হাঁড়ি পেড়ে পেট ভ'রে ভিজেভাত খেলে। খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ঠিক ক'রলে, মাঠের পুকুর থেকে মাছ ধ'রে আনতে হবে।

ঘরে ছিল একটা জিবে। সেটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়ল। পুকুরের ধারে যেয়ে দেখলে, পুকুরের জল গেবে গেছে। মাছ ভেসেছে। লোকে মাছ ধ'রেছে অনেক। কেউ কেউ তখনও ধ'রছে। কিন্তু ভিজেভাত খেয়ে তাঁতির খুব আলস্য এসে গেল। ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে এল। পুকুরের পাড়ে একটা বড় অশথগাছ ছিল। তার নীচে জিবেটা পেতে তাঁতি লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ল। ঠাণ্ডা হিলহিলে হাওয়ায় গাছতলায় সে ঘুমিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাঁতির ঘুম ভাঙ্গল। আড়মোড়া দিয়ে উঠে সে দেখলে, যারা পুকুরে মাছ ধরতে নেমেছিল তারা সবাই চ'লে গেছে। জেলেদের একটি মেয়ে তখনও মাছ কুড়োচ্ছে। তাঁতি ভাবলে, যেমন ক'রেই হোক মাছ তাকে বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে। তা নাহ'লে বৌয়ের সঙ্গে গণ্ডগোল আরও বেড়ে যাবে।

একটু ভেবে নিয়ে একপা একপা ক'রে তাঁতি সেই জেলেদের মেয়েটির কাছে যেয়ে ব'ললে, 'ওগো, তোমার কাছে মাছ আছে?'

তাঁতির কথা শুনে মেয়েটি মাছের খালুই হাতে একটু এগিয়ে এল। ব'ললে, 'আছে। কেন কী হবে?'

তাঁতিও একটু কাছে যেয়ে খালুইটায় উঁকি মেরে ব'ললে, 'আমি মাছ কিনবো।'

মেয়েটি খালুইটা তাঁতির মুখের কাছে তুলে ধ'রে ব'ললে, 'আমার খালুইয়ে এক-কুড়ি চারটে কৈ মাছ আছে। যদি তুমি কেনো তবে এই এককুড়ি চারটে কৈ মাছকেই তোমায় নিতে হবে। একটা কম নিলে আমি মাছ বিক্রী ক'রবো না।'

তাঁতি ব'ললে, 'তাই দাও। চব্বিশটাই নোব। তবে দামটা এখন দিতে পারছি না। পরে একসময় আমার বাড়ি যেয়ে তুমি নিয়ে এস।' মেয়েটি তাতেই রাজি হ'ল। খালুই উপুড় ক'রে চব্বিশটা কৈ মাছই তাঁতিকে দিয়ে দিলে। তাঁতি মাছগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে বাড়ি চ'লে এল। বাড়িতে ঢুকেই ডাক পাড়লে, 'কই গো, এই মাছগুলো নাও।' তাঁতাবৌ সোঁটাসোঁটা কৈমাছ দেখে ঝগড়ার কথা ভুলে গেল। মাছগুলো পেতেয় রাখতে রাখতে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে হেসে ব'ললে, 'এমন ভাল ভাল কৈমাছ তুমি কোথায় পেলে গো?'

তাঁতি ব'ললে, 'ঐ পেয়েছি যেখানে হোক। এক কাজ করো। বেশ ভাল ক'রে এই চব্বিশটা কৈমাছকে রাঁধো দিকিন্। আমি একবার মাঠে যাচ্ছি। বীজধান জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে কিরষেণদের একটু ব'লে এখুনি আসছি। তারপর চান-টান ক'রে মাছ-ভাত খাওয়া যাবে।'

—'আচ্ছা তাই হবে।' এই ব'লে তাঁতিবৌ আঁশবটিটা নিয়ে মাছ কুটতে ব'সে গেল। আর বীজধানের ধামাটা কাঁধে নিয়ে তাঁতি মাঠে বেরিয়ে প'ড়ল।

কৈমাছ বাছাধোয়া হ'য়ে যেতেই তাঁতিবৌ রান্না চড়িয়ে দিলে। উনোনে কৈ মাছের ঝোল ফুটতে লাগল। রান্না প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এমন সময় একফোঁটা ঝোল ছিটকে এসে তার ঠোঁটে প'ড়ল। জিব দিয়ে চেটে নিলে ঝোলের ফোঁটাটা। চমৎকার হ'য়েছে। মনে মনে তাঁতিবৌ ভাবলে, ঝোল যখন এত মিষ্টি, তখন মাছ কত না মিষ্টি! এই ভেবে ঘরের চালে একটা মাকু তোলা ছিল। সেটা নিয়ে এল। উনোন থেকে মাছের ঝোল নামিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'তেই সেই মাকুটা দিয়ে তাঁতিবৌ একটা ক'রে কৈমাছ খপ্ ক'রে গাঁথে আর কপ্ ক'রে খায়। খেতে খেতে তেইশটা কৈমাছ সে খেয়ে ফেললে। বাকি থাকল একটি। সেই একটি কৈমাছ ঝোলের মধ্যে রেখে দিয়ে তাঁতিবৌ ঘর সংসারের অন্যান্য কাজ ক'রতে লেগে গেল।

তাঁতি মাঠ থেকে বাড়ি এসে তেল মেখে চান ক'রতে গেল। মাছের কথা তার বেশ ভালই মনে আছে। তাই পুকুরে যেয়ে ঝুপ ক'রে একটা কোড়া-ডুব দিয়েই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। বৌকে ব'ললে, 'কই গো, খিদে পেয়েছে, ভাত দাও।' বৌ পাতে সেই কৈমাছ আর বাটিতে একবাটি ঝোল দিয়ে ভাতের থালা স্বামীর সামনে বসিয়ে দিলে। তারপর রান্নাঘরের ভেতরে যেয়ে ব'সে ব'সে দরজার ফাঁক দিয়ে স্বামীর ভাত খাওয়া লক্ষ্য ক'রতে লাগল।

তাঁতি বাটি থেকে কিছু ঝোল ভাতের একপাশে ঢাললে। কিন্তু মাছ কী হ'ল! এই সব ভাবতে ভাবতে একথাবল দু'থাবল ভাত মুখে তুলছে আর রান্নাঘরের দিকে তাকাচ্ছে। তাই দেখে রান্নাঘরের ভেতর থেকে তাঁতিবৌ ব'ললে,

'খাও খাও খাও
ঘরবাগে কেনে চাও।'

কথাটা শুনে তাঁতি একটু রেগে ব'ললে, 'আমি চবিবশটা কৈমাছ এনে দিনু তার হিসেব দিতে হবে।'

স্বামীর কাছে না এসে তাঁতিবৌ রান্নাঘর থেকেই ব'লল, 'বেশ, তুমি হিসেব নাও।'

তাঁতি ব'ললে, 'কৈ ধরনু চবিবশ।'

তাঁতিবৌ ব'ললে, 'চারটে গেল হবিবশ।'

তাঁতি বল'লে, 'আর থাকে কুড়ি।'

—'চারটে দিয়ে এনেছি গুড় আর মুড়ি।'

—'আর থাকে ষোল।'

—'পাড়াপড়শীকে দু'টো দিতে হ'ল।'

—'এখনো তো থাকে চোদ্দ।'

—'দু'টো নিলে ধামুন আর বোদ্য।'

—'আর থাকে বারো।'

—'দু'টো নিয়ে গেল তোমার বোন হরো আর সরো।'

—'তবুও তো থাকে দশ।'

—'দুটো বেচে এনেছি ঝাল আর জস।'

—'আর আছে আট।'

—'দুটো দিয়ে এনেছি ঘুঁটে আর কাঠ।'

—'এখনো তো থাকে ছয়।'

—'গ্রামবাসীকে তো দু'টো দিতে হয়।'

—'আর থাকে চার।'

—'দু'টো গেল গাঁয়ের বার।'

—'তবুও তো থাকে দুই।'

—'শ্যামসোহাগী বেড়ালের জন্যে একটা থুই।'

কথা শুনতে শুনতে তাঁতির রাগ খুবই বেড়ে গেল। সে খাওয়া বন্ধ ক'রে ব'সে ব'সে বৌকে চেঁচিয়ে ব'ললে, 'তাই যদি হয়। তবুও তো থাকে এক।'

তাঁতিবৌ ঝাঁঝিয়ে ব'ললে,

'ড্যাব্‌রা চোখো
পোড়ার মুখো
পাতবাগে চেয়ে দ্যাখ্।
আমি ভাল মানুষের ঝি
তো এত ন্যাকা কি
তুই যদি ভাল মানুষের পো
ন্যাজা মুড়ো খেয়ে মাঝটা আমার জন্যে থো।'

বৌয়ের কথা শুনে তাঁতি মুখে কিছু না ব'লে চুপচাপ ভাত খেতে লাগল। পাতের কৈমাছটার মাথা আর লেজটা খেলে। মাঝখানটা বৌয়ের জন্যে রেখে দিয়ে পাত ছেড়ে উঠে আঁচিয়ে এসে সটান বিছানায় শুয়ে প'ড়ল।

স্বামীকে বোকা বানাতে পেরে তাঁতিবৌ মনে মনে খুব খুশি হ'ল। ভাবলে, পুরুষেরা কি বোকা!

রাজকুমার ও বাঁদর কনে

এক রাজার সাত ছেলে ছিল। রাজা কোনো ছেলেরই বিয়ে-থা দেয়নি। সাত রাজকুমার খায়-দায় আর দেশের নানান জায়গায় ঘুরেঘারে বেড়ায়।

ঐ দেশের এক মোড়ল রাজকুমারদের দেখে একদিন ব'ললে, 'তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছো। তা,' রাজা কি তোমাদের বিয়ে-থা দেবে না ?'

রাজকুমারদের মধ্যে একজন ব'ললে, 'বাবা বিয়ে যদি না দেয় আমরা কী ক'রবো ?'

মোড়ল রাজকুমারদের যুক্তি দিলে, 'এক কাজ করো। তোমরা সব ভাই রাজার গোস্‌সা-ঘরে যেয়ে পড়গে। তারপর যা' করবার আমিই ক'রবো।'

রাজকুমারেরা তাই ক'রলে। মোড়লের কথামতো পরেরদিন রাজবাড়ির গোস্‌সা-ঘরে সাত ভাই যেয়ে প'ড়ল। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ক'রলে। সে-খবর রাজার কানেও গেল। রাজা খুব চিন্তিত হ'য়ে উঠল। এবার মোড়লের ডাক প'ড়ল রাজবাড়িতে। মোড়ল রাজার কাছে হাজির হ'য়ে রাজাকে ব'ললে, 'মহারাজ, কী কারণে ডেকেছেন আমাকে ?'

রাজা ব'ললে, 'তুমি এদেশের মোড়ল। কী কারণে আমার সাতটা ছেলে গোস্‌সা-ঘরে ঢুকেছে তা' তোমাকে বলতে হবে।'

মোড়ল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললে, 'আমি কারণটা বুঝতে পেরেছি, মহারাজ।'

রাজা ব'ললে, 'কী সে কারণ ?'

মোড়ল ব'ললে, 'মহারাজ, ছেলেরা আপনার উপযুক্ত। ওদের বয়সও হ'য়েছে। এবার আপনি ওদের বিয়ে-থা দিন।'

রাজা ব'ললে, 'তা, সে-কথা ওরা আমাকে ব'ললেই তো পারত।'

মোড়ল ব'ললে, 'মহারাজ, ছেলে হ'য়ে বাপকে সেকথা কি কেউ ব'লতে পারে ? তাই ওরা গোস্‌সা-ঘরে ঢুকেছে।'

রাজা একটু চিন্তা ক'রে ব'ললে, 'ও, আচ্ছা। আমি ওদের বিয়ের ব্যবস্থাই ক'রছি। তুমি ওদের গোস্‌সা-ঘর থেকে উঠে চান ক'রে খাওয়া-দাওয়া ক'রতে বলগে।'

'আচ্ছা মহারাজ' ব'লে মোড়ল রাজকুমারদের কাছে গেল। রাজার সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হ'য়েছে তা তাদের ব'ললে। সাত রাজকুমারও সেকথা শুনে গোস্‌সা-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

রাজা একসময় ছেলেদের ডেকে ব'ললে, 'তোমাদের বিয়ের ব্যবস্থা আমি ক'রবো ভাবছি। তোমরা রাজি আছ তো ?'

সাতভাই চুপচাপ থেকে বাবাকে সম্মতি জানালে।

এবার রাজা এক কামারকে ডেকে সাতটা তীর গড়ালে। তারপর সাত ছেলের হাতে একটি ক'রে তীর ধনুক দিয়ে ব'ললে, 'তোমরা রাজার ছেলে, তোমাদের তো যেখানে-সেখানে বিয়ে দেওয়া চলে না। তাই আমি একটা ব্যবস্থা ক'রেছি। তোমরা সাত ভাই যে যেদিকে পার তীর ছোঁড়। যার তীর যে বাড়িতে বা যেখানে প'ড়বে আমি সেখানেই তার বিয়ে দোব।'

সাত রাজকুমার তীর ছুঁড়বে। চারদিক থেকে বহু লোকজন এসে রাজবাড়িতে জমায়েত হ'ল।

একে একে সাতভাই নাম লেখা তীর ছুঁড়লে। সব তীর চোখের বাইরে কোথায় চ'লে গেল। দেখা গেলনা। দিকে দিকে রাজার লোকজন তীরের খোঁজে বেরিয়ে প'ড়ল। ছ'জনের তীর খুঁজে পাওয়া গেল। যে যে বাড়িতে তীর যেয়ে প'ড়ল সেই সেই বাড়ির মেয়ের সঙ্গে এক একজন রাজকুমারের বিয়ে হ'ল।

ছোটরাজকুমারের তীর খুঁজে পাওয়া গেল না। রাজার লোকজন কোথাও তীরটা খুঁজে না পেয়ে প্রায় হতাশ হবার উপক্রম। এমন অবস্থায় একজন লোক এসে খবর দিলে, অমুক দেশের একটা নিমগাছের গুঁড়িতে ছোটরাজকুমারের তীরটা বিঁধে আছে। রাজা মহা ফাঁপরে প'ড়ল। অনেক ভেবেচিন্তে রাজা নিমগাছের গুঁড়ির মাজাটা কেটে রাজবাড়িতে আনতে ব'ললে।

কুড়ুল, কাটারী নিয়ে রাজার লোকজন নিমগাছটার গুঁড়ি কাটতে চ'লে গেল।

একজন লোক গুঁড়ির মাঝখানটায় কুড়ুলের চোট্ দিতেই ভেতর থেকে শব্দ হ'ল, 'কাটছ, কাট। দেখো যেন আমাকে লাগে না।'

গাছের ভেতর থেকে এরকম শব্দ শুনে লোকজন অবাক হ'য়ে গেল। কিন্তু কুড়ুলের চোট্ দেওয়া বন্ধ ক'রলে না। একটু পরে নিমের গুঁড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চমৎকার একটা বাঁদর।

রাজার লোকেরা বাঁদরটাকে নিয়ে রাজবাড়িতে এসে রাজার সামনে রাখলে। রাজাকে সব ঘটনা শোনালে। সব শুনে রাজ ব'ললে, 'তীর যখন নিমগাছে বিঁধেছে তখন এই বাঁদরের সঙ্গেই আমি আমার ছোটছেলের বিয়ে দোব। আমার কথার নড়চড় হবেনা।'

রাজা খুব ধুমধাম ক'রে সেই বাঁদরের সঙ্গেই ছোটছেলের বিয়ে দিলে।

একদিন রাজার খুব সখ হ'ল, বৌ-রান্না ভাত নিজেও খাবে, লোকজনকেও খাওয়াবে।

রাজার বৌমাদের ছ'জন রাজাকে রান্না ক'রে খাওয়ালে। বহু লোকজনও খেলে।

ছোটবৌ তো বাঁদর। তাকে আর কী ক'রে রান্না ক'রতে বলে। তার হাতের রান্না আর খাওয়া হ'ল না। এজন্যে ছোটরাজকুমারের মন-মেজাজও খুবই খারাপ।

একদিন ছোটরাজকুমারকে বাঁদর ব'ললে, 'তোমার এত মন খারাপ কেন?'

ছোটরাজকুমার ব'ললে, 'সব বৌ রান্না ক'রে বাবাকে ও বহু লোকজনকে খাওয়ালে। কিন্তু তুমি তো কিছু ক'রতে পারলে না!'

বাঁদর ব'ললে, 'ও, এই কথা! বেশ, যে'সব লোকজন খাবে তাদের বাইরে আসন ক'রে বসিয়ে দেবে। আর আমি একা একটা ঘরের মধ্যে থাকবো। যত খাবার লাগে আমি জানালা দিয়ে বাইরে বার ক'রে দোব। শুধু তোমাদের কিছু লোকজন যেন সেসব পরিবেশন ক'রে দেয়।'

বাঁদরের কথা শুনে রাজার ছোটছেলে অবাক হ'ল। রাজাকে সব ব'ললে। রাজা রাজি হ'য়ে বহু লোকজন নেমতন্য ক'রে ফেললে।

দিনের দিন লোকজন সব বাইরে ব'সেছে। জানালা দিয়ে বাঁদর সোনার থালায় ভাল ভাল খাবার বাইরে বার ক'রে দিচ্ছে। ঘরে অবশ্য কাউকেই ঢুকতে দিচ্ছে না। সবাই অবাক হ'য়ে গেল। রাজাও ভেবে পেলে না, কোথা থেকে কী ক'রে এসব হ'চ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তে বাঁদর ব'ললে, 'সোনার থালা, গেলাস যার যা খুশি বাড়ি নিয়ে যেতে পারে।' অনেক লোক সোনার থালা, গেলাস নিয়ে গেল। বাকি গরীব দুঃখীদের দেওয়া হ'ল।

একবার রাজার খেয়াল হ'ল, সাত ছেলেকে সাতটা বড় বড় পুকুর কেটে দিতে হবে।

ছ'জন ছেলের শ্বশুরবাড়ি থেকে বহু লোকজন এল। ছ'টা পুকুর কাটা হ'ল।

ছোটছেলে পুকুর কাটাতে না পেরে মনমরা হ'য়ে রইল। তাই দেখে বাঁদর ছোট রাজকুমারকে ব'ললে, 'এত ভাবছ কেন?'

ছোটরাজকুমার ব'ললে, 'দাদারা পুকুর কাটিয়ে বাবাকে খুশি ক'রলে, আমি তো পারনু না।'

বাঁদর ব'ললে, 'কিচ্ছু ভেবো না। যত বড় পুকুর কাটাতে চাও ততটা জায়গা দাগ দিয়ে দাও।'

রাজকুমার ব'ললে, 'কী হবে দাগ দিয়ে?'

বাঁদর ব'ললে, 'দাগটা দিয়েই দেখ না। যেদিন দাগ দেবে তার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে জায়গাটা। তাহ'লেই বুঝবে।'

বাবাকে ব'লে রাজকুমার তাই ক'রলে। লোকজন নিয়ে বিরাট একটা মাঠে গোল দাগ দিয়ে এসে বাঁদরকে জানিয়ে দিলে।

পরের দিন ভোরবেলায় রাজা ও রাজবাড়ির সবাই দেখলে, সেই মাঠ আর মাঠ নেই। সেখানে রাতের মধ্যেই বিরাট এক পুকুর হ'য়ে গেছে। সবাই অবাক হ'য়ে গেল।

ছোটরাজকুমার বাঁদরটাকে নিয়ে একটা ঘরে থাকে। একদিন রাতে ছোট-রাজকুমারের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে চাইতেই দেখলে, চারদিক আলোয় আলোময়। বাঁদরের খোলস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। কিছুক্ষণ নিজের মনে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা ক'রলে। তারপর আবার বাঁদরের রূপ ধ'রে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল।

ছোটরাজকুমার ঘুমের ভান ক'রে প'ড়ে প'ড়ে সব দেখলে। বাঁদরকে কিছু ব'ললে না। কেবল ভাবতেই লাগল।

ছোটরাজকুমার আবার একদিন রাতে ঐ একই দৃশ্য দেখলে। সেদিনও বাঁদরকে কিছু ব'ললে না। কিন্তু ঘরের কোণে কিছু কাঠকুটো এনে জড়ো ক'রে রাখলে।

তৃতীয় দিন রাতে বাঁদরটা তার খোলস রেখে সুন্দরী মেয়ের রূপ ধ'রে বাইরে একটু পায়চারী ক'রছে। সেই সময় ছোটরাজকুমার সেই কাঠকুটো এনে আগুন দিয়ে তা'তে বাঁদরের খোলসটা ফেলে দিতেই সেটা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল।

সুন্দরী মেয়ে বাইরে থেকে ছুটে এসে ছোট রাজকুমারকে ব'ললে, 'ওগো, এ তুমি কী করলে!'

ছোটরাজকুমার ব'ললে, 'আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি কোনো গুণিনকন্যা অথবা দেবকন্যা। এতদিন বাঁদরের রূপ নিয়ে আমার কাছে ছিলে। তোমাকে আমি বিয়ে ক'রেছি। আর আমি তোমায় বাঁদর হ'য়ে থাকতে দোব না।'

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে ব'ললে, 'তুমি আর আমাকে পাবে না। আমি সত্যিই এক গুণিনকন্যা। আসল রূপ নিয়ে আমি এখানে থাকতে চাইলেও থাকতে পাবো না।'

রাজকুমার ব'ললে, 'কেন? থাকলে কী হবে?'

গুণিনকন্যা ব'ললে, 'বাঁদর ছাড়া অন্য কোনো রূপ ধ'রে থাকলে আমার মা তোমাকেও ছাড়বে না আর আমাকেও না।'

রাজকুমার ব'ললে, 'তাহ'লে কী হবে?'

গুণিনকন্যা ব'ললে, 'তুমি আমার স্বামী সেকথা আমি অস্বীকার ক'রবো না। আমি অদৃশ্য হ'য়ে যাবো। তবে আমাকে তুমি পেতে পারো যদি এক কাজ করো।'

রাজকুমার ব'ললে, 'কী কাজ, বল।'

'লোহার পোষাক আর লোহার জুতো প'রে আমাকে খুঁজবে। খুঁজতে খুঁজতে

যেদিন লোহার জুতোর তলা ক্ষয়ে যাবে অথবা খ'সে প'ড়বে সেদিন তুমি আমাকে পাবে। তার আগে নয়। আর এই নাও আমার হাতের আংটি।'—এই ব'লে সেই গুণিনকন্যা স্বামীর আঙুলে একটা আংটি প'রিয়ে দিলে। আর স্বামীর একটা আংটি নিজের হাতে প'রে নিলে। তারপর ভূমিষ্ঠ হ'য়ে স্বামীকে প্রণাম ক'রলে।

রাজকুমার তাকে কিছু ব'লতে গেল। কিন্তু দেখলে, ঘরে আর কেউ নেই। যে মেয়ে তার হাতে আংটি পরিয়ে দিলে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

ছোটরাজকুমার খুবই মনমরা হ'য়ে থাকে। একদিন বাবাকে ব'ললে, 'বাবা, আমি কিছুদিনের জন্যে বিদেশে যাবো।' রাজা ছেলেকে বাধা দিলে না।

লোহার পোষাক আর লোহার জুতো প'রে ছোটরাজকুমার দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। খুঁজতে লাগল তার স্ত্রীকে। খুঁজতে খুঁজতে বহুদিন পরে এক দেশের এক পুকুরপাড়ে এসে হাজির হ'ল। আলান্ত হ'য়ে এক গাছের তলায় ছোট-রাজকুমার ব'সল। দেখতে পেলে, পুকুরের পাশেই এক প্রকাণ্ড বাড়ি। সেখানে বহু লোক যাওয়া-আসা ক'রছে।

কিছুক্ষণ পরে ছোটরাজকুমার দেখলে, বহু মেয়ে একে একে কলসী নিয়ে পুকুর ঘাটে জল নিতে এল। জল ভ'রে একশো জন মেয়ে একশোটা কলসী নিয়ে চ'লে গেল। একটি বুড়ী মেয়ে শেষ কলসীটা ভ'রলে। ভরা কলসীটা কাঁকালে তুলতে না পেরে বুড়ী এদিক ওদিক চাইলে। রাজকুমারকে গাছতলায় বসে থাকতে দেখে বুড়ী ব'ললে, 'বাবা, তুমি যে-ই হও আমার কলসীটা তুলে দাওনা বাবা!'

রাজকুমার বুড়ীর কাছে যেয়ে ব'ললে, 'বুড়ীমা, জল কী হবে গো?'

বুড়ী ব'ললে, 'আমাদের রাজকন্যার আজ বিয়ে। একশো এক কলসী জল কন্যার গায়ে ঢালতে হবে। তাই জল নিয়ে যাচ্ছি। এটাই শেষ কলসী। দাওনা বাবা কলসীটা তুলে!'

রাজকুমারের হঠাৎ লক্ষ্য প'ড়ল জুতোর দিকে। দেখলে, লোহার জুতো ক্ষয়ে খ'সে গেছে। কী মনে হ'ল। বুড়ীর কাঁকালে কলসীটা তুলে দেবার সময় স্ত্রীর দেওয়া আংটিটা কলসীর জলে ফেলে দিলে। বুড়ী কলসী নিয়ে চ'লে গেল।

ওদিকে জলভর্তি একশোটা কলসী রাজবাড়িতে বসানো আছে। বুড়ী যে শেষ কলসীটা নিয়ে গেল সেটার জলই রাজকন্যার গায়ে ঢালা হ'ল। জল ঢালতেই আংটিটা রাজকন্যার পায়ের কাছে ঠুং ক'রে প'ড়ল। আংটি নজরে প'ড়তেই রাজকন্যা চিনতে পেরেছে। টপ্ ক'রে সে আংটি পা দিয়ে চেপে ধ'রলে। তারপর দাসী, সখী সবাইকে ব'ললে, 'বুড়ী ছাড়া তোমরা এখন সবাই এখান থেকে চ'লে যাও। জল আর ঢালতে হবে না। আমি একটু বুড়ীকে নিয়ে একা থাকবো।'

সবাই সেখান থেকে চ'লে গেল। এবার রাজকন্যা বুড়ীকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কে তোমায় জলের কলসী তুলে দিলে?'

বুড়ী আমতা আমতা ক'রে ব'ললে, 'পুকুরের পাড়ে একজন রোগা ক'রে লোক ব'সে আছে। সেই একবার এসে কলসীটা আমার কাঁকালে তুলে দিলে।'

রাজকন্যা বুড়ীকে ব'ললে, 'এখুনি ঐ লোকটাকে তুমি এখানে ডেকে আন। তোমাকে কাপড় আর টাকাকড়ি দোব।'

বুড়ী ব'ললে, 'পুরুষ মানুষকে এখানে কী ক'রে আনবো ?'

রাজকন্যা বুড়ীর হাতে একখানা শাড়ি কাপড় দিয়ে ব'ললে, 'তা'কে এই শাড়ি-খানা পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে এখানে আনবে। যাও। দেরি ক'রো না।'

বুড়ী পুকুরপাড়ে গেল। সব কথা বলার পরে ছোটরাজকুমারকে শাড়ি পরিয়ে দিলে। ছোটরাজকুমার লম্বা ঘোমটা দিয়ে বুড়ীর সঙ্গে রাজকন্যার কাছে এসে হাজির হ'ল।

রাজকন্যা এক নজরেই স্বামীকে চিনে নিলে। একটা ঘরে তা'কে বসালে। ছোটরাজকুমার তার দুঃখ-কষ্টের সব কথা কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যাকে ব'ললে।

রাজকন্যা ব'ললে, 'বাবা আমার আবার বিয়ে দিচ্ছে। বর এবং বরযাত্রী এসেও গেছে।'

রাজকুমার বললে, 'তুমি আবার বিয়ে ক'রবে !'

রাজকন্যা ব'ললে, 'না, বিয়ে তো তোমার সঙ্গে হ'য়ে গেছে আমার।'

রাজকুমার ব'ললে, 'এখন তবে কী ক'রবে ভাবছো ?'

রাজকন্যা ব'ললে, 'তোমার সঙ্গে চ'লে যাবো। এখানে থাকবো না।'

রাজকুমার বললে, 'তা কেমন ক'রে সম্ভব ?'

'দেখই না।' এই ব'লে রাজকন্যা একটা বড় রুমাল পাতলে। সেই রুমালের দু'কোণে দু'জনে ব'সল। তারপর রাজকন্যা বিজবিজ ক'রে কী ব'লতেই রুমালটা দু'জনকে নিয়ে আকাশে উড়ে প'ড়ল।

প্রথমে বর ও বরযাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে সাতবার চক্কোর দিলে। তারপর উড়ে উড়ে রাজকুমারদের বাড়িতে এসে হাজির হ'ল। কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকল না। সেই বড় পুকুরটার পাড়ে একটা ডালিমগাছ ছিল। সেই গাছে একটিই কাণা ডালিম ছিল। সেই ডালিমের ভেতরে দু'জনে বাস ক'রতে লাগল। দিনে ডালিমের ভেতরে থাকে আর রাতে ডালিম থেকে বেরিয়ে দু'জনে ঘুরেঘারে বেড়ায়। আমোদ-ফুর্তি করে।

রাজকন্যার মা ছিল মস্ত বড় গুণিন। সে মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে পুকুরপাড়ে এসে হাজির হ'ল। নর্তকীর বেশে এমন মিষ্টি সুরে গান গাইতে লাগল আর চমৎকার নাচতে লাগল যে, বহুলোক জমে গেল পুকুরপাড়ে। রাজাও এল। কিন্তু নর্তকীকে চিনতে পারলে না।

নর্তকীর নাচগানে মুগ্ধ হ'য়ে অনেক লোক অনেক কিছু বকশিস্ দিতে লাগল।

রাজা খুশি হ'য়ে নিজের গলার দামী হার খুলে দিতে গেলে নর্তকী ব'ললে, 'আমি সবাইয়ের বকশিস্ নোব কিন্তু রাজার কাছে বকশিস্ নোব না।'

রাজা ব'ললে, 'কেন, আমার দেওয়া বকশিস্ নেবে না কেন?'

মেয়েটি ব'ললে, 'টাকাকড়ি, সোনাদানা আপনার কাছে আমি নোব না।'

রাজা ব'ললে, 'তবে কী নেবে তুমি?'

মেয়েটি ব'ললে, 'ঐ যে ডালিম গাছটায় একটিমাত্র কাণা ডালিম আছে, ওটা আমাকে দিলে আমি নোব। অন্য কিছু আপনার কাছে নোব না।'

রাজা একটু ভাবলে। তারপর সখের ডালিম গাছ থেকে কাণা ডালিমটা তুলে এনে নর্তকীর হাতে দিলে।

হাতে কাণা ডালিম পেয়ে নর্তকী খুব খুশি। ডালিমটাকে মাটিতে মারলে এক আছাড়। ডালিমটা ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেল। সবাই দেখতে পেলে, ওটা থেকে ডালিমের দানা নয়, সরষের দানা ছিটকে প'ড়ল চারদিকে। তারপর নর্তকী কী বিজবিজ ক'রে মন্ত্র প'ড়লে। মন্ত্র আওড়াতেই একদল পায়রা কোথা থেকে এসে বসল জায়গাটায়। পায়রার দল সরষে খেতে শুরু ক'রে দিলে।

সরষের দানার মধ্যে রাজকন্যা ও ছোটরাজকুমার ছিল। রাজকন্যা দেখলে, তার মা এবার তাদের খুবই ক্ষতি ক'রবে। সেও গুণিন মায়ের বেটী। রাজকন্যা মন্ত্রের জোরে রাজকুমারকে মানুষ ক'রে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর বেড়ালের রূপ ধ'রে এক এক ক'রে সব পায়রার গলা কেটে দিলে। শেষে এক লাফে যেয়ে ধ'রলে তার মায়ের গলাটা। দাঁতে ক'রে কচ্ ক'রে কেটে দিলে শাঁসিটা। রাজকন্যার মা ছটফট ক'রে সেখানেই ম'রে গেল।

এবার বেড়ালের রূপ ছেড়ে রাজকন্যা নিজের মূর্তি ধ'রলে। স্বামীর কাছে গেল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই রাজাকে প্রণাম ক'রে সব কথা ব'ললে। রাজা খুব খুশি হ'ল। রাজবাড়িতে উৎসব হ'ল।

সেই পুকুরপাড়ে বিরাট বাড়িতে ছোটরাজকুমার স্ত্রীকে নিয়ে সুখে বসবাস ক'রতে লাগল।

দুবরাজ পাখী

এক দেশের রাজার দুই রাণী ছিল। বড়রাণী ও ছোটরাণী কারোরই কোনো ছেলে-পিলে না হওয়ায় রাজা খুবই মনমরা হ'য়ে থাকত। রাজবাড়িতে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হ'ল। রাজা তাকে খুব আদর-যত্ন ক'রলে।

রাজার ছেলে-পিলে নেই জেনে সন্ন্যাসী রাজাকে কিছু গাছ-গাছড়া দিয়ে ব'ললে, 'মহারাজ, রাণীমাকে খুব ভোরে উঠে চান ক'রে ভিজে কাপড়ে এই গাছগাছড়া শিলে বেটে খেতে ব'লবেন। তাহ'লেই আপনি সন্তান লাভ ক'রবেন।'

সন্ন্যাসীর দেওয়া গাছগাছড়া নিয়ে রাণীদের কাছে যেয়ে সব কথা ব'ললে। রাণীরাও শুনলে।

বড়রাণী ছোটরাণীকে সেই গাছগাছড়া খেতে দিতে নারাজ। রাজাও বড়রাণীর মতেই মত দিলে।

বড়রাণী একদিন ভোর ভোর উঠে পুকুরে চান ক'রে ভিজে কাপড়ে সন্ন্যাসীর দেওয়া গাছগাছড়া শিলে আচ্ছা ক'রে বেটে খালিপেটে খেয়ে ফেললে।

ওদিকে ছোটরাণীরও সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। এক পা এক পা ক'রে এসে ছোটরাণী শিল নোড়া দেখে বুঝতে পারলে, সন্ন্যাসীর দেওয়া ওষুধ বড়রাণী কিছুক্ষণ আগে শিলে বেটে খেয়েছে। এখনো শিল নোড়ায় ওষুধ কিছু কিছু লেগে আছে।

ছোটরাণী কাউকে কিছু না ব'লে চান ক'রে এসে ভিজে কাপড়ে সেই শিল নোড়া জলে ধুয়ে সেই জল খেয়ে ফেললে। কিছুদিন পরে ছোটরাণী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব ক'রলে, কিন্তু বড়রাণীর কোনো সন্তান হ'ল না।

কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী আবার রাজবাড়িতে এল। বড়রাণীর সন্তান না হওয়াতে রাজার হাতে একটি কাঁচা আম দিয়ে সন্ন্যাসী ব'ললে, 'চান ক'রে সোঁ-কাপড়ে এই কাঁচা আমটা শিলে থেঁতলে খেলেই বড়রাণীর সন্তান হবে।'

সন্ন্যাসীর নির্দেশ মতো বড়রাণী সোঁ-কাপড়ে কাঁচা আমটা শিলে থেঁতলে খেলে। এবারও ছোটরাণী লুকিয়ে শিল নোড়া ধোয়া জল খেলে।

যথা সময়ে বড়রাণী ও ছোটরাণী দুজনেই একটি ক'রে পুত্র সন্তান প্রসব ক'রলে।

বড়রাণীর একটি ও ছোটরাণীর দু'টি—মোট তিনটি সন্তান লাভ ক'রে রাজা মহাখুশি। ছেলেরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে উঠতে লাগল।

এদিকে রাজা জাহাজ নিয়ে বিদেশে বাণিজ্যে যাবার মনস্থ ক'রলে। বাণিজ্যে যাবার আগে ছেলেদের কাছে ডেকে ব'ললে, 'আমি বিদেশে যাচ্ছি। তোমাদের জন্যে কী আনতে হবে বল।'

ছোটরাণীর দু'ছেলে বাবাকে ব'ললে, 'বাবা, আমাদের দু'জনের জন্যে দু'টো বাঘ নিয়ে এস।'

বড়রাণীর ছেলেকে জিজ্ঞেসা করায় সে ব'ললে, 'আমার জন্যে একটা দুবরাজ পাখী কিনে আনবে।'

রাজা সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষেৎ ক'রে জাহাজ নিয়ে বিদেশে বাণিজ্য ক'রতে বেরিয়ে প'ড়ল। একমাস দু'মাস ক'রে তিন মাস বিদেশে কেটে গেল। রাজার অনেক টাকাকড়ি হ'ল। দু'টো বাঘ কিনে নিয়ে রাজা নিজের দেশের উদ্দেশ্যে জাহাজ ছেড়ে দিলে। তিন দিনের পথ আসার পরে সমুদ্রের মাঝখানে হঠাৎ জাহাজ আটকে গেল। রাজা খুব চিন্তিত হ'য়ে উঠল। তার মনে প'ড়ে গেল, বড়রাণীর ছেলের জন্যে দুবরাজ পাখী তো কেনা হয় নি! রাজা তার লোকদের জাহাজ ফেরাতে ব'ললে। জাহাজ ফিরিয়ে এনে আবার তীরে নোঙর করা হ'ল। দুবরাজ পাখীর খোঁজে রাজা নানান জায়গায় ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে একটি পুকুরের পাড়ে এক বুড়ীর কাছে এসে হাজির হ'ল। বুড়ীর একটি বাচ্ছা দুবরাজ পাখী ছিল।

রাজা বুড়ীকে ব'ললে, 'বুড়ীমা, তোমার ঐ দুবরাজ পাখীটা আমাকে দিতে হবে।'

বুড়ী রাজার মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে, 'তুমি দুবরাজ পাখী নেবে? বেশ, আমি দিতে পারি। তবে আমার দুবরাজ পাখীর দাম লাগবে তিনশো টাকা।'

রাজা ব'ললে, 'আমি তাই দিচ্ছি।'

তারপর তিনশো টাকা বুড়ীকে দিয়ে তার কাছ থেকে দুবরাজ পাখী নিয়ে রাজা জাহাজে ফিরে এল। রাজার আদেশে তার লোকজন জাহাজ ছেড়ে দিলে।

কিছুদিন পরে জাহাজ নিয়ে রাজা দেশে ফিরে এল। ছোটরাণীর দু'ছেলেকে বাঘ দু'টো দিতেই তারা খুশি হ'য়ে দু'জন দুটো বাঘের পিঠে চ'ড়ে খেলিয়ে বেড়াতে লাগল।

দুবরাজ পাখীর বয়স কম। বড়রাণীর ছেলের মন খুবই খারাপ। পাখী পেয়েও রাজকুমার পাখীতে চ'ড়তে পাচ্ছে না।

একদিন দুবরাজ পাখী রাজকুমারকে ব'ললে, 'অত মন খারাপ ক'রছ কেন? তুমিও বড় হও আর আমিও বড় হই। তারপর তোমায় পিঠে ক'রে উড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো।'

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল। রাজকুমার, দুবরাজ পাখী দু'জনেই বড় হ'য়ে উঠল। একদিন পাখী রাজকুমারকে ব'ললে, 'দেখ রাজকুমার, আমি তোমায় তিনদিক নিয়ে যাবো। কিন্তু উত্তর দিকে নিয়ে যেতে পারবো না।' রাজকুমার ব'ললে, 'তোমার যেদিকে খুশি তুমি সেদিকেই নিয়ে চল। তোমার পিঠে চ'ড়ে দেশ-বিদেশে বেড়াতে পেলেই হ'ল।'

দুবরাজ পাখী রাজপুত্রকে নিয়ে আকাশে উড়ে প'ড়ল। পুব, পশ্চিম, দক্ষিণ এই তিন দিকের বহু দেশের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চ'লল।

এক সময় রাজকুমার দুবরাজ পাখীকে ব'ললে, 'তুমি তিন দিক তো আমাকে ঘোরালে। এবার উত্তর দিকের দেশগুলো একবার দেখিয়ে দাও।'

দুবরাজ পাখী রাজকুমারকে ব'ললে, 'আমি তো তোমায় আগেই ব'লেছি, উত্তর দিকে আমি যাবো না।'

রাজকুমার ব'ললে, 'কেন, উত্তর দিকে গেলে কী হবে?'

পাখী ব'ললে, 'তোমার আমার দু'জনেরই বিপদ হবে।'

রাজকুমার বললে, 'হোক বিপদ। উত্তর দিকে তোমায় যেতেই হবে।' রাজকুমার ভীষণ জেদ্ ধ'রলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুবরাজ পাখী রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে উত্তর মুখে উড়ে উড়ে চ'লল।

বহু নদী-নালা, জঙ্গল, মরুভূমি পেরিয়ে এক দেশে এসে হাজির হ'ল। আলান্ত হ'য়ে সেই দেশের এক রাজবাড়ির চিলেকোঠার ছাদে নেমে প'ড়ল। দুবরাজ পাখী সেই চিলে কোঠায় রইল। আর রাজকুমার সিঁড়ি বেয়ে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে প'ড়ল। ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরের মধ্যে এসে হাজির হ'ল। দেখলে, এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা ম'রে পালঙ্কে প'ড়ে আছে। আর তার পাশেই দু'টো কাঠি রয়েছে। একটা সোনার একটা রুপোর।

রাজকুমার সেই কাঠি দু'টো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রতে ক'রতে একটা কাঠি রাজকন্যাব গায়ে লাগতেই রাজকন্যা বেঁচে গেল। বেঁচে উঠেই চোখ মেলে চাইলে। সামনে রাজকুমারকে দেখে সে ব'ললে, 'কে তুমি? কেন এখানে এসেছো? কী ক'রেই বা এলে? দেখতে পাচ্ছো না—ঐ দূরে একটা অজগর সাপ? তোমাকে এখুনি আস্ত গিলে ফেলবে।'

রাজকুমার দেখতে পেলে, সত্যিই একটা বিরাট অজগর দূরে গজরাচ্ছে। ভয়ে রাজকুমারের মুখ শুকিয়ে গেল। এখানে আসার আদি-অন্ত সবকিছুই রাজকুমার সেই রাজকন্যাকে ব'ললে। রাজকন্যাও সব শুনলে।

তারপর দু'জনে মিলে নানান গল্প-গুজব ক'রলে। রাজকন্যা ভাল ভাল খাবার এনে রাজকুমারকে খেতে দিলে। এইভাবে বেশ কিছুদিন রাজকন্যার কাছে রাজকুমারের কেটে গেল। একদিন রাজকন্যার সঙ্গে রাজকুমারের বিয়েও হ'য়ে গেল।

বিয়ের পর বেশ কিছুদিন কাটল। তারপর একদিন রাজকুমার ও রাজকন্যা দুবরাজ পাখীর পিঠে চ'ড়ে ব'সল। পাখীও উড়ল আকাশে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেলে, সমুদ্রের জলে একটা তক্তাপোষ ভেসে যাচ্ছে। পাখী এসে সেই তক্তাপোষের ওপর ব'সল।

রাজকুমার, রাজকন্যা ও দুবরাজ পাখীকে নিয়ে তক্তাপোষ ভেসে ভেসে যায়।

পাখী মাঝে মাঝে উড়ে যেয়ে এখান সেখান থেকে রাজকুমার ও তার বৌয়ের জন্যে খাবার জোগাড় ক'রে নিয়ে আসে।

এমনি ভাবে বেশ কিছুদিন চলার পরে রাজকন্যা একদিন সেই সমুদ্রের মাঝখানে তক্তাপোষের ওপর একটি পুত্র-সন্তান প্রসব ক'রলে। রাজপুত্র তার বৌয়ের জন্যে দুবরাজ পাখীকে তাড়াতাড়ি আগুন আনতে ব'ললে। পাখী আগুন আনতে চ'লে গেল।

এদিকে সমুদ্রে দারুণ ঝড় উঠল। উত্তাল তরঙ্গের ঘায়ে তক্তাপোষ ভেঙে তিন খন্ড হ'য়ে গেল। একটি খন্ডে রাজকুমার আর অপর দু'টি খন্ডে রাজকন্যা ও তার শিশুসন্তান ভেসে ভেসে চ'লল।

রাজকুমার একদিকে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রের কিনারায় এসে ঠেকল। বৌ ছেলে যে কোথায় ভেসে গেল তা জানতেও পারলে না।

তক্তাখন্ড থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে এক ময়রার বাড়িতে সে আশ্রয় পেলে। ময়রা ও ময়রাবৌয়ের কোনো ছেলে-পিলে ছিল না। তারা রাজকুমারকে ছেলের মতো ক'রে বাড়িতে রেখে দিলে।

রাজকন্যা আর তার ছেলে তক্তপোষের যে দু'টো খন্ডে ছিল সে দু'টোর মাঝে একটু জোড় লেগে ছিল। তাই তারা মা-বেটায় দূরে দূরে ছিটকে গেল না। তারা ভাসতে ভাসতে এসে সমুদ্রের ধারে এক গোয়ালার বাড়িতে উঠল।

গোয়ালা ও গোয়ালিনীর আর কেউ ছিল না। রাজকন্যা ও তার ছেলেকে পেয়ে তারা খুব খুশি হ'ল। রাজকন্যা মেয়ের মতো গোয়ালাবাড়িতে থাকতে লাগল। ছেলেও সেখানে খুব আদর-যত্নে মানুষ হ'তে লাগল।

রাজকুমার ময়রাবাড়িতে থাকতে থাকতে ভেয়ানের কাজ শিখে ফেললে।

যে গোয়ালার বাড়িতে রাজকন্যা তার ছেলেকে নিয়ে থাকে সেই গোয়ালা প্রতিদিন ছানা নিয়ে সেই ময়রাকে দিয়ে আসে যার কাছে রাজকুমার থাকে ও ভেয়ানের কাজ করে। একদিন গোয়ালার অসুখ ক'রেছে। সে ছানা দিতে যেতে পারলে না। ছানা না হ'লে মিষ্টি তৈরী হবে না। দোকানও চ'লবে না। তাই ময়রা রাজকুমারকে ব'ললে, 'বাবা, যে গোয়ালা আমাদের দোকানে ছানা দেয় তার অমুক জায়গায় বাড়ি। তুমি সেখানে যাও। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ছানা নিয়ে এস। নইলে মিষ্টি তৈরী হবে না।'

রাজকুমার গোয়ালাবাড়ি ছানা আনতে চ'লে গেল। গোয়ালাবাড়িতে গেলে গোয়ালিনী তাকে আদর ক'রে ব'সতে দিলে। রাজকন্যাকে গোয়ালিনী ব'ললে, 'মা, ময়রার ছেলেকে ভাল ক'রে জলটল খেতে দাও।'

রাজকন্যা কিছু খাবার আর জল নিয়ে রাজকুমারের সামনে হাজির হ'ল। রাজকুমার আর রাজকন্যার চোখাচোখি হ'তে দু'জনেই অবাক হ'য়ে গেল। কারো মুখে কথা নেই। কেবল দু'জনের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে

রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের অনেক কথাবার্তা হ'ল। ফুটফুটে ছেলেটাকে সামনে ঘোরাফেরা ক'রতে দেখে রাজকুমার বুঝতে পারলে, সেটা তারই ছেলে। কাছে টেনে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আদর ক'রলে। তারপর ছানা নিয়ে গোয়ালার ঘর থেকে ময়রাবাড়ি ফিরে এল। এমনি ক'রে রাজপুত্র গোয়ালাবাড়ি যেয়ে প্রায়ই বৌ ছেলেকে দেখে আসতে লাগল।

ওদিকে দুবরাজ পাখী আগুন আনতে যেয়ে ডানার সব পালক পুড়িয়ে ফেললে। সে আর ফিরে আসতে পারলে না। অনেকদিন পরে তার ডানায় আবার পালক হ'ল। ডানায় পালক গজাতেই সে আকাশে উড়ে প'ড়ল। উড়ে উড়ে বহু দেশে রাজকুমার আর তার বৌ ছেলের সন্ধান ক'রতে লাগল।

একদিন সেই ময়রার দোকানের সামনে দিয়ে উড়ে যেতে যেতে রাজকুমারকে দেখতে পেলে। শোঁ ক'রে আকাশ থেকে নেমে প'ড়ল ঐ ময়রার দোকানের ঠিক সামনে। রাজকুমার দেখতে পেয়ে দোকান থেকে ছুটে নেমে এল দুবরাজ পাখীর কাছে। পাখীকে ব'ললে, 'পাখী, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি ?'

পাখী রাজকুমারকে সব কথা ব'ললে। তারপর রাজকুমার ময়রা আর ময়রা-বৌকে প্রণাম ক'রে পাখীর পিঠে চ'ড়ে ব'সল। পাখীর পিঠে চ'ড়ে গোয়ালাবাড়ি এসে রাজকুমার হাজির হ'ল। গোয়ালা ও গোয়ালিনীকে সব কথা ব'ললে। তারপর রাজকুমার ও তার বৌ ছেলে সবাই গোয়ালা গোয়ালিনীকে প্রণাম ক'রলে। তাদের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে রাজকুমার বৌ ছেলে নিয়ে দুবরাজ পাখীর পিঠে চ'ড়ল। পাখী তিনজনকে পিঠে নিয়ে তিনদিনের মধ্যেই রাজপুত্রের দেশে ফিরে এল।

রাজা তার ছেলে বৌ ও নাতিকে পেয়ে মহানন্দে রাজবাড়িতে উৎসব ক'রলে।

সবাইকে নিয়ে রাজা সুখে রাজত্ব ক'রতে লাগল।

মুড়ি মুড়কি একদর

কোনো দেশের রাজার একটিই ছেলে ছিল। ছেলে বাবার কাছে যখন যা' আবদার ক'রত রাজা তাই মেটাত।

একদিন রাজপুত্র বাবাকে আবদার ক'রে ব'ললে, 'বাবা, আমি কিছুদিনের মতো বিদেশে যাবো।'

রাজা ব'ললে, 'বিদেশে একা একা বেড়াতে তুমি কি পারবে ?'

ছেলে ব'ললে, 'হ্যাঁ বাবা, আমি পারবো। তুমি আমার সব ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

রাজা ব'ললে, 'তুমি আমার একমাত্র ছেলে। তোমাকে বিদেশ-বিভুঁয়ে একা ছেড়ে দিতে আমি পারবো না বাবা! তুমি যাকে হোক সঙ্গী ক'রে নাও। তাহ'লে আমি কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবো।'

ছেলে ব'ললে, 'বেশ, তাই হবে। আমার সঙ্গী হবে মন্ত্রীপুত্র।'

রাজা তা'তেই রাজি হ'ল। পুত্রের বিদেশযাত্রার সব ব্যবস্থা ক'রে দিলে। মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের সঙ্গী হল।

বহুদেশ ঘুরতে ঘুরতে দু'জনে কাবুল রাজ্যে এসে পেঁছিল।

এই রাজ্যের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র এক মুড়ি মুড়কির দোকানের সামনে এসে হাজির হ'ল। দু'জনেই লক্ষ্য ক'রলে, দোকানদার একটা ঠোঙার মাপে মুড়ি মুড়কি দুই-ই বিক্রী ক'রছে একদামে। তারা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানদারের মুড়ি মুড়কি বিক্রী করা দেখলে। তারপর রাজপুত্র মন্ত্রী-পুত্রকে ব'ললে, 'কী ব্যাপার বল দিকিন ভাই! এখানে কি মুড়ি মুড়কির একদর?'

মন্ত্রীপুত্র ব'ললে, 'তা-ই তো দেখছি। এখানে আর থাকা নয়। চল ভাই, এদেশ ছেড়ে আমরা অন্য কোথাও চ'লে যাই।'

রাজপুত্র সেকথায় রাজি হ'ল না। সে ব'ললে, 'আমার তো দেশটা বেশ ভালই লাগছে।'

মন্ত্রীপুত্র ব'ললে, 'তোমার ইচ্ছে হয় তুমি থাকতে পার। যেখানে মুড়ি মুড়কির একদর সেখানে থাকা নিরাপদ ব'লে আমি মনে করিনা।'

রাজপুত্রের বুদ্ধিটা বেশ মোটা। সে মন্ত্রীপুত্রের কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। তাই আবার ব'ললে, 'কী কারণে তুমি এখানে থাকতে চাইছ না সেটা আমাকে খুলে বল ভাই।' মন্ত্রীপুত্র ব'ললে, 'আমার মনে হ'চ্ছে, এখানে বিচার-আচার ঠিকঠিক হয় না।'

রাজপুত্র হেসে ব'ললে, 'এর সঙ্গে বিচার-আচারের কী এল? আমার তো দেশটা দেখতে বেশ মজা লাগছে।'

মন্ত্রীপুত্র তেমনি গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে, 'বেশ, তুমি মজা ক'রেই দেখ। আমি কালই এদেশ ছেড়ে অন্য দেশে চ'লে যাবো।'

পরের দিন সত্যি সত্যিই মন্ত্রীপুত্র ঐ দেশ ছেড়ে পাশের দেশে চ'লে গেল।

রাজপুত্র কিন্তু গেল না। নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে এদেশের অনেক কিছু দেখে বেড়াতে লাগল।

এই দেশের রাজার একদিন একটি আংটি হারিয়ে গেল। রাজ-রাজড়ার ব্যাপার। আংটিটি খুবই দামী। রাজার হুকুমে রাজ্যময় ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, যে রাজার আংটি-চোরকে ধ'রে দিতে পারবে তাকে অনেক টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই হুকুম পেয়ে রাজার গুপ্তচরেরাও চোর খুঁজতে লেগে গেল।

কয়েকদিন পরে গুপ্তচরের মুখে নগরকোটাল সংবাদ পেলে, এক ছোকরার হাতে একটি দামী আংটি আছে। সে-ছোকরা ভালমন্দ খাচ্ছে, আর দিব্যি ঘুরে-ঘারে বেড়াচ্ছে। এ-খবর পেয়েই নগরকোটাল তার লোকজনকে আদেশ দিলে, 'যেখানে পাও ঐ ছোকরাকে ধ'রে সোজা রাজবাড়িতে নিয়ে এস।'

আদেশ পেয়েই রাজার লোকেরা রাজপুত্রকে ধ'রলে। হাতকড়া দিয়ে তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে এল।

কিছু বুঝতে না পেরে রাজপুত্র থতমত খেয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্রও কাছে নেই। কিছু ব'লতে কইতেও পারলে না।

বিচার হ'ল। বিচারে রাজা আদেশ দিলে, 'এই বিদেশী ছোকরা নিশ্চয়ই বহুদিন ধ'রে অনেক কিছু চুরি ক'রেছে। তাই একে অমুক তারিখে প্রকাশ্যে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হোক।'

এক দুই ক'রে শাস্তির দিন এগিয়ে আসতে লাগল। খবরটাও এককান দু'কান ক'রে ছড়িয়ে প'ড়ল। রাজপুত্রের শূলে চ'ড়ে মৃত্যুর দিন এসেও গেল। সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। শূলে চ'ড়ে মৃত্যু দেখবার জন্যে বহুলোক এসে জমেছে। রাজা, মন্ত্রী সবাই এসেছে।

ওদিকে রাজপুত্রের বন্ধু সেই মন্ত্রীপুত্র পাশের দেশ থেকে কেমন ক'রে খবরটা শুনতে পেয়েছে। এ খবর শুনেই সে বুঝেছে, ঠিক তার সঙ্গী রাজপুত্রকেই চোর সন্দেহ ক'রে ঐরকম শাস্তি দেওয়া হ'চ্ছে।

মন্ত্রীপুত্র দেরী না ক'রে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল সেইখানে। রাজপুত্রকে দেখেই ব্যাপার বুঝতে পারলে।

রাজপুত্রকে শূলে চড়ানো হবে। ঠিক সেই সময়ে মন্ত্রীপুত্র হাঁপাতে হাঁপাতে রাজার কাছে যেয়ে রাজাকে ব'ললে, 'রাজামশাই, ওকে শূলে চড়াবেন না। আমি ঐ শূলে চ'ড়বো।'

একথা শুনে রাজা অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'সেকি! তুমি শূলে চ'ড়ে ম'রবে কেন?'

মন্ত্রীপুত্র ব'ললে, 'আজ্ঞে, এক বড় গণৎকার ব'লেছে, আজ যে তিথি তা'তে যে লোক আজ শূলে চ'ড়ে ম'রবে তার অবধারিত স্বর্গলাভ। তাই ব'লছিনু, দয়া ক'রে আমাকে যদি ওর বদলে শূলে চ'ড়ে ম'রতে দেন তবে আমার বড় উপকার হয়।' কথাটা ব'লে মন্ত্রীপুত্র রাজার মুখের পানে চেয়ে রইল। রাজার মুখে হাসি ফুটল। রাজা ব'ললে, 'তাই নাকি! তাহ'লে স্বর্গলাভের এ-সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়বো না। আমি নিজেই ঐ শূলে চ'ড়ে ম'রবো।'

তারপর রাজা হুকুম দিলে, 'এই, ওকে নয়। আমাকে শূলে চড়া।' রাজাকে শূলে চড়ানো হ'ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজা শেষ হ'য়ে গেল। রাজা ম'রে গেছে। চারদিকে একটা হৈচৈ প'ড়ে গেল।

ওদিকে রাজপুত্র ছাড়া পেয়ে গেছে। সেই হৈচৈ-এর মাঝ থেকে মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের হাতটা ধ'রে টেনে সেখান থেকে বার ক'রে নিয়ে গেল। তারপর কোথাও দেরি না ক'রে রাজপুত্রকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে মন্ত্রীপুত্র নিজের দেশে ফিরে এল। তারপর দু'বন্ধুতে আবার সুখে দিন কাটাতে লাগল।

জ্ঞানবান্ নাতি

এক গাঁয়ে এক বুড়ী ছিল। বুড়ীর যখন বয়স কম ছিল তখন সে তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে খুব কষ্টের সঙ্গেই সংসার চালাত। ছেলে বড় হ'লে ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসারে বৌ নিয়ে এল। কিছুদিন পরে বুড়ীর একটি নাতি হ'ল।

এখন আর বুড়ী কোথাও যেতে-টেতে পারে না। ছেলে বৌ দু'জনের কেউই বুড়ীকে দেখতে পারে না। সে এখন সংসারের বোঝা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলে-বৌ বুড়ীকে যত্ন করা দূরে থাক, ভাল ক'রে খেতেই দেয় না। শুধু দু'বেলা ভাত দেয়। তাও আবার টাটি মাপ ক'রে। সেই ভাত বুড়ী তার ভাঙা বাসনে ঢেলে নেয়। তারপর ব'সে ব'সে খায় আর কাঁদে।

এক টাটি ভাতে তার পেট ভরে না। বৌমাকে বলে, 'ও বৌমা, আর দু'টি ভাত আমাকে দাও না মা, এতে আমার পেট ভরে না।' এ-কথায় ছেলে বৌ দু'জনেই বিরক্ত হয়। বৌমা বুড়ী শাশুড়ীকে বলে, 'না, ঐ এক টাটি ভাতই তুমি পাবে। তার বেশী চাইলেও পাবে না। তাতে পেট ভরুক আর না-ই ভরুক।'

ছেলে-বৌয়ের ব্যবহারে এবং নিজের কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ীর দু'চোখ জলে ভ'রে আসে।

বুড়ীর নাতি একটু বড় হ'য়েছে। কিছুটা জ্ঞানও তার হ'য়েছে। সে ঠাকুমার কাছে আসে, বসে। তার কথা শোনে। বাপ-মা টাটি মাপ ক'রে ঠাকুমাকে ভাত দেয়, তাও দেখে। ঠাকুমা ভাঙা বাসনে ভাত খেতে খেতে প্রায়ই কাঁদে। তাই দেখে নাতি একদিন ব'ললে, 'ঠাকুমা, তুমি কাঁদছো কেন?'

কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমা নাতিকে জবাব দেয়, 'তোমার মা-বাপ মাটির টাটিতে মাপ ক'রে এক টাটি ভাত আমাকে দেয়। ও'তে আমার পেট ভরেনা ভাই!'

নাতি ব'ললে, 'তুমি আরো ভাত চাইতে পার না?'

বুড়ী কেঁদে ব'ললে, 'চাইলেও দেয় না।'

নাতি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ঠাকুমাকে ব'ললে, 'ঠাকুমা, তোমাকে একটা কাজ ক'রতে ব'লবো, তুমি ক'রবে?'

ঠাকুমা ব'ললে, 'কী কাজ ভাই?'

নাতি ব'ললে, 'তুমি ক'রবে কি না তাই বল না?'

ঠাকুমা ব'ললে, 'দাদু ভাই, তোমার জন্যে আমি সব ক'রতে পারবো। কী কাজটা তাই বলো।'

নাতি ঠাকুমার কানের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ব'ললে, 'কাল যখন মা তোমাকে টাটি ক'রে ভাত দিতে আসবে তখন তুমি টাটিটা নিতে যেয়ে

হাত থেকে ফেলে দেবে। মা যেন মনে করে, টাটিটা তোমার হাত থেকে ফসকে প'ড়ে গেল।'

একথা শুনে বুড়ীর মুখ শুকিয়ে গেল। সে ভয়ে ভয়ে ব'ললে, 'টাটিও ভাঙবে আর ভাতও ছড়াবে। আমি খেতে না-ই পাই, কিন্তু তোমার বাপ-মা আমাকে গালি-গালাজ ক'রবে, হয়ত বা মার-ধোরও ক'রতে পারে।'

নাতি ব'ললে, 'সে আমি বুঝবো। তোমাকে যা' ক'রতে ব'লছি তা' তুমি ক'রবে কি না বল না?'

বুড়ী ব'ললে, 'আচ্ছা, তুমি যখন ব'লছো তখন তা-ই আমি ক'রবো।'

পরের দিন দুপুরে বৌমা তার বুড়ী শাশুড়ীকে টাটি ক'রে ভাত দিতে এসেছে। নাতি আগে থেকেই ঠাকুরমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নাতির কথামতো বৌমার হাত থেকে ভাতের টাটি নিতে যেয়ে বুড়ী হাত ফস্‌কে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মাটির টাটি ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। ভাতও চারদিকে ছিটকে ছড়িয়ে গেল। তাই দেখে নাতি চীৎকার ক'রে বারবার ব'লতে লাগল, 'ঠাকুমা, তুমি কী সর্বনাশ করলে গো!'

চেঁচামেচিতে বুড়ীর ছেলেও 'কী হ'য়েছে, কী হ'য়েছে' ব'লতে ব'লতে সেখানে এসে হাজির হ'ল।

তখন নাতি চীৎকার ক'রে ঠাকুমাকে ব'লছে, 'ভাত নষ্ট হ'ল তা'তে আমার ক্ষতি নেই। তুমি ঐ মাটির ছোট টাটিটা ভেঙে ফেললে কেন? তুমি সর্বনাশ ক'রে দিলে!'

বুড়ী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব'ললে, 'কেন দাদু-ভাই?'

নাতি ব'ললে, 'আমার বাবা মায়ের যখন তোমার মতো বয়স হবে তখন তাদের তো আমায় খেতে দিতে হবে?'

বুড়ী ব'ললে, 'তোমার বাপ-মাকে তুমি খেতে দেবে বৈকি, দাদুভাই। আমি কি খেতে দিতে নিষেধ ক'রছি?'

নাতি ঠাকুমাকে ব'ললে, 'নিষেধ তুমি করোনি। কিন্তু মাটির ঐ টাটিটা তুমি তো ভেঙে দিলে! আমি কিসে ক'রে আমার বাপ-মাকে ভাত দোব? আমি যে ঠিক ক'রেছিনু, তুমি ম'রে গেলেও ঐ মাটির টাটি আমি ফেলবো না। তোমাকে ওরা যেমন ক'রে ভাত মেপে দিচ্ছে আমিও তেমনি ক'রে দোব। কিন্তু তুমি তো এখন ওটা ভেঙে দিলে! আমার কী সর্বনাশ ক'রলে বল দিকিনু?'

বুড়ীর ছেলে-বৌ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের ছেলের কথা শুনলে। তখন আর কেউ কাউকে কিছু ব'ললে না।

এই ঘটনার পর থেকে বুড়ীর ছেলে-বৌ বুড়ীকে খুব যত্ন ক'রে খাওয়াতে লাগল। এতে ঠাকুমা নাতি দু'জনেই খুশি। ঠাকুমা নাতিকে খুব আশীর্বাদ করলে।

সোজাপথ বাঁকাপথ

এক দেশের কোনো মাঠে এক রাখাল প্রতিদিন গরু চরাত। একদিন রাখাল গরু মাঠে ছেড়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখানে ব'সে ব'সে গর্ত খুঁড়ছে, এমন সময় ঐ দেশের রাজার মন্ত্রী ঘোড়ায় চ'ড়ে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। গর্ত খোঁড়া দেখে মন্ত্রী ঘোড়া থামিয়ে রাখালকে ব'ললে, 'আচ্ছা ছেলে তো তুই? রাস্তার মাঝখানে গর্ত করছিস! লোকে গর্তে প'ড়ে যাবে না?'

মন্ত্রীর কথায় রাখাল গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তেই ব'ললে, 'গর্তে প'ড়বে কেন? লোকে কি গর্তটা দেখতে পাবে না?' মন্ত্রী বললে, 'যদি গর্তটা দেখতেই পায়, লোককে অনেকটা ঘুরে বেঁকে তো যেতে হবে? নইলে গর্তে পড়বেই।' রাখাল হেসে ব'ললে, 'সোজা পথে গেলে কেউ পড়েনা, বাঁকা পথে গেলেই প'ড়ে যায়।'

রাখালের কথাবার্তা শুনে মন্ত্রী মনে মনে ভাবলে, ছেলেটা তো বেশ কথা ব'লতে পারে!

মন্ত্রীর সঙ্গে রাখালের আরও কিছু কথাবার্তা হ'ল। মন্ত্রী বুঝতে পারলে, ছেলেটা রাখাল হ'লেও বুদ্ধি-সুদ্ধি বেশ ভালই। মন্ত্রী রাখালকে ব'ললে, 'এই ছোঁড়া, আমার বাড়িতে কাজ করবি? তোকে খেতে প'রতে দোব, আর আমার বাড়িতেই থাকবি।'

রাখাল হেসে ব'ললে, 'আরাম ক'রে থাকতে, খেতে, শুতে কে আর চায় না বলো? বেশ, আমি কালকে যাবো। আজ গরুগুলো আমার মনিবের বাড়িতে পৌঁছে তো দিতে হবে?'

পরের দিন থেকে রাখাল মন্ত্রীর বাড়ীতে থাকতে লাগল। খায়-দায় ঘুরে-ঘারে বেড়ায়। যেমন মন হয় অল্প-সল্প কাজ করে।

ঐ দেশের রাজা একদিন রাতে ভগবানকে স্বপ্ন দেখলে। খুব সকালেই রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালে। মন্ত্রী রাজার কাছে হাজির হ'য়ে ব'ললে, 'রাজামশাই, এত সকালে কী কারণে আমাকে ডেকে পাঠালেন?' রাজা মন্ত্রীকে ব'ললে, 'এখনই ভগবান কী ক'রছে এটা যে আমাকে ব'লতে পারবে আমি তাকে অনেক পুরস্কার দোব।'

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী বড় চিন্তায় প'ড়ল। রাজা প্রচুর পুরস্কার দেবে সেকথা মন্ত্রীর মনে প'ড়তে লাগল।

দু'দিন যায়, চারদিন যায়। রাজা মন্ত্রীকে শুধোয়, 'কই মন্ত্রী, লোক পেলে? আমার মন যে ভীষণ ছটফট ক'রছে!'

মন্ত্রী উত্তর দেয়, 'আজ্ঞে, লোক তো মিলছে না। যাকে জিজ্ঞেস করি সেই বলে, ভগবান এখন কী করছে সেকথা কি মানুষে বলতে পারে?'

মন্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রাজা ব'ললে, 'তাহ'লে উপায়?' মন্ত্রী ব'ললে, 'এক রাখাল ছেলে আছে আমার বাড়িতে। সে ব্যাটার ভয়ানক বুদ্ধি। যদি অনুমতি করেন তবে তাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পারি।'

রাজা ব'ললে, 'নিশ্চয়ই তা ক'রতে পারো। দরকার মনে ক'রলে তাকে রাজ-বাড়িতে নিয়ে এস।'

মন্ত্রী বাড়ি ফিরে রাখালকে কাছে ডাকলে। ব'ললে, 'এই ব্যাটা, তোর তো খুব পাকা পাকা বুদ্ধি। ব'লতে পারিস, এখন ভগবান কী ক'রছে?'

রাখাল হেসে ব'ললে, 'এই কথা? সে এখন দেখে এলেই হবে। ও'আর এমন কী কাজ?'

রাখালের কথা শুনে মন্ত্রী অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'বলিস কিরে ব্যাটা, তুই ভগবানকে দেখে আসবি?'

রাখাল ব'ললে, 'তা তো বটেই! কিন্তু তোমাদের রাজা সেজন্যে কী দেবে?'

মন্ত্রী ব'ললে, 'তুই যদি ব'লতে পারিস তবে রাজা তোকে প্রচুর পুরস্কার দেবে।' পুরস্কারের কথা শুনে রাখাল ব'ললে, 'আচ্ছা, এমন ক'রে যখন ব'লছো, তখন দু'একদিন পরে ভগবানকে দেখে এসে ব'লবো সব।'

মন্ত্রীর আর দেরি সহ্য হয় না। রাখালকে ব'ললে, 'দু'একদিন পরে নয় বাবা, আজই তোকে ভগবানের কাছে যেতে হবে।'

রাখাল ব'ললে, 'আচ্ছা, তাই নাহয় হবে। সন্ধ্যেবেলায় যাবো।'

সন্ধ্যেবেলায় রাখাল একটা লম্বা মই জোগাড় ক'রে সেটা কাঁধে নিয়ে মন্ত্রীর সামনে হাজির।

মন্ত্রী ব'ললে, 'একিরে ব্যাটা, এতবড় লম্বা মই কী হবে?'

রাখাল ব'ললে, 'এই মই দিয়ে উঠেই তো উঁকি মেরে দেখে আসবো, ভগবান্ ব্যাটা এখন কী ক'রছে।'

মন্ত্রী অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস নাতো?'

রাখাল হেসে ব'ললে, 'তুমি আমাকে খাওয়াচ্ছো পরাচ্ছো। তোমার সঙ্গে ঠাট্টা? আচ্ছা, এক কাজ করো। আমাকে ভালমন্দ বেশ ক'রে খাইয়ে দাও দিকিনি। আমি চট্ ক'রে ভগবানকে দেখতে বেরিয়ে পড়ি।'

মন্ত্রী তাই ক'রলে। রাখাল মনের আনন্দে ভালমন্দ খেয়ে মইটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকারে বাইরে চ'লে গেল। মন্ত্রী গভীর চিন্তায় ঘরের মধ্যে কেবল পায়চারি ক'রতে লাগল।

একটু পরেই রাখাল ফিরে এল। মন্ত্রী হন্তদন্ত হ'য়ে রাখালের কাছে যেয়ে ব'ললে, 'কী দেখলি ব্যাটা ?'

রাখাল গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইল। উত্তর দিলে না।

মন্ত্রী আবার ব'ললে, 'আমার যে আর সহ্য হয় না! বল্ বাবা, ভগবান এখন কী ক'রছে।'

রাখাল ব'ললে, 'সে অনেক কিছু ক'রছে। অত সব এখন বলা যাবে না। যা' বলার রাজার সামনেই কাল সকালে ব'লবো। এখন আমি খুব আলান্ত। আমার ঘুম পাচ্ছে।' এই ব'লে রাখাল সোজা যেয়ে শুয়ে প'ড়ল নিজের ঘরে। মন্ত্রী নিরুপায়। রাতটা একরকম জেগেই কাটিয়ে দিলে।

খুব সকালেই রাখালকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত হ'ল। রাখালকে দেখিয়ে মন্ত্রী রাজাকে ব'ললে, 'এই সেই ছেলে। গতকাল সন্ধ্যেবেলায় ও' ভগবানের সঙ্গে দেখা ক'রে এসেছে। ভগবান কী ক'রছে তা দেখে এসেছে।'

কথাটা শুনে রাজার খুবই আনন্দ হ'ল। সিংহাসনে ব'সে ব'সে রাখালকে রাজা ব'ললে, 'বল্ ব্যাটা, ভগবানকে কেমন অবস্থায় দেখে এলি ?' রাখাল ব'ললে, 'তুমি তো আচ্ছা রাজা! ভগবানের সঙ্গে যে অত কষ্ট ক'রে দেখা ক'রে এল তাকে তুমি কোনো আপ্যায়ন করলে না ? খাওয়া-দাওয়া হবে তবে তো থিতিয়ে-জিরিয়ে সব বলবো।'

রাজা তখনি রাখালের খাওয়ার ব্যবস্থা করবার আদেশ দিলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে রাখাল আবার রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজাকে ব'ললে, 'একটু উঠে এসো সিংহাসন ছেড়ে। তবে সবকথা ব'লবো।'

রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে এল। রাজবাড়িতে আসবার সময় রাখাল সঙ্গে দু'খানা গামছা এনেছিল। একখানা গামছা রাখাল প'রেছিল আর একখানা পাগড়ীর মতো ক'রে তার মাথায় বাঁধা ছিল।

রাজাকে রাখাল ব'ললে, 'আমার মাথার গামছাটা তুমি তোমার মাথায় পাগড়ীর মতো পর আর তোমার মুকুটটা আমার মাথায় পরিয়ে দাও। তোমার ঐ রাজপোষাকটা আমাকে প'রতে দিয়ে আমার গামছাটা তুমি পর।' রাখালের কথামতো রাজা তাই ক'রলে। এবার রাখাল যেয়ে ধপ্ ক'রে সিংহাসনে ব'সে ব'ললে, 'আচ্ছা রাজামশাই, বল দিকিনি, এবার আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?'

রাজা ব'ললে, 'ঠিক রাজার মতো দেখতে লাগছে।'

রাখাল ব'ললে, 'তোমায় কেমন লাগাচ্ছে ?'

রাজা উত্তর দিলে, 'রাখালের মতো লাগাচ্ছে আমাকে।'

রাজবেশী রাখাল হেসে ব'ললে, 'ভগবান এখন কী ক'রছে জানো ? ভগবান এখন রাজাকে রাখাল আর রাখালকে রাজা ক'রছে। এইটা তার কাজ। নাও, এবার

তোমার পোষাক তুমি নাও, আর আমারটা আমাকে ফিরে দাও।' এই ব'লে পোষাক পাল্টে নিয়ে রাখাল মন্ত্রীকে ব'ললে, 'চলো, বাড়ি চলো এবার।'

রাজা রাখালের ব্যাপার দেখে সব বুঝতে পারলে। রাখালকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দিয়ে পুরস্কৃত ক'রলে।

মন্ত্রী রাখালকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এসে ভাবতে লাগল, বাঃ, বেশ হ'ল তো! আমি একজন মন্ত্রী। আমি কিছু পেনু না। আর ব্যাটা রাখাল ধনসম্পদ পেয়ে বড়লোক হ'য়ে গেল!

মন্ত্রী মনে মনে ঠিক ক'রলে, রাখালকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ব্যাটাকে নির্ঘাত মেরে ফেলতে হবে। এই ভেবে মন্ত্রী একটা মতলব ঠিক করলে। মন্ত্রীর বাড়ির কিছু দূরে ছিল একটা বাজার। সেখানে মাংস বিক্রি হ'ত। মাংসওয়ালার সঙ্গে মন্ত্রীর আগে থেকেই কথা ছিল, যার হাতে সে চিঠি লিখে পাঠাবে 'পুরে দাও', তাকে যেন মাংসকোটা কলে পুরে দিয়ে মেরে ফেলা হয়। মন্ত্রী একদিন রাখালকে ডেকে ব'ললে, 'যা ব্যাটা, বাজার থেকে মাংস নিয়ে আয়। তুইও খাবি, আমিও খাবো।'

মন্ত্রী ব'ললে, 'এই চিঠিটা নিয়ে যা। তাহ'লেই মাংসওয়ালা তোকে মাংস দেবে। পয়সা লাগবে না।' এই ব'লে 'একে পুরে দাও' চিঠিটা রাখালের হাতে দিলে।

রাখাল চিঠি হাতে বাজারে যেয়ে হাজির হ'ল। বাজারে অনেক দোকান-পত্র। কী একটা পুজো উপলক্ষে মেলাও ব'সেছে। রাখাল বাজারে ঢুকেই দেখলে, মন্ত্রীর একমাত্র ছেলে জুয়োর আড্ডায় ব'সে একমনে জুয়ো খেলছে। জুয়াড়ী মন্ত্রীপুত্রের হীরের আংটি, ঘড়ি, টাকাকড়ি সবই একে একে নিয়ে নিয়েছে। এবার পোষকটা জুয়োয় দান ধ'রেছে। রাখাল মন্ত্রীপুত্রের কাছে গেল। ব'ললে, 'দাদা, এখানে কোথায় রে?'

মন্ত্রীপুত্র কাঁদকাঁদ হ'য়ে বললে, 'জুয়োয় আমি হেরে যাচ্ছি রে! আমার সবই চ'লে গেছে!

রাখাল ব'ললে, 'দাদা, তুই সরে যা। আমি একদান খেলছি।' মন্ত্রীপুত্রের জায়গায় রাখাল জুয়ো খেলতে ব'সে গেল। একটার পর একটা দান ধ'রে মন্ত্রী-পুত্রের সব হারানো জিনিস উদ্ধার ক'রে ফেললে। মন্ত্রীপুত্র আনন্দে রাখালকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। ব'ললে 'তুই কী জন্যে বাজারে এসেছিলি?' রাখাল চিঠি বার ক'রে ব'ললে, 'তোর বাবা এই চিঠি দিয়ে দোকান থেকে মাংস নিয়ে যেতে ব'লেছে।'

মন্ত্রীপুত্র আনন্দে রাখালের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে টেনে এক দৌড়। মাংসের দোকানের দিকে যেতে যেতে চেঁচিয়ে রাখালকে ব'লে গেল, 'তুই আরও খানিকক্ষণ বেশী ক'রে জুয়ো খেলে জুয়াড়ীকে জব্দ ক'রে দে। আমি ততক্ষণে মাংসওয়ালার কাছ থেকে মাংস নিয়ে আসি গে।' দোকানে যেয়ে মন্ত্রীপুত্র মাংস-ওয়ালার হাতে চিঠিটা দিতেই মাংসওয়ালা চিঠিটা প'ড়লে। তারপর তাকে একটা

ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাংসকোটা কলে তাকে পুরে দিলে। মন্ত্রীপুত্র শেষ হ'য়ে গেল।

এদিকে জুয়ো খেলা শেষ ক'রে রাখাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও যখন দেখলে মন্ত্রীপুত্র এল না। তখন সে একাই বাড়ি ফিরে গেল। ভাবলে, মন্ত্রীপুত্র মাংস নিয়ে হয়ত অন্য পথ দিয়ে বাড়ি চ'লে গেছে।

বাড়ি পেঁাছোতেই মন্ত্রী রাখালকে দেখে অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'মাংস কই রে!'

রাখাল ব'ললে, 'কেন? মাংস, দাদা আনেনি?'

মন্ত্রী বললে, 'তুই কোথায় ছিলি?'

রাখাল উত্তর দিলে, 'বাজারে। দাদা সেখানে জুয়ো খেলছিল। সে হেরে যাচ্ছিল ব'লে আমি তাকে জিতিয়ে দিতেই সে আমার কাছ থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে মাংসের দোকানে মাংস আনতে ছুটল। কেন, দাদা কি আসেনি এখনো?' মন্ত্রী হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'ওরে, আমার কী সর্বনাশ হ'ল রে; সে আর নেই রে!'

মন্ত্রীর বাড়িতে হাহাকার উঠল। রাখাল সবকিছু জানতে পেরে মন্ত্রীকে ব'ললে, 'আমি তো বলেছিনু, সোজাপথে গেলে কেউ গর্তে পড়ে না, বাঁকা পথে গেলেই পড়ে। এবার সেকথা বুঝতে পারলে তো?'

মন্ত্রী পুত্রশোকে পাগলের মতো হ'য়ে গেল। আর রাখাল বড়লোক হ'য়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

চালাক তাঁতি

এক দেশে এক তাঁতি ছেল। তাঁতি খুব কুটে। কাজকম্ম না ক'রে শুধু ব'সে ব'সে খেত। তাঁতিবৌ তাঁতিকে খুব গালাগাল দিত। তাইজন্যে তাঁতি তার বৌকে মাঝে মাঝে বেধড়ক মার দিত। মার খেয়ে খেয়ে তাঁতিবৌ তো আধ-মরা হ'য়ে যাবার মতো হ'ল। একদিন তাঁতিবৌ মনে মনে ঠিক করলে, মিন্‌সেকে বিষ খাইয়ে মেরে দোব।

একদিন তাঁতি তার বৌকে খুব মারধোর ক'রে মাঠে চ'লে গেল। মাঠে যাবার আগে বৌকে ব'লে গেল, 'মাঠে জলখাবার নিয়ে যাস্।'

এই সুযোগে তাঁতিবৌ জলখাবারের মুড়িতে বেশ ক'রে বিষ মাকালে। তারপর সেই বিষ-মাকানো মুড়ি গামছায় বেঁধে মাঠে গেল। একটা পুকুরের পাড়ে হাজির হ'ল। সেখানেই তাঁতি কাজ কচ্ছিল। বৌ জলখাবার এনেছে দেখে তাঁতি পুকুরে হাত মুখ ধুতে নামল। ঠিক সেই সময়ে ঐ দেশের রাজার একটা খ্যাপা হাতী

ছুটতে ছুটতে এসে পুকুর পাড়ে হাজির হ'ল। সামনে মুড়ি দেখে হাতীটা তাঁতির মুড়ি খেয়ে ফেললে। বিষ-মাকানো মুড়ি যেই খেলে অমনি হাতীটা টলতে লাগল। তাঁতি হাতমুখ ধুয়ে এসে মুড়ি খেতে যেয়ে দেখলে, হাতীটা তার মুড়ি খেয়ে দিয়েছে। তাঁতি হাতীর কাছে ছুটে যেয়ে রেগে হাতীর গালে এক চড় মেরে দিলে। হাতীটা মরে গেল। হাতীটা কিন্তু ম'ল ঐ বিষ-মাকানো মুড়ি খেয়ে।

এক কান দু'কান হ'তে হ'তে কথাটা রাজার কানে উঠল। রাজা শুনে ভাবলে, সর্বনাশ! এক চড়ে যে আমার হাতী মেরে দিতে পারে সে কত না বড় বীর!

রাজা অনেক লোক পাঠালে তাঁতিকে ধ'রে আনতে। দু'কুড়ি, চারকুড়ি লোক। রাজার লোকেরা তাঁতির বাড়ির কাছে হাজির হ'তেই তাঁতি বুঝতে পারলে, তাকে ধরতে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি তার বৌকে ডেকে ব'ললে, 'আমি যা' দিতে ব'লবো তা'তেই তুই বলবি—দিচ্ছি।'

রাজার লোকেরা যখন তাঁতির বাড়ীর দরজায় এসে গেছে তখন তাঁতি খুব জোরে জোরে বৌকে ব'লতে লাগল, 'আমার জলখাবারের জন্যে আধমন আটার রুটি দিয়ে যা, দশ সের মাংস সবই দিয়ে যাবি, জালায় ক'রে একজালা জল দিবি নাহ'লে আমার হবে না।' তাঁতিবৌ ব'লতে লাগল, 'দিচ্ছি, সব দিচ্ছি।'

রাজার লোকেরা তাঁতির কথা শুনতে পেয়ে খুব ভয় খেয়ে গেল। দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। তাঁতিও তার বৌকে সঙ্গে নিয়ে রাজার লোকেদের পেছনে পেছনে যেতে লাগল। রাজার লোকেরা আলান্ত হ'য়ে একটা পুকুরের পাড়ে ব'সল। একটু দূরে তাঁতি তার বৌকে ব'ললে, 'আমি পুকুরের জলে দলবনে লুকোবো। তুই আমাকে ডাকবি, কোথায় গেলে গো!' তাঁতিবৌ ব'ললে, 'বেশ।'

তাঁতি পুকুরের জলে দলবনের ভেতর গেল। তাঁতিবৌ জোরে ডাকতে লাগল, 'কোথায় গেলে গো!'

তাঁতি দলবনের ভেতর থেকে সাড়া দিলে, 'দলে প'ড়েছি।' এরকম দু'তিনবার বলাবলি হ'ল। তাঁতির গলার স্বর শুনে রাজার লোকেদের খুব ভয় হ'ল। তারা ভাবলে, তাঁতি তাহ'লে তাদের দলের ভেতরেই আছে। এই ভেবে তারা নিজেদের ভেতর মারামারি কাটাকাটি লেগে গেল। শেষে সবাই মরেও গেল। তাঁতি তখন দলবন থেকে উঠে এসে সেই মড়াগুলোকে এককাছে গাদা দিলে। তারপর সেই মড়ার গাদার ওপর বুক ফুলিয়ে ব'সে রইল।

এক কান দু'কান ক'রে রাজার কানে খবর গেল। রাজা ভাবলে, তাঁতি যখন তার সব লোককে মেরে ফেলেছে তখন সে মস্ত বড় বীর। ভয়ে রাজা কাঁপতে লাগল। ভাবলে, এবার তার পালা। এবার নিশ্চয়ই তাঁতি তাকেই মারতে আসবে। এই ভেবে রাজা ঘর-দুয়ার ফেলে অন্য এক রাজ্যে পালিয়ে গেল। আর তাঁতি তার বৌকে নিয়ে ঐ রাজ্যের রাজা হ'য়ে মজাসে সুখে দিন কাটাতে লাগল।

একথা বলি কারে

কোনো সংসারে সাত ভাই একসঙ্গে থাকত। ঘরের টানাটানির জন্যে ছোটভাইকে ঢেঁশকেলে থাকতে হ'ত। পাড়ার লোকে অনেক রাত পর্যন্ত ঢেঁকিতে ধান ভানত, গুঁড়ি ইত্যাদি কুটত। ঢেঁকির পাড়ের দুম্‌দাম্‌ শব্দে ছোটবৌয়ের ঘুমের খুব ব্যাঘাত হ'ত ব'লে সে ভীষণ বিরক্ত। একদিন রাতে ছোঠবৌ স্বামীকে বললে, 'ওগো শুনছো ?'

ছোটভাই ব'ললে, 'কী ?'

ছোটবৌ ব'ললে, 'দিনরাত ঢেঁকির দুম্‌দাম্‌ শব্দে আমার খুবই অসুবিধে হ'চ্ছে। রাতে ঘুমোতে পারছি না। এই ঢেঁশকেলে থাকতে আমি পারবো না।'

ছোটভাই ব'ললে, 'তা আমি কী করতে পারি, বল ?'

ছোটবৌ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ব'ললে, 'আমি এক সংসারে আর থাকতে পারবো না। তুমি তোমার ভায়েদের কাছ থেকে পেথক হ'য়ে যাও। যদি তা না হও তবে কালই আমি বাপেরবাড়ি চ'লে যাবো।'

ছোটকর্তা তখনকার মতো কিছু আর ব'ললে না। চুপ ক'রে রইল।

পরেরদিন সকালে ছোটভাই তার দাদাদের কাছে ব'লে ফেললে, 'আমাকে তোমরা আলাদা ক'রে দাও। আমি পেথক হবো।'

একথা শুনে বড়ভাই রেগে ছোটকে দুড়দাড় ক'রে ঘা কতক পিটিয়ে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে। ছোটবৌও বাপেরবাড়ি চ'লে গেল।

ছোটকর্তা ঘর থেকে বেরিয়ে এদেশ ওদেশ ক'রে দু'বছর বিদেশে কাটিয়ে দিলে। তারপর একদিন বাড়ি ফেরার মনস্থ ক'রলে। ভাবলে, প্রথমে বাড়ি না যেয়ে শ্বশুর-বাড়ি যাওয়া যাক। তারপর সেখান থেকে বাড়ি যাওয়া যাবে।

এই দু'বছরে দাড়ি গোঁফ বেড়ে ছোটকর্তার মুখ ঢেকে গেছে। সে মনে মনে ঠিক করলে, এরকম দাড়ি গোঁফ নিয়েই সে তার শ্বশুরবাড়ি যাবে। দেখা যাক, তার বৌ তাকে চিনতে পারে কি না।

এক ঝাঁকা আম কিনে সেটা মাথায় নিয়ে পথে বেরিয়ে প'ড়ল। ছোটকর্তা ভোল পাল্টে আমওয়ালা হ'য়ে গেল। শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে ঢুকে 'আম নেবে গো' ব'লে হাঁক পাড়তে পাড়তে ঝাঁকামাথায় রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দু'চারজন খদ্দের আম কিনতে এল। কিন্তু আমের দাম বেশী ক'রে বলাতে তারা কেউ আম কিনলে না। শ্বশুরবাড়ির দরজায় হাঁক দিতেই ছোটবৌ ছুটে দরজার বাইরে এল। স্বামীকে সে মোটেই চিনতে পারলে না। ছোটকর্তা কিন্তু এক নজরেই চিনে ফেলেছে।

আমের দাম কমিয়ে ছোটকর্তা ব'ললে, 'গোটা ঝাঁকাটা আমি দেড় টাকায় দোব।'

ছোটবৌ খুশি হ'য়ে সব আম কিনে নিলে। কিন্তু তখনই দাম দিলে না।

ছোটকর্তা ব'ললে, 'সারাদিন ঘুরে ঘুরে আমি বড় আলান্ত হ'য়ে গেছি। আজ তোমাদের এখানে রাতের মতো আমাকে একটু থাকতে দেবে?'

ছোটবৌ ব'ললে, 'তা থাকতে দোবনা কেন? তুমি রাতে এখানেই থাকবে।' এই ব'লে আমগুলো ছোটবৌ বাড়িতে নিয়ে গেল।

রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তেই ছোটবৌ ব'ললে, 'আমওয়ালা, তুমি ঢেঁশকেলে শোওগে।'

আমওয়ালা ছোটকর্তা ঢেঁশকেলে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, বাড়িতেও ঢেঁশকেল আবার এখানেও তাই!

সারা রাতে তার ঘুম আর আসে না। শুয়ে জেগে আছে। ওঠ-বস ক'রছে মাঝে মাঝে।

অনেক রাতে সে দেখলে, একজন লোক দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে। ছোটবৌ উঠে এল। দরজা খুলে দিলে। তারপর ছোটবৌ ও লোকটা একটা ঘরের মধ্যে গল্পগুজব ক'রতে লাগল। তাদের কথাবার্তা শুনে ছোটকর্তা বুঝতে পারলে, লোকটা তারই বৌয়ের উপপতি। কিছু না ব'লে ছোটকর্তা জেগে চুপচাপ শুয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে তামাক খাবার জন্যে লোকটার আগুনের দরকার হ'ল। ছোটবৌ ডাক দিলে, 'ও আমওয়ালা, জেগে আছ?'

ছোটকর্তা শব্দ ক'রলে, 'উঁ'!

ছোটবৌ ব'ললে, 'উনোন থেকে একটু আগুন এনে দাও না?'

ছোটকর্তা ব'ললে, 'আমি পারবো না।'

ছোটবৌ ব'ললে, 'দাও, দাও। তোমাকে দু'আনা পয়সা দোব।'

ছোটকর্তা উঠল। উঠে উনোন থেকে আগুন এনে দিলে। তারপর নিজের জায়গায় যেয়ে শুয়ে প'ড়ল।

কিছুক্ষণ পরে ছোটবৌ আবার ডাক পাড়লে, 'ও আমওয়ালা, জেগে আছ?'

ছোটকর্তা সাড়া দিলে, 'উঁ'!

ছোটবৌ ব'ললে, 'দুয়ারের পাশে ঐ খালি কলসীটা আছে। ওটা ক'রে বাড়ির পাতকুয়ো থেকে এক কলসী জল এনে দাও না?'

ছোটকর্তা ব'ললে, 'পারবো না জল এনে দিতে।'

ছোটবৌ বললে, 'যাও, যাও। তোমাকে আরও দু'আনা পয়সা দোব।'

ছোটকর্তা উঠে কলসী ক'রে পাতকুয়ো থেকে এক কলসী জল এনে দিলে। তারপর আবার শুয়ে প'ড়ল।

সকাল হ'তেই আমওয়ালা ব'ললে, 'কই, আমার টাকা পয়সা মিটিয়ে দাও।'

ছোটবৌ ব'ললে, 'আমওয়ালা, তাহ'লে তুমি মোট কত পাবে ?'

আমওয়ালা ব'ললে, 'আমের দাম দেড়টাকা। আগুন ও জল এনে দেওয়ার জন্যে দু'আনা ক'রে চার আনা। মোট একটাকা বার আনা আমার পাওনা হ'চ্ছে।'

ছোটবৌ একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললে, 'আমওয়ালা, এবারটা তোমায় ধার রাখতে হবে। তুমি তো আবার আম বিক্রি ক'রতে আসবে। ফিরে খেপে তোমার সব দামই আমি মিটিয়ে দোব।'

আমওয়ালাবেশধারী ছোটকর্তা তা'তেই সম্মত হ'য়ে সেখান থেকে বাড়ি আসবার জন্যে বেরিয়ে প'ড়ল।

পথে নাপিতের কাছে দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেললে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে তা'কে দেখতে পেয়ে অনেকেই 'ছোটকর্তা এসেছে, ছোটকর্তা এসেছে' ব'লে তার কাছে এগিয়ে এল। বাড়িতে এসে দাদাদের ও বৌদিদের প্রণাম ক'রলে।

দু'একদিন পরে বৌদিরা ছোটকর্তাকে ব'ললে, 'অনেকদিন পরে উপায়-সুপায় ক'রে বাড়ি এলে। আমাদের খাওয়াতে হবে।'

ছোটকর্তা হেসে ব'ললে, 'তোমাদের নিশ্চয়ই খাওয়াবো। কিন্তু ছোটবৌকে কই তোমরা আনবার নাম ক'রছ না তো ?' বৌদিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রতে লাগল, 'সত্যিই তো বটে ! ছোটবৌকে আনবার ব্যবস্থা ক'রতেই হবে।'

পরের দিন লোক পাঠিয়ে ছোটবৌকে তার বাপেরবাড়ি থেকে আনানো হ'ল।

ছোটকর্তা বাড়ির মেয়েদের প্রত্যেকের হাতে দু'টো ক'রে টাকা দিয়ে ব'ললে, 'এই নাও। তোমরা মিষ্টি খাবে।'

ছোটবৌকে সে দিলে মাত্র চার আনা। কারণ মনে মনে হিসেব করে দেখলে, আমের দাম দেড়টাকা। আগুন ও জল এনে দেওয়ার জন্যে চার আনা। মোট একটাকা বার আনা তার কাছে পাওয়া যাবে। ছোটবৌকে মাত্র চার আনা দেওয়ায় বৌদিরা ছোটকর্তাকে ব'ললে, 'আমাদের দু'টাকা ক'রে দিলে আর ছোটবৌকে মাত্র চার আনা কেন ?'

ছোটকর্তা ব'ললে, 'একথা বলি কারে।'

মেয়েরা যতবার তাকে জিজ্ঞেসা করে, 'মাত্র চার আনা দিলে কেন ?' সে ততবারই বলে, 'একথা বলি কারে।'

এরকম ব'লতে ব'লতে ছোটকর্তার মাথা খারাপের মতো হ'য়ে গেল। দিনরাত শুধু তার মুখ দিয়ে বার হ'তে লাগল, 'একথা বলি কারে।'

গ্রামের পাশেই ছিল রাজবৈদ্য। সে সব শুনে ব'ললে, 'ওকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও। আমি ভাল ক'রে দোব।'

সবাই মিলে ছোটকর্তাকে ধ'রে-বেঁধে রাজবৈদ্যের বাড়িতে দিয়ে এল।

ছোটকর্তা রাজবৈদ্যের বাড়িতে থাকতে লাগল। সেখানে থাকতে থাকতে ছোটকর্তা

লক্ষ্য ক'রলে, বৈদ্যের বৌয়ের একজন উপপতি আছে। বৈদ্য যখন বাড়িতে থাকে না উপপতি তখন বৈদ্যের বাড়িতে এসে তার বৌয়ের সঙ্গে ব'সে গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা করে।

একদিন রাজবৈদ্য ছোটকর্তাকে ব'ললে, 'এখন কেমন আছ ?'

ছোটকর্তা ব'লতে আরম্ভ ক'রলে,

'একথা বলি কারে,
সেকথা বোদ্যির ঘরে।'

রাজবৈদ্য কিছুই বুঝতে পারলে না।

কিছুদিন পরে ছোটকর্তার অসুখের কথাটা রাজার কানে উঠল। রাজা রাজ-বৈদ্যকে ডেকে ব'ললে, 'ওকে যখন তুমি সারাতে পারলে না তখন এক কাজ কর।'

রাজবৈদ্য ব'ললে, 'বলুন মহারাজ, কী করতে হবে।'

রাজা ব'ললে, 'ওকে আমার রাজবাড়িতে নিয়ে এস। তারপর আমার 'হিমালা'র মধ্যে পুরে দাও। ঠাণ্ডায় ও' ভাল হ'য়ে যাবে।'

রাজার কথামতো তা-ই করা হ'ল।

রাজবাড়ির অন্দরে হিমালার মধ্যে ছোটকর্তা থাকে। হিমালার মধ্যে থাকতে থাকতে একদিন ছোটকর্তা লক্ষ্য ক'রলে, রাণীরও একজন উপপতি আছে। রাজা তার কিছুই জানে না। রাজা যখন শিকারে বা অন্যকাজে বাইরে যায় তখনই রাণীর উপপতি রাজবাড়ির অন্দরে রাণীর সঙ্গে মেলামেশা করে। রাজা অন্দর মহলে আসার আগেই রাণী তার উপপতিকে একটা বাক্সের মধ্যে পুরে তালাচাবি দিয়ে লুকিয়ে রাখে।

একদিন রাজা হিমালার পাশে এসে ছোটকর্তাকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কিহে ছোকরা, এখন কেমন আছ, বল ?'

ছোটকর্তা ব'লতে লাগল,

'একথা বলি কারে,
সেকথা বোদ্যির ঘরে।
মাণিক জ্বলে রাজার ঘরে।'

অবাক হ'য়ে রাজা ছোটকর্তাকে ব'ললে, 'তুমি যেকথা ব'ললে তার কী অর্থ তা' আমাকে ব'লতে হবে।'

ছোটকর্তা ব'ললে, 'মহারাজ, আমার জীবনের আর মায়া নেই। নিশ্চয়ই একথার অর্থ আপনাকে আমি ব'লবো। তবে আপনার বোদ্যিকে এখানে ডেকে আনতে হবে।'

রাজা তাই করলে। রাজার ডাকে রাজবৈদ্য রাজবাড়িতে এসে গেল।

ছোটকর্তা প্রথমে রাজবৈদ্যের বৌয়ের উপপতির কথা ব'ললে। সেকথা শুনে বৈদ্য তো রেগে লাল। ব'ললে, 'আমার বৌয়ের মতো ভাল মেয়ে সচারাচর হয় না। আর তুমি মিথ্যে ক'রে কীসব ব'লছ ?'

ছোটকর্তা হেসে ব'ললে, 'আপনি শুনতে চা'ন, না দেখতে চা'ন ?'

রাজবদ্যি ব'ললে, 'বেশ। আমি দেখতেই চাই।'

ছোটকর্তা ব'ললে, 'তা হ'লে এক কাজ করুন। আমাকে যে-ঘরে রেখেছিলেন আপনি সেই ঘরে লুকিয়ে থাকুন গে। তাহ'লেই সব দেখতে পাবেন।'

রাজবৈদ্য তাই ক'রলে। সব দেখে রাজার কাছে এল। রাজা জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'বোদ্যিমশাই, কী দেখলেন ?'

রাজবৈদ্য ব'ললে, 'হ্যাঁ মহারাজ, ঐ পাগলা ছোকরা যা' যা' বলেছে সবই সত্যি।'

রাজা এবার ব'ললে, 'মাণিক জ্বলে রাজার ঘরে— একথার অর্থ কী ?'

ছোটকর্তা রাণীর উপপতির কথা রাজাকে জানালে। রাজা ভীষণ রেগে গেল। ব'ললে, 'যদি তাই হয়, তবে নিজের চোখে আমি তা দেখতে চাই।'

ছোটকর্তা ব'ললে, 'বেশ, তাই দেখুন। আপনি ঐ হিমালার মধ্যে লুকিয়ে থাকুন। আর রাজবাড়িতে মিথ্যে ক'রে জানিয়ে দিন, আপনি শিকারে গেছেন। দু'চারদিন নাও ফিরতে পারেন।'

সে-ব্যবস্থাই হ'ল। হিমালার মধ্যে লুকিয়ে থেকে রাজা সব দেখলে। ছোট-কর্তাকে রাজা ব'ললে, 'তুমি যা' ব'লেছিলে তা' আমি দেখেছি। সবই সত্যি।'

ছোটকর্তা ব'ললে, 'মহারাজ, এখনো সবকথা শেষ হয়নি। আমার নিজের কথা তো শুনলেন না কেউ !'

রাজা ব'ললে, 'তোমার আবার কী কথা ?'

ছোটকর্তা তার নিজের বৌয়ের কাহিনী রাজাকে শোনালে। রাজা সব শুনে ছোটকর্তাকে ব'ললে, 'আমি বিচার ক'রবো।'

ছোটকর্তা হেসে ব'ললে, 'কী আর বিচার ক'রবেন, মহারাজ ?'

রাজা ব'ললে, 'দেখই না, কী বিচারটা করি।' এই ব'লে রাজা লোক পাঠিয়ে বোদ্যি-বৌ, বোদ্যিবৌয়ের উপপতি এবং ছোটবৌ ও ছোটবৌয়ের উপপতিকে রাজ-বাড়িতে নিয়ে এল।

এবার রাণীর কাছে যেয়ে রাজা ব'ললে, 'তোমার ঘরে ঐ যে বড় চৌকো বাস্‌কোটা আছে, ওটা খোল।'

রাণী ঝাঁঝিয়ে ব'ললে, 'ওটা আবার তোমার কী দরকার হ'ল ? বাস্‌কো আমি খুলবো না। ওটা আমার বাবা আমাকে দিয়েছে।'

রেগে রাজা চেঁচিয়ে ব'ললে, 'শীগ্‌গির খোল ব'লছি। নইলে বাস্‌কোকে চুটিয়ে খান্‌খান্‌ ক'রে ফেলবো আর তোমাকেও কেটে দু'ফাঁক ক'রে দোব।'

রাণী ভয়েময়ে বাস্‌কোর চাবি খুলে দিলে। বাস্‌কোর ডালাটা তুলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাণীর উপপতি। সবাই দেখলে, রাণীর উপপতি— সহরকোটাল।

রাজার হুকুমে রাজবাড়ির ভেতর বিরাট একটা গর্ত কাটা হ'ল।

ছোটবৌ, বোদ্যি-বৌ, রাণী আর তাদের প্রত্যেকের উপপতি মোট ছ'জনকে গর্তের কাছে নিয়ে যেয়ে রাজা ব'ললে, 'বিদেশ থেকে আমার প্রচুর ধন দৌলত জাহাজে ক'রে আসছে। সে সবই আমি এই গর্তের মধ্যে পুঁতে রাখবো। তোমরা ছ'জন নেমে দেখ, কেমন হ'য়েছে গর্তটা।'

তারা ছ'জন ভয়ে ভয়ে গর্তে নামল। রাজা গর্তের ওপর থেকে ব'ললে, 'গর্তটা কেমন হয়েছে ?'

তারা ব'ললে, 'ভালই হ'য়েছে।'

রাজার ইঙ্গিতে রাজার লোকেরা সেই ছ'জনকে তাড়াতাড়ি মাটি চাপা দিয়ে দিলে। ছ'জনেই গর্তের মধ্যে চ'পা প'ড়ে শেষ হ'য়ে গেল।

ছোটরাণীর হিংসা

এক রাজার দুই রাণী ছিল। রাজা ছোটরাণীর চাপে প'ড়ে বড়রাণীকে বনবাসে পাঠালে। কিন্তু রাজা রাজবাড়ির সবাইকে ব'লে দিলে, 'বড়রাণীকে যেন প্রত্যেক দিন ভাল খাবার ও ঠিকমতো কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' ছোটরাণী কিন্তু হিংসে করে। রাজবাড়ির চাকরকে দিয়ে খারাপ খাবার এবং ছেঁড়া কাপড় ছোটরাণী পাঠায়। রাজা জানতেও পারে না। একদিন রাজার মন্ত্রী বনে বড়রাণীর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলে, বড়রাণী ছড়া কাটছে—

'চেঁদো মাছ, বেগুনের খাড়া,
পণ পালি খুদ, পুর পুর ন্যাকড়া।'

মন্ত্রী কথাটা রাজাকে যেয়ে বলাতে রাজা বনে বড়রাণীর কাছে এল। তাকে ব'ললে 'মন্ত্রীকে শুনিয়ে অমন কথা ব'লেছ কেন ?'

বড়রাণী ব'ললে, 'আমার জন্যে ছোটরাণী চাঁদামাছ, বেগুনের বোঁটা, খুদ পাঠিয়ে দেয় তাই সেদ্ধ ক'রে খেতে হয়। আর কাপড়ের বদলে যে পচা ন্যাকড়া দেয় তা' দু'দিনে পুর পুর ক'রে ছিঁড়ে যায়।'

এ-কথা শুনে রাজা খুব রেগে গেল। রাজবাড়িতে ফিরে যেয়ে কাউকে কিছু না ব'লে একটা বড় গর্ত কাটালে। ছোটরাণীকে সেই গর্তের কাছে নিয়ে যেয়ে ব'ললে, 'ছোটরাণী, আমাদের রাজবাড়িতে ডাকাতি হবে। তাই সব গয়না এই গর্তের মধ্যে পুঁতে দিতে হবে। এখন উঁকি মেরে দেখ, গর্তটা কেমন হয়েছে।' রাজার কথায় রাণী যে-ই গর্তে উঁকি মারতে গেল অমনি রাজা তা'কে ঠেলে ফেলে দিলে। রাজার আদেশে লোকজন ছোটরাণীকে মাটি চাপা দিয়ে দিলে। সে ম'রে গেল। এবার রাজা বড়রাণীকে বাড়িতে নিয়ে এসে সুখে বাস করতে লাগল।

জন্মবার্তা

কোনো দেশে এক রাজা ছিল। বড়রাণী মারা যাবার পর রাজা আবার বিয়ে ক'রলে। ছোটরাণী খুব জাঁহাবেজে। ছোটরাণীর বাপ-মায়ের অমতে ভগ্নীপতিই তার শালীর সঙ্গে রাজার বিয়ে দিয়েছিল। সেজন্যে রাজা কোনোদিন শ্বশুরবাড়ি যেত না। আর ছোটরাণী আলে-কালে গেলেও বাপেরবাড়িতে থাকত না। ভগ্নীপতির বাড়িতে দু'একদিন থেকেই চ'লে আসত।

বিয়ের বহুদিন পরে ছোটরাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রলে। রাজা পুত্র-লাভ ক'রে খুব আনন্দিত। রাজবাড়িতে উৎসব শুরু হ'য়ে গেল। এই সুসংবাদ আত্মীয়, বন্ধুদের জানাবার জন্যে রাজা কালি-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে ব'সল। তাই দেখে রাণী ব'ললে, 'আজ এই শুভ দিনে তুমি কালির আঁচড় কাটছো?' রাজা একটু হেসে ব'ললে, 'পুত্রলাভের সংবাদটা জানিয়ে দিতে হবে না? তাই চিঠি লিখতে ব'সেছি।'

রাণী জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কোথায় কোথায় চিঠি লিখছো গা?' রাজা ব'ললে, 'অনেক গাঁয়ে। বহু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীর-স্বজনকে চিঠি লিখছি।'

রাণী জিদ্ ধ'রলে, 'বলই না, কোন্ কোন্ গাঁয়ে চিঠি লিখছো?' রাজা গাঁয়ের নামগুলো ব'লতে লাগল,

'ওঁকপুর, ঢোঁকপুর,
শিয়াখালা, বোদ্যিপুর,
লক্ষ্মীছাড়া ভগবানপুর,
আন্দ্রা, খাঁন্দ্রা, নাচুনে, পাটুনেপাটি, শড়পে।
ইলশড়া, বিলশড়া,
শোড্ডে, শিংপাড়া,
ধুলুক, মুইদারা,
রিয়া, রয়ান, ভুরকুণ্ড,
আগাই, গোটাই, সাতখণ্ড।
চাকদলদল, বাদলপুর,
হীরেগাছি, বাঁমশোর,
শুকুড়, কুশো, করাতপুর,
রাইবাগনে, মির্জেপুর,
ধনেখালি, মাদপুর,
কালনা, জামালপুর,

হীট্টে, শংকরপুর,
এ'টেকাটা, দেবীপুর,
সগড়াই, পোলেমপুর,
বাঁধগাছা, হরিপুর,
নতু আর মোহনপুর।
বাড়ি আমার বিরুপুর,
গুরু আমার রতন পোড়েল গায়েন ঠাকুর।'

রাণী শুনে ব'ললে, 'বাব্‌বা! এত গাঁয়ে তুমি খবরটা জানাবে?' রাজা ব'ললে, 'আর কোথাও খবরটা দোব না।' রাণী রেগে ব'ললে, 'আমার বাপের বাড়ির কথা তো কই ব'ললে না? সেখানে বুঝি খবর দেবার কথা মনে হচ্ছে না?' রাজা ব'ললে, 'সেখানে খবরটা দিই কী ক'রে বল? তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটা তো তোমার জামাইবাবু দিয়েছে। তাকে খবরটা দেওয়া যেতে পারে। তোমার বাপ-মা বা দাদাকে খবর দেবার সাহস আমার নেই।' রাণী ব'ললে, 'বেশ, আমিই লোক পাঠাবো। সে-লোক আমার জামাইবাবুকে এবং বাপের বাড়িতে খবরটা দিয়ে আসবে। তুমি লোক ঠিক ক'রে দাও।'

রাজা ব'ললে, 'তা অবশ্য আমি দিচ্ছি।'

রাণীর আত্মীদের খবর পাঠাবার জন্যে রাজা এক নাপিত আর এক ধোপাকে ঠিক ক'রলে। রাণী তাদিকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিলে। নাপিত আর ধোপা হাসিমুখে বেরিয়ে প'ড়ল।

প্রথমে তারা রাণীর জামাইবাবুর বাড়িতে যেয়ে হাজির হ'ল। সংবাদটা দিতেই রাণীর দিদি ও জামাইবাবু খুশি হ'ল। ধোপা আর নাপিতকে প্রচুর টাকাকড়ি, সোনাদানা দিলে। সেগুলো গামছায় বেঁধে নিয়ে রাণীর জামাইবাবুর বাড়ি থেকে রাণীর বাপের বাড়ির দিকে যাত্রা ক'রলে।

রাণীর বাপের বাড়ির গাঁয়ের ধারে এসে একজন লোককে দেখতে পেয়ে নাপিত জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'ও ভাই, অমুক রাজার শ্বশুরবাড়িটা কোন্‌খানে?'

লোকটি ব'ললে, 'তোমরা কে? কী জন্যে এখানে এসেছো?'

নাপিত আর ধোপা ব'ললে সবকথা।

ঐ লোকটিই ছোটরাণীর দাদা। সে ব'ললে, 'আমিই তোমাদের রাণীর দাদা।' ধোপা, নাপিত দুজনেই রাণীর দাদাকে প্রণাম ক'রলে। রাণীর দাদা ব'ললে, 'তাহ'লে তোমরা খবরটা আমার আর এক ভগ্নীপতিকে দিয়ে আসছো?'

তারা ব'ললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

রাণীর দাদা ব'ললে, 'তা বেশ ক'রেছো। আমার ভগ্নীপতি তোমাদের কিছু দিলেটিলে?'

ধোপা ব'ললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের দু'জনকেই প্রচুর টাকাকড়ি, সোনাদানা

দিয়েছে। এই দেখুন না, গামছায় বাঁধা আছে।' এই ব'লে ধোপা গামছাটা রাণীর দাদার সামনে তুলে ধ'রলে।

রাণীর দাদা ব'ললে, 'তোমাদিকে আর রাজবাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না। তোমরা ঐ দূরে বটগাছটার ছায়ায় ব'স। আমি বাড়ি যেয়ে বাবা-মাকে খবরটা দিইগে। একটু পরেই চারজন লোককে দিয়ে তোমাদের জন্যে অনেক কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা এখান থেকেই ফিরে তোমাদের রাজার কাছে চ'লে যাবে।' এই ব'লে রাণীর দাদা বাড়ির দিকে চ'লে গেল। নাপিত ও ধোপা বটগাছের ছায়ায় ব'সে ব'সে বিশ্রাম ক'রতে লাগল।

রাণীর দাদা ও বাবা ভীষণ বদমায়েশ লোক। রাণীর দাদা বাড়ি যেয়ে চারজন লেঠেলকে ব'ললে, 'তোরা এক্‌খুনি মাঠের ঐ বটতলায় চ'লে যা। দেখবি, দু'জন লোক সেখানে ব'সে আছে। তাদের কাছে গামছায় বাঁধা প্রচুর সোনাদানা আছে। তাদিকে আচ্ছা ক'রে ঘা কতক দিয়ে সেগুলো নিয়ে চ'লে আয়। দেখিস তাদিকে যেন একেবারে মেরে ফেলিস না।'

চারজন লেঠেল চারটে খেঁটে নিয়ে ছুটল বটতলার দিকে। খেঁটে-হাতে চারজনকে দেখেই নাপিত বটগাছের ওপর উঠে প'ড়ল। কিন্তু ধোপা নীচেতে ব'সে রইল। সে নাপিতকে ব'ললে, 'তুই খুব ভীতু। ওরা হয়ত দামী দামী কিছু আমাদের জন্যে নিয়ে আসছে। তাই সঙ্গে লাঠি নিয়েছে।'

নাপিত মুখে একটি কথাও ব'ললে না। পাতার আড়ালে চুপচাপ ব'সে রইল।

লেঠেল চারজন ছুটে এসেই ধোপাকে দুড়্‌দাড়্‌ ক'রে পিটতে লাগল। ধোপা 'বাবাগো', 'মাগো' ব'লে চীৎকার শুরু ক'রে দিলে। লেঠেলদের মধ্যে একজন ব'ললে, 'আর এক শালা কই?'

ধোপা কাঁদতে কাঁদতে বটগাছের ওপরের দিকে চাইতেই লেঠেলরা গাছের ওপর নাপিতকে দেখতে পেলে। একজন লেঠেল তাড়াতাড়ি গাছে উঠে প'ড়ল। তারপর নাপিতের ঠ্যাং ধ'রে হড়্‌হড়্‌ ক'রে নীচে নামিয়ে আনলে। এবার শুরু হ'ল নাপিতকে মার। মার তো মার, একেবারে আধমরা ক'রে ফেললে।

এবার লেঠেলরা গামছায় বাঁধা টাকাকড়ি, সোনাদানা নিয়ে চ'লে গেল। আর নাপিত, ধোপা গাছতলায় প'ড়ে প'ড়ে কাতরাতে লাগল।

বহুক্ষণ পরে দু'জনে উঠল। তারপর অতিকষ্টে চ'লতে শুরু ক'রলে। তাদের এমন অবস্থা হ'ল যে, রাজবাড়িতে এসে যখন তারা পেঁছিল তখন তাদের ওঠা-বসা করবার, এমনকি কথা বলারও ক্ষমতা নেই।

রাজা নাপিত ও ধোপাকে ব'ললে, 'কী হ'ল তোদের? তোরা অমন ক'চ্ছিস কেন?'

নাপিত অতিকষ্টে ব'ললে, 'রাজামশাই, আপনার বড় সম্বন্ধি আমাদের বিদেয় দিয়েছে।'

রাজা হেসে ব'ললে, 'খুব খাওয়া-দাওয়া করিয়েছে বোধহয়? তাই নড়তে পাচ্ছিস না।'

নাপিত ব'ললে, 'এমন খাওয়া খাইয়েছে, মহারাজ, আমাদের গা-গতরের আর আদায়বস্তু রাখেনি।'

রাজা ব'ললে, 'সেকি রে! কী হ'য়েছে তোদের?'

এবার দু'জনে কষ্টেসষ্টে মাটিতে ব'সে রাজাকে একটি একটি ক'রে সব ঘটনা ব'ললে। রাজা শুনে খানিকক্ষণ চুপচাপ ব'সে রইল। তারপর তাদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর'লে।

নাপিত রাজাকে ব'ললে, 'আমরা বাড়ি যাবো, মহারাজ।'

রাজা ব'ললে, 'তোদের রাণীমাকে তোরা কিছু খবর জানিয়ে যাবি না?'

নাপিত ব'ললে, 'না মহারাজ। এসব কথা ব'লতে রাণীমার কাছে আমরা কিছুতেই যাবো না।'

রাজা ব'ললে, 'কেন?'

নাপিত ব'ললে,

'একই বংশের,
একই লাউয়ের বীজ, একই ধানের শিষ।
দাদা দিয়েছে লাঠিপড়া,
এবার শতমুখী দিয়ে বোন ঝাড়বে বিষ॥'

ধোপা চুপ ক'রেই ছিল এতক্ষণ। সে ব'ললে, 'মহারাজ, আপনি যাহোক ব'লে দেবেন। আমরা চলনু।' এই ব'লে নাপিত ও ধোপা বাড়ি চ'লে গেল। আর রাজাও রাণীকে কিছু জানালে না। রাণীও ঘটনার কিছু জানতে পারলে না। দু'একদিন পরে রাজা ধোপা ও নাপিতের বাড়িতে টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিলে। কারণ, তাদের বড় কষ্ট হ'য়েছিল। নাপিত আর ধোপা রাজার কাছ থেকে টাকাকড়ি পেয়ে আনন্দে সব কষ্ট ভুলে গেল।

আজ বড়া খুপ

এক ছিল রাজা আর ছিল তার মন্ত্রী। একদিন গরমকালের দুপুরবেলায় মন্ত্রীর খুব জলতেষ্টা পেয়ে গেল। সে গুটিগুটি ক'রে যেয়ে রাজার ঘোড়ার কোচয়ানের ঘরে ঢুকে তার কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেলে।

এদিকে দূর থেকে রাজা কোচয়ানের কলসীর জল খেতে মন্ত্রীকে দেখলে।

মন্ত্রী রাজার কাছে আসতেই রাজা তাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললে, 'মন্ত্রী, আজ বড়া ধূপ।'

রাজার কথাটার মানে মন্ত্রী বেশ বুঝতে পারলে না। তাই রাজাকে কিছু ব'ললেও না।

রাজা প্রতিদিন মন্ত্রীকে দেখে ঐ একই কথা বলে, 'মন্ত্রী, আজ বড়া ধূপ।'

মন্ত্রী একদিন তার বৌকে সব কথা ব'ললে। বৌকে জিজ্ঞেসাও ক'রলে, 'আচ্ছা প্রতিদিন রাজা একথা কেন আমাকে শোনায় তা তুমি বলতে পারো?'

মন্ত্রীর বৌ বল'লে, 'কিছু বুঝতে পারছি বৈকি।'

মন্ত্রী ব'ললে, 'কী?'

মন্ত্রীর বৌ মাথা নেড়ে ব'ললে, 'তা তোমাকে আমি এখন ব'লবো না। তুমি এক কাজ কর।'

মন্ত্রী ব'ললে, 'কী কাজ, বল। তুমি যা ব'লবে আমি তাই ক'রবো।'

বৌ ব'ললে, 'তুমি ছেঁড়া আর কালো জামা-কাপড় পরো। তারপর মুখে বেশ ক'রে চুণ-কালি মাখো।'

বৌয়ের কথামতো মন্ত্রী তাই ক'রলে।

এবার বৌ মন্ত্রীকে ব'ললে, 'তুমি সোজা রাজার পায়খানা ঘরে যেয়ে লুকিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাকগে। যেই রাজা পায়খানা ব'সতে ঘরের মধ্যে ঢুকবে অমনি তুমি তার দু'গালে চার চড় মেরে ছুটে পালিয়ে আসবে।'

বৌয়ের কথায় মন্ত্রী কালো ছেঁড়া জামাকাপড় প'রে রাজার পায়খানা ঘরে চুপটি ক'রে ব'সে রইল।

সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় রাজার খুব পায়খানা চাপল। তাড়াতাড়ি রাজা পায়খানা ঘরে যেয়ে ঢুকল। ঢুকতেই মন্ত্রী রাজার দু'গালে চার চড় ক'ষে দিলে। রাজা চীৎকার ক'রতে লাগল। মন্ত্রী রাজাকে চড় মেরেই এক ছুটে ঘর পালিয়ে গেল। ঘরে যেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বৌকে মন্ত্রী ব'ললে, 'তোমার কথায় কাজ তো হ'ল। এবার কী হবে?'

বৌ ব'ললে, 'তাহ'লে রাজার দু'গালে চার চড় বসিয়ে দিয়ে এসেছ তো?'

মন্ত্রী ব'ললে, 'হ্যাঁ, সে যা' চড় ক'ষেছি রাজার অনেকদিন মনে থাকবে। কিন্তু এবার? এবার কী হবে বল?'

বৌ ব'ললে, 'কিছু ভেবো না। এবার রাজা যখন তোমাকে দেখে ব'লবে, মন্ত্রী, আজ বড়া ধূপ, তুমি সঙ্গে সঙ্গে রাজাকে ব'লবে, মহারাজ, পায়খানামে কেয়া ভূত। তারপর রাজা যা' করবার ক'রবে।'

বৌয়ের কথা শুনে মন্ত্রীর কেমন যেন ভয় ভয় ক'রতে লাগল। তবুও মনে মনে ঠিক ক'রলে রাজাকে সে তাই-ই ব'লবে। পরের দিন মন্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে রাজা ব'ললে, 'আজ বড়া ধূপ।' সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী রাজাকে ব'ললে, 'মহারাজ,

পায়খানামে কেয়া ভুত।' একথা শুনে রাজা মন্ত্রীর মুখের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর মন্ত্রীকে ব'ললে, 'মন্ত্রী, তুমিও চুপ আর আমিও চুপ।'

মন্ত্রী ব'ললে, 'এ-কথার অর্থ ?'

রাজা ব'ললে, 'মন্ত্রী, তুমিও ব'লো না পায়খানায় আমি চড় খেয়েছি, আর আমিও ব'লবো না যে, তুমি কোচয়ানের কলসীর জল খেয়েছ।'

মন্ত্রী মনে মনে হেসে ব'ললে, 'তাই হবে, মহারাজ।'

তারপর যে যার কাজে চ'লে গেল।

বুদ্ধিমান মূর্খের জয়

এক দেশে এক রাজা ছিল। সেই রাজার একমাত্র মেয়ে পণ ক'রেছিল, যে তাকে কথায় হারাতে পারবে তাকেই সে বিয়ে ক'রবে। আর যার কথার মানে রাজকন্যা শোনামাত্রই ব'লে দেবে তাকে পরাস্ত হ'য়ে রাজকন্যার বাপের বাড়িতে গোলামী ক'রতে হবে।

রাজার আদেশে রাজকন্যার পণের কথা রাজ্যময় ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

একরাজ্য থেকে অন্যরাজ্যে কথাটা পরপর চারিয়ে গেল। পণের কথায় একে একে বহু রাজপুত্র নানা রকম রহস্যের কথা শোনাতে রাজকন্যার কাছে এল। কিন্তু তাদের সবার কথার মানেই রাজকন্যা সঙ্গে সঙ্গে ব'লে দিলে। সর্ত মতো রাজকুমাররা বন্দী হ'য়ে রাজকন্যার বাপের বাড়িতে গোলামী ক'রতে লাগল।

এক দেশে এক মূর্খ ছোকরা ছিল। এক কান দু'কান ক'রে রাজকন্যার পণের কথা সেই মূর্খ ছোকরার কানে পেঁছিল। সে মনে মনে ভাবলে, বিদ্যে-টিদ্যে তার নেই। আর পয়সাকড়িও নেই। তবুও তাকে রাজকন্যার কাছে কথা শোনাতে যেতে হবে। পথে যেতে যেতে যা ঘ'টবে তা-ই সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজকন্যাকে ব'লবে। তা'তে তার ভাগ্যে যা' আছে তা' হবে।

নানা রকম ভাবতে ভাবতে রাজকন্যার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে মূর্খ ছোকরা পথে বেরিয়ে প'ড়ল।

খুব রোদ হ'য়েছে। মূর্খ ছোকরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েই ছাতাটা ফুটিয়ে মাথায় দিলে। ছাতাটা মাথায় দিয়েই ভাবছে, ছাতাটা তো বেশ ঘরের মতো! তাহ'লে এবথাও তো রাজকন্যাকে বলা যেতে পারে, ঘর থেকে বেরিয়েই ঘর।'

কথাটা ভাবতে ভাবতে মূর্খ ছোকরা পথ চ'লছিল। সে দেখলে, অনেকগুলো রাখাল ছেলে মাঠের মধ্যে গরু-মোষ ছেড়ে দিয়ে তীর ছোঁড়াছুঁড়ি খেলছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা কিছুক্ষণ দেখলে। দেখতে দেখতে একটা তীর তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে শোঁ ক'রে গ'লে চ'লে গেল। অমনি সে ভাবলে, যাক, দু'টো কথা আমার ঠিক হ'য়ে গেল,

ঘর থেকে বেরিয়েই ঘর,
দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গেল শর।

কথা দু'টো ভাবতে ভাবতে মূর্খ ছোকরা আবার পথ চ'লতে লাগল। কিছুদূর যাবার পর সে দেখতে পেলে, একটা জমিতে খুব তরমুজ-কাঁকুড় ফলেছে। আর চাষী সেই জমির মাঝখানে একটা খুঁটোর মাথায় একটা মরা গরুর মাথা দিয়ে রেখেছে। আর সেই গরুর মাথার চোখের কোটরে পাখীতে বাসা ক'রেছে। চোখের কোটরে পাখীর বাসা দেখে তার মনে হ'ল, এও তো একটা কথা হ'তে পারে,

আঁখিয়ার ভেতর পাখিয়ার বাসা।

তরমুজ-কাঁকুড়বাড়ির ধার থেকে আবার সে অন্যপথ ধ'রলে। কিছুদূর যাবার পর দেখলে, এক চাষা খালের ধারে একটা পোঁয়া পুঁতে তা'তে একটা বাঁশ দিয়েছে। আর সেই বাঁশের একদিকে একটা দুনি বেঁধে খাল থেকে জল ছেঁচছে। জল ছেঁচার সব ব্যাপারটা দেখতে ত্রিশূলের মতো লাগছে।

মূর্খ ছোকরা ভাবলে, পাখীর বাসা আর চাষার জল ছেঁচা—এও তো বেশ দু'টো কথা হ'তে পারে। এই ভেবে সে মনে মনে ঠিক ক'রে রাখলে,

আঁখিয়ার ভেতর পাখিয়ার বাসা,
জলকে তিরশূল ক'রছে চাষা।

আরও অনেককিছু দেখতে দেখতে মূর্খ ছোকরা বহুদূর চ'লে এল। সূর্য্যি ডুবে গেল। অন্ধকার হ'য়ে আসছে দেখে এক গাঁয়ে এক বুড়ীর ঘরে সে আশ্রয় নিলে। বুড়ী একা। তার ঘরে আর কেউ নেই। খুব যত্ন ক'রে ছেলের আদরে বুড়ী তাকে রাতে খাওয়ালে এবং একটা ঘরে বিছানা ক'রে শুতে দিলে।

রাতে বিছানায় শুয়ে মূর্খ ছোকরার ঘুম আর আসে না। শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবছে। অনেক রাতে দেখছে, যে ঘরটায় সে শুয়েছে সেই ঘরের শাঁওায় একটা শিকে ঝুলছে। আর সেই শিকেতে একটা ছোট জামবাটিতে বুড়ী দুধ রেখেছে। একটা ইঁদুর দুধের জামবাটিতে মাঝে মাঝে মুখ ডুবিয়ে দুধ খাচ্ছে। আর ঠিক তার নীচে মেঝেয় মাটিতে একটা বেড়াল শিকের বাটি ও ইঁদুরের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে, শিকেটা কোনোরকমে ছিঁড়ে গেলেই দুধ ও ইঁদুর দু'-ই খাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে ইঁদুরটা শিকের দড়ি কেটে দিতেই জামবাটিটা প'ড়ল বেড়ালের

মাথায়। অমনি বেড়ালটা ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে ম'রে গেল। তাই দেখে মূর্খ ছোকরা বিছানায় শুয়ে মনে মনে ভাবলে, ই'দুরের কারণে বেড়ালের মরণের কথাটা একটু হেরফের ক'রে রাজকন্যাকে সে ব'লবে।

সকালে বিছানা ছেড়ে বুড়ীর কাছে বিদেয় নিয়ে আবার রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ল। অনেক গাঁ-গেরাম, নদী-নালা, খাল-বিল পেরিয়ে এসে হাজির হ'ল রাজকন্যার বাপের বাড়ির দরজায়।

সংবাদ পেয়ে রাজকন্যা লোক পাঠিয়ে নতুন ছোকরাকে অন্দরে নিয়ে এল। কিছু জল-টল খেতেও দিলে।

সখীরা মূর্খ ছোকরার ভাবভঙ্গি দেখে মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। কিন্তু ছোকরার চেহারাটা বেশ নাদুস-নুদুস। রাজকন্যা ইসারা ক'রে সখীদের জানিয়ে দিলে, তা'রা যেন কোনোরকম অভদ্র ব্যবহার না করে।

এক সময় রাজকন্যা ছোকরাকে ব'ললে, 'এখানে এসেছো বেশ ক'রেছো। আমার পণের সবটুকু জেনে এসেছো তো?' মূর্খ ছোকরা জবাব দিলে, 'আমি সব জেনে তবেই এসেছি।' রাজকন্যা এবার ব'ললে, 'বলো, কী কথা আমাকে ব'লতে চাও।' মূর্খ ছোকরা রাজকন্যার মুখপানে চেয়ে ব'ললে, 'কথা আমার বিশেষ কিছু নেই। তবে ঘর থেকে বেরিয়ে এই রাজবাড়িতে আসার পথে অনেক কিছু নজরে প'ড়ল। সেগুলোই ব'লে যাচ্ছি। অর্থটা ভেঙে আমাকে ব'লতে হবে।' রাজকন্যা ব'ললে, 'বেশ বলো, কী তুমি দেখেছো?' মূর্খ ছোকরা আরম্ভ ক'রলে,

'ঘর থেকে বেরিয়েই ঘর।
দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে গেল শর।
আঁখিয়ার ভেতর পাখিয়ার বাসা,
জলকে তিরশূল ক'রছে চাষা।
শোন কন্যে কথার বিবরণ
বেড়ালকে ই'দুর মেলে কী কারণ।
হয়ত খাড়ু ঝন্‌ঝন্‌,
নইলে মাছি ভন্‌ভন্‌।'

মূর্খ ছোকরার কথা শুনে সখীরা চুপচাপ। আর রাজকন্যার মুখেও রা' নেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে রাজকন্যা একবার দম্‌ ফেললে। তারপর ছোকরাকে ব'ললে, 'আমি কথাগুলোর মানে বুঝতে পারনু না। তুমি আমাকে বুঝিয়ে বল।' মূর্খ ছোকরা ব'ললে, 'তাহ'লে হার স্বীকার ক'রলে তো?' রাজকন্যা মাথা নীচু ক'রে ব'ললে, 'হুঁ'।

মূর্খ ছোকরা এবার ব'ললে, 'রাজকন্যা, তোমার পণের কথা তোমার স্মরণ আছে তো?'

রাজকন্যা শুধু ব'ললে' 'হুঁ'।

তারপর মূর্খ ছোকরা যা' যা' দেখেছিল তা' সবই একে একে রাজকন্যা আর তার সখীদের শোনালে।

সব শুনে রাজকন্যা মূর্খ ছোকরার কথার মানে বুঝতে পারলে।

কথায় হেরে যেয়ে রাজকন্যা মূর্খ ছোকরার কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রলে। সে ব'ললে, 'রাজকন্যা, তোমার বাপের বাড়িতে যত রাজকুমার হেরে যেয়ে গোলামী ক'রছে তাদের সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। তবেই তোমাকে আমি বিয়ে ক'রতে পারি।'

সে-কথায় সম্মত হ'য়ে রাজকন্যা পরের দিন সকালেই সব রাজকুমারকে মুক্ত ক'রে দিলে।

বাজনা-বাদ্যি, জাঁকজমক ক'রে রাজকন্যার সঙ্গে মূর্খ ছোকরার বিয়ে হ'য়ে গেল।

বিয়ের পর তাকে আর দেশে ফিরে যেতে হ'ল না। জামাইকে রাজা ঘরজামাই ক'রে রেখে দিলে। মূর্খ ছোকরা শ্বশুরবাড়িতে আরামে বাস ক'রতে লাগল।

মনের গুণে ধন

কোনো গাঁয়ে এক বামুন বাস ক'রত। তার বৌ দেখতে খুবই সুন্দরী। তাদের কোনো ছেলেপুলে ছিল না। সংসারের অবস্থা এককালে বেশ ভালই ছিল। কিন্তু বামুন ভয়ানক কুঁড়ে। তাই কিছুদিনের মধ্যে সে খুবই গরীব হ'য়ে গেল। সংসারে থাকার মধ্যে রইল একটা এঁড়ে গরু। সুন্দরী বৌ আর এঁড়ে গরু নিয়েই বামুনের সংসার।

সুন্দরী বৌ ছেড়ে বামুন কোথাও যেতে চায় না। দুখ্-ধান্ধা ক'রে বামনী অল্প যা কিছু যোগাড়-সোগাড় ক'রে আনে তা' দিয়েই কোনোরকমে ওদের একবেলা আধ পেটা ক'রে দিন চলে।

বামুন পুজো-আজাও করে না। খাটেও না। শুধু ব'সে ব'সে খায় আর ঘুমোয়। এমনি ক'রে সংসার যখন প্রায় অচল হ'য়ে এল তখন বামনী আর সহ্য ক'রতে না পেরে স্বামীর সঙ্গে লাগল ঝগড়া। বৌ-এর গঞ্জনা অসহ্য হল। বামুন একদিন বৌকে ব'ললে, 'তোমার টিকি-জ্বালানো কথা আর সহ্য হ'চ্ছে না।'

বামনী রেগে ব'ললে, 'কে তোমাকে সহ্য করতে ব'লছে ? যাও না, কোথায় যমের বাড়ি যাবে।'

বামুন ব'ললে, 'যমের বাড়ি যাবো না। যাবো খাটতে।' একটু হেসে বামনী ব'ললে, 'তুমি যাবে খাটতে !'

বামুন ব'ললে, 'হ্যাঁ খাটতেই আমি যাবো। তুমি আমার জল খাবারটা মাঠে পাঠিয়ে দিও। আমি যেমন পারি পরের ক্ষেতে কাজ ক'রবো।'

অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে পরেরদিন সকালে বামুন মাঠে খাটতে গেল।

মাঠে যেয়ে বামুন কোনোদিন খাটে, আবার কোনোদিন বসে থাকে। জল খাবার পেঁছে গেলেই সেগুলো খেয়ে শেষ ক'রে বাড়ি ফিরে আসে তারপর বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে।

তাছাড়া সে জাতে বামুন বলে চাষীরা তা'কে কাজেও নিতে চায় না।

কিছুদিন এমনি ক'রে চ'লল। কিন্তু উপায়-সুপায় কিছু না হওয়ায় বামনী আবার গঞ্জনা দিতে আরম্ভ ক'রলে। বৌ-এর কথার জ্বালায় বামুন একদিন বৌকে কাছে ডেকে ব'ললে, 'আমি পরের বাড়িতে কাজ ক'রতে পারবো না। তাই ভাবছি, একটা বুড়ুল নিয়ে বনে কাঠ কাঠতে যাবো। তুমি কিছু খাবার গামছায় বেঁধে দাও। দেখি, কাঠ কেটে কিছু রোজগার-পত্তর হয় কিনা।'

বামনীর সংগে গাঁয়ের অন্য এক ছোকরার গোপন ভাব। তাই বামুন বনের কাঠ কাঠতে যেতে চাইলে বৌ খুশি হয়ে স্বামীকে ব'ললে, 'খুব ভাল হয়। বনের কাঠ কেটে তা' বিক্রি ক'রতে পারলে আমাদের আর অভাব থাকবে না। তোমার খাবার আমি বেশ ভাল ক'রে গামছায় বেঁধে দিচ্ছি।' এই ব'লে এক ধামা মুড়কিতে বেশ ক'রে বিষ মাখালে। তারপর সেই বিষমাখা মুড়কি একটা গামছায় বেঁধে স্বামীর হাতে দিলে। ব'ললে, 'পেট ভরে খেও। না খেয়ে যেন কাজ ক'রো না।'

বামুন কোনো কথা না ব'লে মুড়কির পুঁটুলি আর কুড়ুলটা কাঁধে নিয়ে বেড়িয়ে প'ড়ল বনে কাঠ কাটতে।

বামুন ঘর থেকে যেতেই বামনী মনে মনে ভাবলে, মিন্‌সেকে আর ঘরে ফিরতে হয় না। মুড়কি খাবে আর পটল তুলবে। যাক্, বাঁচা গেল ! আমার যা' মন যাবে আমি এ-বাড়িতে তাই ক'রবো।'

ওদিকে বামুন মুড়কির পুঁটুলি আর কুড়ুল নিয়ে বহু গাঁ-গেরাম, পথ-ঘাট পেরিয়ে এক গভীরবনে এসে হাজির হ'ল।

বনে অনেক গাছপালা। কিন্তু কাঠ কাটার অভ্যেস তো বামুনের নেই ; তাই মুড়কির পুঁটুলি আর কুড়ুল মাটিতে রেখে একটা গাছের তলায় ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যে হ'য়ে এল। শুরু হ'ল বাঘ-ভালুক আর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ডাকাডাকি। বামুনের খুব ভয় হ'ল। এই অন্ধকারে সে কোথায় বা যাবে ! আশপাশে সড়্‌সড়্ খড়্‌খড়্ শব্দ হ'চ্ছে।

পাশেই একটা খুব বড় গাছ ছিল। ভয়ে ভয়ে বামুন কুড়ুলটা কাঁধে নিয়ে ছুটে যেয়ে উঠে প'ড়ল সেই বড় গাছটার ওপর।

রাত বাড়তে লাগল। বামুনের খুব খিদে পেয়ে গেল। কিন্তু মুড়কির পুঁটুলি নীচে মাটিতে ফেলে এসেছে। গাছ থেকে সে ভয়ে নামতে পারলে না। ভাবলে, সকাল হ'লেই গাছ থেকে নেমে মুড়কি খাওয়া যাবে।

কাপড়ের একটা খুঁট দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে আচ্ছা ক'রে বামুন নিজেকে বেঁধে রাখলে। গাছের ওপর তার ঘুম হ'ল না। জেগে রইল।

রাতে চাঁদের আলো। অনেক রাতে বামুন লক্ষ্য ক'রলে, চোদ্দ জন ষণ্ডামতো লোক বনের ভেতর এসে সেই গাছটার তলায় ব'সল। তাদের খালি গা। তারা কথাবার্তা কইতে লাগল।

লোকগুলোর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলে, তারা ডাকাত। কিছুক্ষণ পরে ডাকাতেরা ডাকাতির সোনাদানা, মালকড়ি গাছের তলায় ব'সে ভাগাভাগি ক'রতে লাগল।

একসময় একজন ডাকাতের নজর প'ড়ল মুড়কির পুঁটুলিতে। কাছে এনে সেটা খুলতেই ডাকাতেরা দেখলে, মুড়কি। মালকড়ি ভাগ করা বন্ধ রেখে চোদ্দ জনে সব মুড়কি খেয়ে ফেললে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা লুটিয়ে প'ড়ল। চোদ্দ জন ডাকাতই ম'রে প'ড়ে রইল গাছতলায়। বামুন সবই দেখলে।

মানুষের গন্ধ পেয়ে অল্পক্ষণ পরে গাছতলায় একটা মস্ত বড় বাঘ হাউ হাউ ক'রতে ক'রতে এসে হাজির হ'ল। বাঘ দেখে বামুন ভয়ে গাছের ওপর থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। কাঁপুনির চোটে বামুনের কাঁধ থেকে কুড়ুলটা নীচে প'ড়ে গেল। প'ড়ল তো একেবারে ঘপাৎ ক'রে বাঘের মাথায়। কুড়ুলের ঘা খেয়ে বাঘটা ছটফট ক'রে ম'রে প'ড়ে রইল গাছতলায়।

সকাল হ'ল। বামুন গাছ থেকে নেমে ডাকাতদের সোনাদানা, টাকাকড়ি, গয়না-গাঁটি গামছায় বেঁধে ফেললে। তারপর সেগুলো মাথায় নিয়ে সোজা বাড়ির পথ ধ'রলে।

এদিকে সেই রাতেই বামনীর ভাবের ছোকরা অন্ধকারে বামুনের গোয়ালঘরের ভেতর দিয়ে বামনীর কাছে আসছিল। গোয়ালে খুঁটোয় বাঁধা ছিল সেই এঁড়ে গরুটা। অন্ধকারে এঁড়েটা ভয় খেয়ে দিলে ছোকরার পেটে শিং ঢুকিয়ে। অমনি তার নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে প'ড়ল।

গোয়াল ঘরের মধ্যে 'বাবাগো, মাগো' শব্দ শুনে বামনী ছুটে এল। দেখলে, তার ভাবের ছোকরাকে এঁড়ে গরুতে গুঁতিয়ে শেষ করে দিয়েছে।

একটু বেলা হ'তেই সোনাদানার পুঁটুলি মাথায় নিয়ে বামুন বাড়ি ঢুকল। বাড়িতে পা দিয়ে বৌকে ডাক দিলে, 'কইগো, শুনছো। কোথায় গেলে?'

বামুনের গলার স্বর শুনে বামনী তো অবাক। ভাবলে, বিষ মাখানো মুড়কি খেয়ে মিন্‌সে তাহ'লে মরেনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে বামনী স্বামীকে ব'ললে, 'ফিরে এলে! তোমার কাঠ কই?' 'কাঠ নেই। ধর এটা।'—এই ব'লে বামুন পুঁটুলিটা বৌ-এর হাতে দিলে।

পুঁটুলি খুলে বামনী অবাক হ'য়ে স্বামীকে ব'ললে, 'এসব কীগো? চুরি ক'রে আনলে নাকি?'

বামুন ব'ললে, 'না না, চুরি ক'রতে যাবো কেন? ভগবান দিয়েছে।'

বামনী ব'ললে, 'মরণ নেই ভগবানের! কী ক'রে এসব পেলে, তাই বল।'

বামুন হাতেমুখে জল দিলে। তারপর ব'সে ব'সে বনের সব ঘটনা বৌকে শোনালে। সব শুনে বামনী ব'সে চুপচাপ ভাবতে লাগল।

বৌ-এর মুখপানে চেয়ে বামুন ব'ললে, 'কী ভাবছো গো?'
বামনী ব'ললে, 'কী আর ভাববো!'

বামুন বৌ-এর হাতটা ধ'রলে। ব'ললে, 'কী ভাবছো তা আমাকে ব'লতেই হবে।'
বামনী তখন ছড়া কেটে ব'ললে,

মন যার ভাল হয় বনে পায় সোনা।
মুড়কি খেয়ে ম'রে গেল চোর চোদ্দজনা॥
কুড়ুলের ঘা-এ ম'ল বনের শের।
এঁড়ে গরুতে গুঁতিয়ে মেলে, কপালেরই ফের॥

বামুন ছড়ার সবটুকু বুঝতে পারলে না। বামনী ত'াকে বুঝতেও দিলে না। ব'ললে, 'তোমার খিদে পেয়েছে। খাবে চল।'

বামনী স্বামীকে খুব যত্ন ক'রে খেতে দিলে। তারপর সেই সোনাদানা, মাল-কড়ি বেশ গোছগাছ ক'রে ঘরের মধ্যে রেখে দিলে।

ষোল আনা চুরি

কোনো দেশে এক রাজা ছিল। রাজা অত্যন্ত ধার্মিক, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। প্রজাদের সুখ-দুঃখের সব খবরাখবরই সে রাখত। প্রজারা কিভাবে দিনযাপন ক'রছে তা' জানবার জন্যে ছদ্মবেশে রাজা নিজে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাঝে-মধ্যে যেত।

একদিন সন্ধ্যের একটু পরে অন্ধকারে ছদ্মবেশে রাজা একটা গলির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কয়েকজনের কথাবার্তার শব্দ তার কানে পেঁছিল। সে থমকে দাঁড়াল। দেখলে, একটা ঘরের দাওয়ায় মিটমিট ক'রে একটা কেরাসিনের আলো জ্বলছে। একজন বুড়ো লোক তার ছেলেদের সঙ্গে কথা কইছে। রাজা আত্মগোপন ক'রে তাদের কথা শুনতে লাগল।

কথা কইতে কইতে একসময় বুড়ো তার ছেলেদের ব'ললে, 'আমি তো তোমাদের সবাইকেই সোনা-রুপোর কাজ শিখিয়েছি। আর তোমরাও এখন সেকরার কাজ ক'রছো। কিন্তু সেকরাদের সোনারুপো কিছু চুরি না ক'রলে ব্যবসা চলে না। তা', তোমরা কে কতখানি খদ্দেরের সোনা চুরি ক'রতে পার আমাকে ব'লতে হবে।'

বড়ছেলে বাবাকে ব'ললে, 'খদ্দেরকে ঠকাতে আমার মোটেই দেরি লাগে না। একভরি সোনার গয়না তৈরী ক'রতে দিলে আমি তার সিকি ভরি সোনা চুরি ক'রতে পারি।'

বুড়ো সেকরা এবার মেজছেলের দিকে তাকালে। সে ব'ললে, 'চার আনা সোনায় আমার পোষায় না। আমি ভরিতে অর্ধেক নিয়ে নিতে পারি। তার বেশী চুরি ক'রতে গেলে খদ্দেরের কাছে ধরা প'ড়ে যেতে হবে।'

বুড়ো এবার সেজছেলেকে ব'ললে, 'তুমি কতটা সোনা সরাতে পার, বাবা?'

সেজছেলে হেসে ব'ললে, 'আমি ভরিতে অন্ততঃ বার আনা মাল চুরি ক'রে নিতে পারি। খদ্দেরের বাবার ক্ষমতা নেই আমার চুরি ধরে।'

এবার ছোটছেলের পালা। সবাই তার দিকে তাকাতেই সে হেসে উঠল। হাসছে দেখে সেজছেলে তার বাবাকে ব'ললে, 'ছোটর বয়স কম। ও' আর কী চুরি শিখেছে, বাবা? ও' তো মাত্র এই ক'বছর কাজ ক'রছে।'

বুড়ো সেকরার ছোটছেলে এবার মুখ খুললে। ব'ললে, 'আমি খদ্দেরের সোনার ভরিকে ভরি চুরি করতে পারি। তা আমি ক'রেওছি।'

ছোটছেলের কথা শুনে সবাই অবাক হ'ল। সে আবার ব'ললে, 'বিশ্বাস না হয়, আমার কাছে একটা মোটা খদ্দের পাঠিয়ে দেখতে পার।'

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজা এতক্ষণ এদের আলাপ শুনছিল। সেও বুড়োর

ছোটছেলের কথা শুনে অবাক হ'য়ে গেল। আর কোথাও না যেয়ে রাজা ভাবতে ভাবতে ওখান থেকেই সোজা রাজবাড়িতে ফিরে এল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজা পেয়াদাকে ডেকে পাঠালে। পেয়াদা কাছে আসতেই রাজা তাকে ব'ললে, 'এখুনি তুমি অমুক গাঁয়ে যাও। সেই গাঁয়ের একটা গলির ধারেই এক বুড়ো সেকরার বাড়ি। তার চার ছেলে। বুড়ো আর তার ছোটছেলেকে সঙ্গে ক'রে রাজবাড়িতে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

রাজাকে সেলাম ঠুকে পেয়াদা হুকুম তামিল ক'রতে চ'লে গেল। দুপুর বেলায় পেয়াদা তাদের নিয়ে হাজির হ'ল।

রাজার সামনে বুড়ো সেকরা হাত জোড় ক'রে ব'ললে, 'হুজুর, কিজন্যে আমাকে আর আমার ছোটছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন? আমরা কি কোন অপরাধ ক'রেছি?'

রাজা হেসে ব'ললে, 'না না, অপরাধ ক'রতে যাবে কেন? আমার প্রয়োজনে আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি। তোমাদের কোনো ভয় নেই। রাজবাড়িতে এসেছো, দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা এখানেই সারো। তারপর কথা কইবো।' এই ব'লে রাজা তার লোককে বুড়ো সেকরা আর তার ছোটছেলের জন্যে আহারের ব্যবস্থা ক'রে দিতে ব'ললে।

বিকালে রাজার সামনে বুড়ো ও তার ছেলে এল। রাজা ব'ললে, 'আমাকে একটি সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা তৈরী ক'রে দিতে হবে। সোনার যা' প্রয়োজন হবে আমি দোব। আমি ঐ মূর্তিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রবো।'

বুড়ো ব'ললে, 'তা' পারবো না কেন হুজুর? নিশ্চয়ই পারবো।'

রাজা বুড়ো সেকরাকে ব'ললে, 'সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমাটি তোমার ছোটছেলেকেই তৈরী ক'রে দিতে হবে। প্রতিমা খারাপ হ'লে শাস্তি, আর ভাল হ'লে যথোচিত পুরস্কার পাবে।'

সেকরার ছোটছেলে রাজাকে ব'ললে, 'আমি লক্ষ্মীপ্রতিমা তৈরী ক'রতে পারবো, হুজুর।'

রাজা ব'ললে, 'তবে একটি সর্ত তোমায় মানতে হবে। প্রতিদিন বাড়ি থেকে এসে রাজবাড়ির সামনে ঐ পুকুরে চান ক'রবে। তারপর আমার দেওয়া নতুন কাপড় প'রে রাজবাড়ির মধ্যে একটি আলাদা ঘরে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে পিদিমে এক পিদিম তেল দিয়ে জেবলে মূর্তি তৈরীর কাজ ক'রবে। পিদিমের তেল ফুরিয়ে এলেই সেদিনকার মতো তুমি ঘর বন্ধ ক'রে আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে। তারপর নিজের বাড়ি চ'লে যাবে। এমনিভাবে এক মাসের মধ্যে তোমাকে সোনার লক্ষ্মী-প্রতিমা গ'ড়ে দিতে হবে।'

ঐ সর্তেই সেকরার ছোটছেলে রাজি হ'ল। রাজা ব'ললে, 'আজ তাহ'লে বাড়ি যাও। আগামী কাল থেকেই তোমার কাজ তুমি আরম্ভ ক'রবে।'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।'—ব'লে রাজাকে নমস্কার জানিয়ে বুড়ো আর তার ছোটছেলে রাজবাড়ি থেকে চ'লে গেল। পথে যেতে যেতে বুড়ো সেকরা তার ছেলেকে ব'ললে, 'কিরে, পারবি তো সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা গ'ড়ে দিতে ?'

ছোটছেলে ব'ললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আর এমন কী কাজ ?'

বুড়ো বললে, 'তুই যে কাল রাতে আমাকে ব'লছিলি, ভরিকে ভরি চুরি ক'রতে পারিস ? কিন্তু রাজা যেভাবে তোকে প্রতিমা গ'ড়তে ব'ললে তা'তে তুই তো এক তিলও চুরি ক'রতে পারবি না।' ছোটছেলে হেসে ব'ললে, 'সে এখন দেখা যাবে। কাল থেকে কাজটা তো শুরু করি।'

পরের দিন সকালে সেকরার ছোটছেলে রাজবাড়িতে এল। এসে রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে রাজবাড়ির সামনের পুকুরে চান ক'রলে। তারপর নতুন কাপড় প'রে ঢুকল সেই ঘরে। জানালা দরজা বন্ধ ক'রে পিদিম জেবলে লক্ষ্মীপ্রতিমা গড়ার কাজে লেগে গেল।

সারাদিন কাজ ক'রে চ'লল। পিদিমের তেল ফুরিয়ে যেতেই সে কাজ বন্ধ ক'রে বাড়ি চ'লে গেল। বাড়িতে যেয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে প'ড়ল। বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে গেল, সে তখন বিছানা ছেড়ে উঠে একটি আলাদা ঘরে গেল। রাজ-বাড়িতে যেমন পিদিম ছিল ঠিক সেই রকম একটা পিদিম জেবলে পেতলের লক্ষ্মী-প্রতিমা গ'ড়তে লাগল। রাজবাড়িতে ঠিক যতখানি গ'ড়েছে এবং যেভাবে গ'ড়েছে এটিও ঠিক সেই পর্যন্ত সেইরকম ক'রে গ'ড়ে রেখে দিলে।

এইভাবে প্রতিদিন সকালে উঠে রাজবাড়িতে যেয়ে চান ক'রে নতুন কাপড় প'রে পিদিম জেবলে মূর্তি গড়ে। আবার সন্ধ্যেয় ফিরে গভীর রাতে উঠে পেতল নিয়ে বাড়িতেও ঐ একই রকম মূর্তি তৈরী করে। কিন্তু এরকমটা যে হ'চ্ছে, তা' সেকরার বাড়ির অন্য কেউ টের পায়নি।

একমাস কেটে গেল। একদিন সকালে রাজা সেকরা-ছেলেকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'কিহে, মূর্তি তৈরীর তোমার আর কত দেরী ?' সেকরা-ছেলে ব'ললে, 'আজকেই গড়া শেষ হ'য়ে যাবে, হুজুর। আপনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করুন।'

রাজা ব'ললে, 'তাহ'লে আগামীকালই দুপুরের ঠিক আগে মন্দিরে লক্ষ্মী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ক'রবো। কী বল ?'

সে ব'ললে, 'বেশ হুজুর, তাহ'লে আমি কাল সকালেই আসবো তো ?'

রাজা ব'ললে, 'নিশ্চয়ই আসবে। তোমার বাবাকেও সঙ্গে নিয়ে এস। প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেলে তোমরা এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রবে। বিকালে তোমার মজুরি আমি দোব। সেই সঙ্গে বকশিশও পাবে।'

সেকরা-ছেলে সন্ধ্যের আগেই মূর্তি তৈরী শেষ ক'রে ফিরে এল বাড়িতে। বাড়ি এসে বাবাকে পরের দিন সকালে রাজার কাছে যাওয়ার কথা ব'লে রাখলে।

রাতে আহারের পর বিছানায় যেয়ে শুয়ে প'ড়ল। গভীর রাতে উঠে পেতলের লক্ষ্মীমূর্তি শেষ ক'রে ফেললে। মেজেঘ'ষে এমন চক্‌চকে ক'রে রাখলে যে, সোনার মূর্তির সঙ্গে তার পার্থক্য রইল না। পরের দিন সকালে উঠে সেই পেতলের লক্ষ্মী-মূর্তিটা বগলে এমনভাবে নিলে যেন কেউ টের না পায়। রাজ-বাড়িতে যেয়ে রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে চান ক'রতে পুকুরে গেল। রাজা পুকুর ধারে গেল। আরও অনেকে সেখানে গেল। চান করবার সময় সেকরা-ছেলে ঘাটের একপাশে জলের ভেতর পেতলের মূর্তিটা ডুবিয়ে রাখলে। কেউ দেখতে পেলে না। চান করা হ'লে নতুন কাপড় প'রে রাজার অনুমতি নিয়ে সেই ঘর থেকে সোনার মূর্তিটা এনে পুকুরের জলে ভাল ক'রে ধুতে গেল।

জলে মূর্তিটা ধুতে যেয়ে ইচ্ছে ক'রে ঘাটের পাশে জলে ফেলে দিলে। কিন্তু রাজা ও অন্য সকলে দেখে ভাবলে, সেকরা-ছেলের হাত থেকে সোনার মূর্তি বুঝি হাত ফস্‌কে জলে প'ড়ে গেল। সবার সঙ্গে রাজাও ব'লে উঠল, 'আহা, মূর্তিটা জলে প'ড়ে গেল যে!'

সেকরা-ছেলে একটু হেসে ব'ললে, 'তা পড়ুক, হুজুর। এখানে বেশী জল নেই।' এই ব'লে জলের মধ্যে হাতড়ে পেতলের মূর্তিটা তুলে ফেললে আর সোনার মূর্তিটা রয়েই গেল জলের মধ্যে।

মূর্তি পাওয়া গেছে দেখে সকলেই খুশি। তারপর ঢাক, ঢোল, শাঁখ, ঘন্টা বাজিয়ে পুজো-অর্চনা ক'রে সেই লক্ষ্মীপ্রতিমাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। প্রতিমা দেখে সবাই খুব প্রশংসা ক'রতে লাগল। বিরাট উৎসব হ'ল। বহু লোকজন রাজবাড়িতে এসে খেয়ে গেল। রাজা অনেক দানধ্যানও ক'রলে।

সন্ধ্যে হয় হয়। এমন সময় রাজা রাজবাড়িতে বুড়ো সেকরা ও তার ছেলেকে ডেকে পাঠালে। দু' বাপবেটায় রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা তাদের ব'সতে ব'ললে। বুড়ো সেকরা একটি কথাও ব'ললে না। সেকরা-ছেলে ব'ললে, 'হুজুর, মূর্তি দেখে খুশি হ'য়েছেন তো?' রাজা হেসে ব'ললে, 'নিশ্চয়ই। চমৎকার মূর্তি গ'ড়েছ তুমি।' সেকরা-ছেলে ব'ললে, 'এবার তাহ'লে আমাকে আমার মজুরি দিন। রাজা ব'ললে, 'মজুরি অবশ্যই তোমাকে দোব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞেসা ক'রবো। তুমি সত্যি ব'লবে?'

সে ব'ললে, 'কী কথা হুজুর? নিশ্চয়ই সত্যি বলবো।'

রাজা ব'ললে, 'একদিন রাতে তোমাদের বাড়ির পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনেছিনু। তুমি তোমার বাবাকে ব'লছিলে, ভরিকে ভরি চুরি ক'রে তুমি খদ্দের ঠকাতে পার। কিন্তু কই, আমার প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-প্রতিমা গ'ড়তে যেয়ে তুমি তো আমাকে এক তিলও ঠকাতে পারলে না?'

সেকরা-ছেলে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হাতজোড় ক'রে ব'ললে, 'হুজুর, ভয়ে ব'লবো, না নির্ভয়ে ব'লবো?'

রাজা ব'ললে, 'নির্ভয়ে বল।'

সেকরা-ছেলে ভয়ে ভয়েই ব'ললে, 'হুজুর, শাস্তি-টাস্তি দেবেন নাতো ?'

রাজা মন্দিরের দিকে মুখ ক'রে ব'ললে, 'ঐ সামনে মন্দির আছে। আমি ব'লছি, তোমায় শাস্তি দোব না। তুমি ভয় খেও না। বল।'

সেকরা-ছেলে মূর্তি তৈরীর সব ঘটনা ব'ললে। রাজা চুপচাপ ব'সে সব শুনে অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'আসল সোনার মূর্তি তবে কোথায় ?' 'চলুন।'—ব'লে সেকরা-ছেলে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুরঘাটে গেল। তারপর জল থেকে সোনার লক্ষ্মীপ্রতিমা তুলে রাজার হাতে দিলে। রাজাও অবাক, আর বুড়ো সেকরাও অবাক। রাজা সোনার মূর্তি নিয়ে শুদ্ধাচারে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রলে। শেষে সেকরা-ছেলের কাছে এসে ব'ললে, 'হ্যাঁ, তুমি যে তোমার বাবাকে মিথ্যে বলনি তার প্রমাণ তুমি আমার কাছে দিলে।' তারপর রাজা তা'কে প্রচুর টাকাকড়ি দিয়ে ব'ললে, 'আমার একটি আদেশ রইল তোমার ওপর।'

সে ব'ললে, 'কী আদেশ, হুজুর ?'

রাজা ব'ললে, 'তুমি আমার রাজ্যে আর কোনো দিন সোনারুপোর কাজ ক'রতে পারবে না।'

সে ব'ললে, 'তাহ'লে কিভাবে আমার পেট চ'লবে, আমার ছেলেমেয়েরাই বা কী খাবে, হুজুর ?'

রাজা ব'ললে, 'তোমাকে আমি পাঁচখানা গ্রাম দান ক'রছি। তুমি ও তোমার ছেলেমেয়েদের তা' থেকেই চ'লে যাবে। আজ তুমি বাড়ি যাও।'

রাজার কাছে বিদেয় নিয়ে খুশি মনে সেকরা-ছেলে তার বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হ'য়ে সুখে শান্তিতে বাস ক'রতে লাগল।

সাত পেয়াদা

কোনো গাঁয়ে এক বুড়ী ছিল। তার ছেলে-পিলে, আত্মীয়-স্বজন ব'লতে কেউই ছিল না।

বুড়ী ভীষণ কিপটে। ধান ভেনে সেই ধানের চাল সে খেত না। খুদ খেয়েই দিন কাটিয়ে দিত। আর চাল জমা ক'রে রেখে দিত।

একদিন রাতে চোর এসে তার সব চাল চুরি ক'রে নিয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে বুড়ী যখন দেখলে চোরে তার সব চাল নিয়ে চ'লে গেছে তখন সে হায়

হায় ক'রতে লাগল। তারপর খুব গালাগালি আরম্ভ ক'রলে। শেষে চোরকে শায়েস্তা করবার জন্যে পেয়াদা ডাকতে ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়ল।

রাস্তায় যেতে যেতে প্রথমে গোবরের সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেল।

গোবর বুড়ীকে ব'ললে, 'এ বুড়ী, অমন গজর গজর ক'রতে ক'রতে কোথায় যাচ্ছিস ?'

বুড়ী গোবরকে ব'ললে,

'চালটি রেখে খুদটি খাই, তাও নিয়ে গেল চোরে,
এবার যাচ্ছি সাত পেয়াদার তরে।'

গোবর ব'ললে, 'বুড়ী, তুই আমাকে নিয়ে চ'। আমি এক পেয়াদার কাজ ক'রবো। এবার যদি তোর ঘরে চোর আসে তবে চোরকে আমি জব্দ ক'রে দোব।'

গোবরের কথায় বুড়ী খুশি হ'য়ে ব'ললে, 'বেশ, তাই আমি নিচ্ছি।'

বুড়ী গোবরকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিলে। তারপর রাস্তা ধ'রে চ'লতে লাগল।

কিছু দূর যাবার পর এক নাপিতের সঙ্গে বুড়ীর দেখা হ'য়ে গেল। নাপিত বুড়ীকে ব'ললে, 'বুড়ী, কোথায় যাবি ?'

বুড়ী আরম্ভ ক'রলে,

'চালটি রেখে খুদটি খাই, তাও নিয়ে গেল চোরে,
এবার যাচ্ছি সাত পেয়াদার তরে।'

নাপিত ব'ললে, 'বুড়ী, তোকে একটা জিনিস দোব।'

বুড়ী ব'ললে, 'কী জিনিস ?'

নাপিত ব'ললে, 'আমার এই খুরটা তুই সঙ্গে নিয়ে যা।'

বুড়ী ব'ললে 'কী হবে খুর নিয়ে ?'

নাপিত ব'ললে, 'তোর বাড়িতে চোর এলে খুরটা চোরকে জব্দ ক'রে দেবে। তুই রাখ খুরটাকে।'

'বেশ, খুরটা আমি নিনু।'—এই ব'লে নাপিতের কাছ থেকে বুড়ী খুরটা নিয়ে কাছে রেখে দিয়ে আবার রাস্তা চ'লতে লাগল। কিছুদূর যাবার পর এক কুমোরের বাড়ি প'ড়ল। কুমোর বুড়ীকে জিজ্ঞেসা করায় ঐ একই রকম কথা বুড়ীর কাছ থেকে কুমোর শুনলে।

কুমোর বুড়ীকে একটা ডাবা দিলে। ব'ললে, 'এই ডাবাটা নিয়ে যা বুড়ী। এটা তোর কাজে লাগবে।'

বুড়ী এবার ডাবাটা কাঁকালে ক'রে নিয়ে রাস্তা চ'লতে লাগল।

যেতে যেতে এক পুকুরে জলের মধ্যে একটা সিঙ্গি মাছকে খেলা ক'রে বেড়াতে দেখলে। সিঙ্গি মাছ বুড়ীকে ব'ললে, 'বুড়ী, কোথায় যাচ্ছিস ?'

বুড়ী আবার ব'ললে,

'চালটি রেখে খুদটি খাই, তাও নিয়ে গেল চোরে,
এবার যাচ্ছি সাত পেয়াদার তরে।'

সে কথা শুনে সিঙ্গি মাছ ব'ললে, 'বুড়ী, তুই আমাকে নে। ঐ ডাবাতে জল দিয়ে তোর বাড়ির উঠোনের একপাশে আমাকে জাইয়ে রেখে দিবি। আমি তোর কাজে লাগবো।'

বুড়ী সিঙ্গি মাছকে সঙ্গে নিয়ে নিলে।

কিছুদূর যাবার পর এক বেলগাছের সঙ্গে বুড়ীর দেখা হ'ল। বেলগাছ বুড়ীকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'বুড়ী, তোর কী হ'য়েছে?' বুড়ী একই কথা বেলগাছকেও ব'ললে।

সব শুনে বেলগাছ বুড়ীকে একটা বেল দিলে। ব'ললে, 'এই বেলটা তোর কাজে লাগবে।'

বেলটাও বুড়ী সঙ্গে নিলে।

রাস্তায় যেতে যেতে এক ব্যাঙের সঙ্গে বুড়ীর দেখা হ'ল। বুড়ীর সব কথা শুনে ব্যাঙ ব'ললে, 'বুড়ী, আমি তোর সঙ্গে যাবো। আমাকে সঙ্গে নে।'

ব্যাঙটাকে বুড়ী নিয়ে নিলে।

আরও কিছুদূর যাবার পর বুড়ী দেখলে, একটা গাছের কোটরে এক টিয়াপাখী ব'সে ব'সে বুড়ীকে লক্ষ্য ক'রেই ব'লছে, 'কোথায় যাচ্ছিস বুড়ী?'

বুড়ী টিয়াপাখীকেও ঐ একই কথা ব'ললে।

টিয়াপাখী বুড়ীকে ব'ললে, 'বুড়ী, তুই আমাকে তোর বাড়িতে নিয়ে চ। আমি তোর বাড়ি পাহারা দোব। আর তোকে কোথাও যেতে হবে না।'

টিয়াপাখীর কথা শুনে বুড়ী মনে মনে ভাবলে, টিয়াপাখী যদি বাড়ি পাহারা দেয় তবে তো আর চোরে চুরি ক'রতে পারবে না। এই ভেবে টিয়াপাখীকে বুড়ী সঙ্গে নিয়ে নিলে।

এবার বুড়ী বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। সঙ্গে রইল গোবর, খুর, ডাবা, সিঙ্গিমাছ, বেল, ব্যাঙ আর টিয়াপাখী এই সাতটি জিনিস। বাড়ি এসে বুড়ী গোবরটাকে দুয়ার গোড়ায় রেখে দিলে। উঠোনে ঘাসবনে খুরটা ফেলে রাখলে। ডাবায় জল দিয়ে সেই জলে সিঙ্গিমাছটা ছেড়ে দিলে। তারপর ডাবাটা উঠোনের এক পাশে বসিয়ে রাখলে। সন্ধ্যের পর বেলটা উনোনের আগুনে পোড়াতে দিলে। তার আগে ব্যাঙটিকে কোলঙ্গায় আর টিয়াপাখীকে একটা খাঁচায় রেখে দিলে।

রাতে বুড়ী ঘুমিয়ে গেছে। এমন সময় চোরটা আবার চুরি ক'রতে এল। ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় দুয়ার গোড়ায় গোবরটাকে চোর মাড়িয়ে ফেললে।

দু'পা এগিয়ে যেয়ে উঠোনে ঘাসে পায়ের গোবর মুছতে যেয়ে খুরে চোরের পা কেটে ফাঁক হ'য়ে গেল। কাটা জায়গাটা দিয়ে খুব রক্ত প'ড়তে লাগল। চোর

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলে, উঠোনের একপাশে ডাবায় জল আছে। রক্ত বন্ধ করবার জন্যে চোর তার কাটা পা-টাকে ডাবার জলে ডুবিয়ে ধ'রলে। অমনি সিঙ্গি মাছটা চোরের পায়ে প্যাট্ ক'রে কাঁটা ফুটিয়ে দিলে। চোর যন্ত্রনায় ছটফট ক'রতে ক'রতে উনোনের ধারে গেল। পায়ের কণ্‌কণানি কমাবার জন্যে উনোনের গুমো আগুনে পা ভ'রে দিয়ে ব'সে রইল। সেই সময় উনোনের মধ্যে সেই বেলটা দুম্ ক'রে ফুটে গেল। গরম বেলের নরম শাঁস চোরের মুখময় লেগে যেতেই সে আরও ছটফট ক'রতে লাগল।

এবার চোর পা-টাকে বাঁধবার জন্যে নেকড়া খুঁজতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে কোলঙ্গার কাছে যেয়ে কোলঙ্গা হাতড়াতে লাগল।

কোলঙ্গায় ব'সে ছিল সেই ব্যাঙ। ব্যাঙটা চোরের চোখে পেচ্ছাব ক'রে দিতেই চোরের চোখ হু হু ক'রে জ্বালা ক'রতে লাগল।

চোখের ও পায়ের জ্বালা-যন্ত্রনায় চোর উঠোনময় ছুটোছুটি ক'রতে লাগল। চ'লতেও পারলে না আর চোখে দেখতেও পেলে না।

এই সময় টিয়াপাখীটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বারবার ব'লতে লাগল,

'ও বুড়ী, ওঠ্‌না,
চোরের নাচন দেখনা।'

টিয়াপাখীর চেঁচামেচিতে বুড়ী ঘুম থেকে উঠে প'ড়ল। উঠোনে চোরের লাফালাফি দেখে বুড়ী একটা ঝ্যাটা নিয়ে চোরকে পেটাতে লাগল আর লোক জড়ো করবার জন্যে চীৎকার ক'রতে লাগল।

বুড়ীর চীৎকারে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল। তারা বুড়ীর ঘরে ছুটে এল। তারপর চোরকে ধ'রে ফেলে বেধড়ক মার লাগালে।

তারপর মারতে মারতে চোরকে রাজার কাছে চালান দিয়ে দিলে। আর বুড়ীও চোরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল।

বন্ধুর ঐকান্তি—৩০

কোনো গাঁয়ে এক নাপিত বাস ক'রত। পাশের গাঁয়েই থাকত নাপিতের এক বন্ধু। দু'জনেই ছিল অসম্ভব কুঁড়ে। তাদের মধ্যে খুবই ভাব-ভালবাসা।

নাপিত আর তার বন্ধু কারোরই কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না। দু'বন্ধু বাড়ির কাজকর্মের ধার ধারত না। ব'সে ব'সে খেত আর মজাসে গল্প-গুজব

ক'রত। এজন্যে তাদের বৌয়েরা নিজের নিজের স্বামীর সঙ্গে দিনরাত ঝগড়া ক'রত। এমন কি মাঝে-মধ্যে স্বামীকে ঝাঁটাপেটা ক'রতেও ছাড়ত না।

দু'বন্ধু এককাছে ব'সে নানারকম গল্পগুজব ক'রতে ক'রতে একদিন বন্ধুকে নাপিত ব'ললে, 'বৌয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর তো সহ্য হয় না ভাই!'

বন্ধু ব'ললে, 'কী আর করা যাবে! সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কী, বল?'

বন্ধুর মুখপানে চেয়ে নাপিত ব'ললে, 'এক কাজ ক'রলে হয়।'

বন্ধু ব'ললে, 'কী?'

নাপিত ব'ললে, 'দু'জনে বিদেশে কাজটাজ ক'রতে যাই চল। রোজগারপত্র যা' হবে তা' দিয়ে আমাদের কোনোরকমে দিন চ'লে যাবে।'

বন্ধু একটু হেসে ব'ললে, 'আমরা নিজেদের ঘরেই কাজ করি না, আর বিদেশে যেয়ে পরের ঘরে কাজ করবো। সেকি পারবো আমরা?'

নাপিত ব'ললে, 'দেখাই যাক না। না পারি, বিদেশে পথে-ঘাটে ম'রে প'ড়ে থাকবো, সেও ভাল। তবু বৌয়ের লাঞ্ছনা আর সহ্য করা যায় না।'

বন্ধু ব'ললে, 'তা' অবশ্য মন্দ বলনি। কিন্তু কী কাজ ক'রবো?'

নাপিত ব'ললে, 'বিদেশে আগে বেরিয়ে পড়ি, তারপর দেখা যাবে।'

অনেক যুক্তি-যাক্তা ক'রে একদিন ভোর ভোর নাপিত আর তার বন্ধু ঘর ছেড়ে বিদেশে বেরিয়ে পড়ল। পথে যে গাঁ পায় সেই গাঁয়ে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই সুর করে চেঁচায়, 'কাজ করাবে গো!'

এরকম ব'লতে ব'লতে এক গাঁয়ের এক গেরস্থর বাড়ির সদর দরজায় এসে হাজির হ'ল। গেরস্থ ঘর ছাওয়াবার জন্যে লোক খুঁজছিল। দরজায় এসে নাপিত আর তার বন্ধুকে ব'ললে, 'তোমরা কী কী কাজ ক'রতে পার?'

নাপিত ব'ললে, 'চাষবাসের কাজ ছাড়াও অন্যান্য যে-কাজ দেবেন আমরা সে-কাজই ক'রতে পারবো।'

গেরস্থ ব'ললে, 'তোমরা খড় দিয়ে ঘরের চাল ছাইতে পার?'

নাপিত ব'ললে, 'খুব পারি। ও ব্যাপারে আমার বন্ধুর বেশ পাকা হাত। আপনি যেমনটি ব'লবেন ও তেমনটিই ক'রে দেবে। আর আমিও অবশ্য কম যাই না।'

গেরস্থ খুশি হ'য়ে ওদের কাজ দিলে। কিন্তু কাজ দিলে কী হবে, দু'জনের কেউই তো ওকাজ কোনোদিন করেনি।

বন্ধু নাপিতকে ব'ললে, 'কেমন ক'রে ঘর ছাইতে হয় তা' তো জানিনা। এখন তাহ'লে কী হবে!'

নাপিত ব'ললে, 'কী আর হবে। চালে উঠে তো পড়। তারপর যাহোক-মাহোক ক'রে চালকে ঢেকে দোব।'

গেরস্থর বাড়িতেই জলখাবার খেয়েটেয়ে দু'বন্ধুতে ঘর ছাইতে লেগে গেল।

সারাদিন ধরে কাজ ক'রে খড় দিয়ে ঘরের চালকে কোনোরকমে ঢেকে ফেললে।

সন্ধ্যের সময় চাল থেকে নেমে গেরস্থর বাড়িতে বেশ পেট ভর্তি ক'রে খেলে। গেরস্থও ওদের খুব যত্ন ক'রলে। রাতে শোবার ব্যবস্থাও ক'রে দিলে। নানান গল্প-গুজব ক'রতে ক'রতে দু'বন্ধু ঘুমিয়ে প'ড়ল।

মাঝরাতে হঠাৎ খুব ঝড় আরম্ভ হ'য়ে গেল। তারপরেই দু'চার ফোঁটা বৃষ্টি। ঝড়ে গেরস্থর চালের খড় উড়ে কোথায় চ'লে গেল। চাল উদুম্। গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা প'ড়তেই নাপিতের ঘুম ভেঙে গেল। সে বন্ধুকে ওঠালে। বন্ধু ধড়মড় ক'রে উঠে চালবাগে চেয়ে দেখলে। তারপর নাপিতকে ব'ললে, 'সদ্য ছাওয়া চালের খড় তো উড়ে গেল! এখন তাহলে কী হবে? সকালে গেরস্থকে কী-ই বা জবাব দেবে?'

নাপিত কাপড়-চোপড় এক কাছে নিয়ে পুঁটলি বাঁধতে বাঁধতে ব'ললে, 'সকালে জবাব দেবার আগেই সরে প'ড়তে হবে। নচেৎ আমাদের পিঠের চামড়া আর থাকবে না।'

বন্ধু আর কোনো কথা ব'ললে না। গেরস্থর ঘর ছেড়ে দু'জনে সেই রাতের অন্ধকারেই আবার পথে বেরিয়ে প'ড়ল। সকাল হবার আগেই দু'চারখানা গাঁ পেরিয়ে চ'লে গেল। আবার হাঁক পাড়তে শুরু ক'রলে, 'কাজ করাবে গো!'

এক গাঁয়ের কোনো এক বামুন ওদের ডেকে বাড়িতে বসালে। ব'ললে 'আমার বাড়িতে কাজ ক'রবে তোমরা?'

নাপিত ঘাড় নেড়ে ব'ললে, 'ক'রবো। কী কাজ করতে হবে, বাবু?'

বামুন ব'ললে, 'আমার একটি ফুলগাছ আছে, তা'তে জল দিতে হবে। আর একটিমাত্র বক্না-গরু আছে, তাকে মাঠে ছেড়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া আর কিছুই করতে হবে না।'

নাপিত হেসে ব'ললে, 'এ আর এমন কী শক্ত কাজ? আমরা দু'জনে আজ থেকেই কাজ ক'রতে লাগবো।'

বামুন ব'ললে, 'বেশ, তাই করো।'

তারপর নাপিত একটা বড় কলসী নিয়ে পুকুর থেকে জল তুলে এনে ফুলগাছের গোড়ায় ঢালতে লাগল। আর নাপিতের বন্ধু বামুনের বক্নাটাকে গোয়াল থেকে খুলে নিয়ে মাঠে চরাতে চ'লে গেল। সারাদিন আর দু'বন্ধুর দেখা-সাক্ষেৎ হ'ল না।

বামুনের একটিমাত্র ফুলগাছ। কিন্তু সারাদিন ধ'রে কলসী কলসী জল ঢেলেও গাছের গোড়াটা ভালভাবে ভেজানো গেল না। যতই জল ঢালে ততই জল গাছের গোড়ায় ঢুকে যায়। মাটি আর ভালভাবে ভেজে না। সারাদিন ধ'রে জল ব'য়ে ব'য়ে নাপিতের কাঁধ ফুলে গেল। নড়া টাটিয়ে ছুরি হ'য়ে গেল।

ওদিকে বন্ধু বক্নাটা মাঠে ছেড়ে দিতেই বক্নাটা নেজ তুলে মাঠময় এমন

দৌড়াদৌড়ি শুরু ক'রলে যে, সারাদিন ছুটোছুটি, হুটোপাটি ক'রেও সে বক্‌নাকে বাগাতে পারলে না। সন্ধ্যের সময় গরু গোয়ালে এসে ঢুকল।

আলান্ত হ'য়ে দু'বন্ধু খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে নাপিতকে তার বন্ধু ব'ললে, 'তোমার কাজটা শক্ত, না বেশ সহজ ?'

নাপিত মিথ্যে ক'রে ব'ললে, 'একটি মাত্র তো ফুলগাছ। তা'তে আর কতক্ষণ জল দিতে লাগে? আমি সেকাজ অনেক আগেভাগে সেরে দিয়ে আরাম ক'রে ব'সেছিনু। তা', তোমার কাজটা কেমন ভাই ?' বন্ধু হেসে ব'ললে, 'আহা, বামুনের বক্‌নাটা কত ঠাণ্ডা ! এত ভাল আর এত ঠাণ্ডা যে, তাকে মাঠে নিয়ে যেয়ে ছেড়ে দিতেই সে মনের আনন্দে ঘাস খেতে লাগল। আর আমি গাছতলায় শুয়ে আরামে ঘুমোতে লাগনু।'

পরস্পরের কথা শুনে দু'জনেই মনে মনে কাজ পাল্টাপাল্টি করবার কথা ভাবতে লাগল।

নাপিত তার বন্ধুকে ব'ললে, 'এক কাজ করি এস ভাই। তুমি কাল ফুলগাছে জল দেবে। আর আমি মাঠে গরু নিয়ে যাবো।'

বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'ল।

পরেরদিন নাপিত গরু নিয়ে মাঠে গেল আর তার বন্ধু বড় কলসীটা নিয়ে বামুনের ফুলগাছের গোড়ায় জল ঢালতে লাগল। সেদিনও দু'জনের খুবই কষ্ট হ'ল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে শুয়ে নাপিত তার বন্ধুকে ব'ললে, 'বামুনের বক্‌নাটা যে অসম্ভব দুষ্টু সেকথা গতকাল তো আমাকে ব'ললে না ?'

বন্ধু ব'ললে, 'একটা ফুলগাছের গোড়ায় জল দিতে এত কষ্ট সেকথা তুমিও তো আমাকে বলনি, ভাই ?'

নাপিত ব'ললে, 'না। তা' অবশ্য বলিনি।'

বন্ধু ব'ললে, 'তবে আমিই বা বলতে যাবো কেন ?'

নাপিত চুপ ক'রে ভাবতে লাগল। বন্ধু তা' লক্ষ্য ক'রে নাপিতকে ব'ললে, 'কী ভাবছ ?'

নাপিত ব'ললে, 'ভাবছি, এখানে আর থাকা হবে না। থাকলে নির্ঘাত আমরা মারা প'ড়ে যাবো।'

বন্ধু ব'ললে, 'ঠিক ব'লেছ। তা হ'লে কী করতে হবে ?'

নাপিত ব'ললে, 'এখান ছেড়েও খুব ভোরে আমরা অন্য কোথাও চ'লে যাবো। তবে যাবার আগে ঐ ফুলগাছের গোড়াটা কোদাল দিয়ে খুঁড়ে দেখে যাবো।'

বন্ধু ব'ললে, 'কেন, খুঁড়ে দেখতে যাবে কেন ?'

নাপিত ব'ললে, 'গাছটার গোড়ায় অত জল ঢোকে কেন ?'

বন্ধু ব'ললে, 'তা মন্দ বলনি। গা-গতর টাটিয়ে গেল তবু গাছের গোড়া ভিজল না!'

যে যুক্তি সে-ই কাজ। বামুনের বাড়ি থেকে একটা কোদাল নিয়ে এল। তারপর দু'বন্ধুতে মিলে পালা ক'রে রাতের অন্ধকারেই ফুলগাছটার গোড়ায় মাটি খুঁড়তে লেগে গেল। খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় ভোর হ'য়ে এল। এক-বুক গর্তও হ'য়ে গেল। হঠাৎ কোদালের ঘায়ে ঠক্ ক'রে কিসের একটা শব্দ হ'ল। আরও একটু খুঁড়তেই একটা বিরাট ঘড়া বেরিয়ে প'ড়ল। ঘড়ায় একঘড়া মোহর। দেখেই দু'জনে অবাক।

আর দেরী না ক'রে মোহরভর্তি ঘড়াটা মাথায় ক'রে নিয়ে নিজেদের দেশের দিকে রওনা হ'ল।

ভারী ঘড়া মাথায় ক'রে নাপিত আলান্ত হ'লে বন্ধুকে দেয়, আর বন্ধুর বইতে কষ্ট হ'লে নাপিত নিজের মাথায় নেয়। এমনি ক'রে কিছুদূর আসার পর একটা পুকুরের পাড়ে গাছতলায় ঘড়াটা রেখে ঘাসের ওপর দু'জনেই শুয়ে প'ড়ল। বন্ধুর চোখে একটু তন্দ্রা আসতেই নাপিত ঘড়াটা মাথায় নিয়ে একাই চ'লল বাড়ির দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভেঙে যেতেই বন্ধু দেখলে, সঙ্গীও নেই, আর মোহরভর্তি ঘড়াও নেই। সে ছুটতে আরম্ভ ক'রলে। ছুটতে ছুটতে অনেক দূরে চ'লে এল। বন্ধু নাপিতকে দেখতে পেলে না। কিন্তু নাপিত দূর থেকে বন্ধুকে দেখতে পেলে। সে তাড়াতাড়ি একটা পুকুরে নেমে এক কোমর জলে যেয়ে ঘড়াটা মাথায় নিয়ে জলে ডুবে ব'সে রইল।

বন্ধুর খুব পায়খানা পেয়ে গেল। সে পায়খানা ব'সে সেই পুকুরের জলে নামতেই দেখতে পেলে, জলের মধ্যে কী যেন একটা চিকচিক ক'রছে। একপা দু'পা ক'রে এগিয়ে সেটায় হাত দিতেই নাপিত ঘড়া মাথায় উঠে দাঁড়াল। বন্ধু ব'ললে, 'ও, তুমি মোহরের ঘড়াটা চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছো?' নাপিত মিথ্যে করে ব'ললে, 'না ভাই, তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে। এদিকে একদল ডাকাত ঘড়াটা নেবার জন্যে গাছতলার দিকে আসছিল। তোমাকে ঘুম থেকে ওঠাবার সময় আর পেনু কই? তাই ওটা মাথায় নিয়ে ছুটে এসে এই পুকুরের জলে ডুবে লুকিয়ে ব'সেছিনু। তুমি এসে প'ড়েছ ভালই হ'য়েছে। চল, এবার বাড়ি যাওয়া যাক।'

বন্ধু নাপিতকে আর অবিশ্বাস ক'রলে না। এবার সে ঘড়াটা মাথায় নিলে।

দু'একদিনের মধ্যেই মোহরভর্তি ঘড়া নিয়ে নাপিত তার বাড়িতে এল। বন্ধুও সঙ্গে এল।

বন্ধু নাপিতকে ব'ললে, 'এবার মোহরগুলো ভাগাভাগি ক'রে নিই এস। আমি বাড়ি যাব।'

নাপিত ব'ললে, 'সে তো হবেই। দুএকদিন আমার বাড়িতে থেকে তারপর বাড়ি যাবে।'

নাপিতের অনুরোধে বন্ধুকে থাকতে হ'ল দু'দিন। ওদিকে নাপিত তার বৌকে সবকথা ব'ললে। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই অনেক যুক্তি ক'রলে। নাপিত বন্ধুকে কিছু জানতে দিলে না।

নাপিত বাজার থেকে দু'টো বক কিনে আনলে। বক দু'টো একই রকমের দেখতে। খাঁচায় পুরে একটা বককে অন্দরে রেখে দিলে। আর একটা বক যে-ঘরে বন্ধু ছিল সেই ঘরে রাখলে।

নাপিত গোপনে বৌকে ব'ললে, 'আমি বন্ধুকে নিয়ে বিকেলে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে বার হবো। তুমি লুচি, তরকারী ইত্যাদি তৈরী ক'রে রাখবে। বাজার থেকে ভাল ভাল ফল-মূল আনিয়ে রাখবে। আর অন্দরে যে বকটা আছে ওটা খাঁচার মধ্যে পুরে যে ঘরটায় বন্ধুকে রেখেছি ঐ ঘরটার একপাশে রেখে দেবে।'

বৌ ব্যাপারটা আঁচ ক'রে একটু হাসল। ব'ললে, 'বেশ, তাই হবে।' বিকেলে নাপিত তার বন্ধুকে নিয়ে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে চ'লে গেল। সঙ্গে বকটা নিলে। বন্ধু হেসে ব'ললে, 'বকটা সঙ্গে নিচ্ছ কেন?'

নাপিতও হেসে ব'ললে, 'ওটা আমার খুব আদরের বক। বকটা আমার খুব কথা শোনে।'

বন্ধু ব'ললে, 'বক কথা শোনে! কী রকম?'

নাপিত ব'ললে, 'চল না। তোমাকে এখুনি দেখাচ্ছি।' নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে বন্ধুর সামনে বকটাকে ব'ললে, 'এই বক, তুই বাড়িতে চ'লে যা। যেয়ে বৌকে আমাদের জন্যে লুচি, তরকারী তৈরী ক'রতে ব'লবি। আর তুই একবার বাজারে যাবি। সেখান থেকে ঠোঁটে ক'রে ফল-মূল নিয়ে আসবি। বন্ধুকে নিয়ে আমি সন্ধ্যেবেলায় খাবো।' এই ব'লে নাপিত বকটাকে ছেড়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে বক কক্ কক্ শব্দ ক'রতে ক'রতে আকাশে মিলিয়ে গেল। বন্ধু অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'ও বক কি আর ফিরবে? ও' তো কোথায় মিলিয়ে গেল।'

নাপিত ব'ললে, 'গেলেই বা। ও' ঠিক বাড়িতে যেয়ে সব ব্যবস্থা ক'রবে। বকটা আমার বৌয়ের পোষা। ঐ বকটার দৌলতেই তো বৌয়ের এদ্দিন সংসার চ'লছিল।'

বন্ধু অবাক হ'য়ে ব'ললে, 'তাই আবার হয় নাকি? বেশ, সন্ধ্যেবেলায় বুঝতেই পারবো।'

নাপিত ব'ললে, 'মিথ্যে ব'লে আমার লাভ কী? সন্ধ্যেয় দেখতে পাবে।'

সন্ধ্যের সময় বন্ধুকে নিয়ে নাপিত বাড়ি ফিরে এল। বৌয়ের কাছে গেল না। বন্ধুর সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগল।

নাপিতের বৌ আগে থেকেই অন্দরের বকটাকে খাঁচা সমেত ঐ ঘরে রেখে গেছে।

বন্ধু বকটার পানে চেয়ে ব'ললে, 'সত্যিই তো! বকটা তাহ'লে ফিরে এসেছে?'

নাপিত ও'নিয়ে কিছু কথা ব'ললে না। বন্ধুর সঙ্গে গল্প ক'রতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে নাপিতের বৌ লুচি, তরকারী ও প্রচুর ফল-মূল স্বামী আর তার বন্ধুকে খেতে দিয়ে গেল। তাই দেখে বন্ধু অবাক হ'য়ে গেল। খেতে খেতে সে নাপিতকে ব'ললে, 'আচ্ছা বক পুষেছে তোমার বৌ, সত্যিই বটে! এরকম একটা বক পেলে আর ভাবনা-চিন্তা থাকে না। ব'সে ব'সে আরামে দিন চ'লে যাবে।'

নাপিত মুখে কিছু ব'ললে না। কেবল মুচকে একটু হেসে উঠল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে রাতে শোবার সময় বন্ধু নাপিতকে ব'ললে, 'তোমাকে একটা কথা ব'লতে চাই।'

নাপিত ব'ললে, 'কী ব'লবে বল।'

বন্ধু ব'ললে, 'বকটা আমাকে দিতে হবে। এজন্যে তুমি যা চাও আমি তা দোব।'

নাপিত হেসে ব'ললে, 'ঘড়াতে যে মোহর আছে তার ভাগ যদি তুমি না নাও তবেই বকটা তোমায় দিতে পারি।'

বন্ধু ব'ললে, 'বেশ, মোহরের ভাগ আমি চাই না। আমি বকটাই নিতে চাই। ও'টা পেলেই আমার চ'লে যাবে। আর বৌকেও খুশি ক'রতে পারবো।'

নাপিত ব'ললে, 'আচ্ছা, তাই হবে।' এই ব'লে তখনকার মতো কথাবার্তা বন্ধ ক'রলে।

পরের দিন সকালে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে বন্ধু খাঁচাসমেত বকটা নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে প'ড়ল। বক নিয়ে পথে যেতে যেতে এক জায়গায় থামল। তারপর বকটাকে ব'ললে, 'বক, তুমি আমার বাড়ি যাও। সেখানে যেয়ে আমার বৌকে বলগে, আমি যাচ্ছি। আর তুমি বাজার থেকে ভাল-মন্দ অনেক কিছু এনে বৌকে দেবে। আমি বাড়ি যেয়ে সেসব খাবো।' এই ব'লে খাঁচার দুয়ারটা খুলে দিলে। খাঁচা থেকে বেরিয়ে বক উড়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

মনের আনন্দে হেলতে দুলতে নাপিতের বন্ধু নিজের বাড়িতে যেয়ে হাজির হ'ল। বাড়ি পৌঁছে দেখলে, কোথায় বক আর কোথায় ভালমন্দ খাবার। বৌ রণমূর্তি ধারণ ক'রলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হ'ল।

রেগেমেগে বন্ধু ছুটল নাপিতের বাড়ি। নাপিত তা'কে দারুণ ঠকিয়েছে। তাই নাপিতকে সে একেবারে খতম্ ক'রে দেবে। প্রায় অবেলা হ'য়ে গেছে। দূর থেকে নাপিত লক্ষ্য ক'রলে, তার বন্ধু আসছে। ভাবলে, কিছু একটা কাণ্ড ঘটাবেই সে। তাড়াতাড়ি বৌকে ডেকে যুক্তি ক'রলে, এখুনি কী করা যেতে পারে।

চট্ ক'রে ভেবে নিয়ে নাপিত তার বৌকে ব'ললে, 'বন্ধু বাড়িতে ঢুকলেই তুমি আমার সঙ্গে মিছিমিছি ঝগড়া শুরু ক'রে দেবে। তারপর আমি তোমাকে মাটিতে ফেলে একটা ছোরার উল্টো দিকটা দিয়ে তোমার গলাটা প্যাঁচাবো। আর গলায় খানিকটা আলতা লুকিয়ে ঢেলে দোব। তুমি একটু ছটফট করবে তারপর মরার মতো প'ড়ে থাকবে। যখন তোমার গায়ে জলের ছিটে প'ড়বে তুমি তখন উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়বে।' যুক্তি শেষ হ'তে না হ'তেই বন্ধু চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢুকে প'ড়ল। ঢুকেই দেখলে নাপিতের বৌ স্বামীর সঙ্গে খুব ঝগড়া লেগেছে। তারপর বৌকে সে ছোরা দিয়ে কেটে ফেললে। রক্তে মাটি লালে লাল হ'য়ে গেল। তাই দেখে বন্ধু নাপিতকে ব'ললে, 'এ তুমি ক'রলে কী! বৌকে নিজের হাতে মেরে ফেললে!'

নাপিত ব'ললে, 'দিনরাত আর কত ঝগড়া করি! কিছুক্ষণ ম'রে প'ড়ে থাক। তারপর বাঁচাবো।'

বন্ধু ব'ললে, 'সে কি! আবার বাঁচাবে!'

নাপিত ব'ললে, 'বাঁচাবো বৈকি, ও' আর এমন কী ব্যাপার! এই ছোরাটা ধুয়ে একটু জল দিলেই ও' বেঁচে উঠবে।'

বন্ধু ব'ললে, 'বল কী! ছোরা ধোয়া জল পেলেই বেঁচে যাবে?'

নাপিত ব'ললে, 'হ্যাঁ।'

বন্ধু অবাক হয়ে ব'ললে, 'বেশ, কই বাঁচাও দিকিনি।'

নাপিত সেই আলতা মাখানো ছোরাটা জলে ধুয়ে সেই জল বৌয়ের গায়ে ছিটিয়ে দিলে। বৌ লাফিয়ে উঠে বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল।

তাই দেখে বন্ধু নাপিতকে ব'ললে, 'ভাই, আমার বৌ আমাকে ভীষণ জ্বালায়। ঝগড়ার চোটে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। তুমি ঐ ছোরাটা আমাকে দাও। আমি তাহ'লে উঠতে ব'সতে বৌকে শায়েস্তা করি।'

নাপিত মনে মনে হেসে বন্ধুকে ছোরাটা দিয়ে দিলে। বন্ধু ছোরা হাতে পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল নিজের বাড়ি। আগে থেকে বৌ রেগেই ছিল। এবার ঝাঁটা নিয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে এল। স্বামী বৌকে ধ'রে মাটিতে ফেলে তার গলায় চালালে ছোরা। সঙ্গে সঙ্গে বৌ ছটফট ক'রতে ক'রতে ম'রে গেল। স্বামী মুচকে হেসে রক্তমাখা ছোরাটা জলে ধুয়ে সেই জল বৌয়ের গায়ে ছিটিয়ে দিলে। বৌ ন'ড়লও না, চ'ড়লও না। যেমন ছিল তেমনিই মরে প'ড়ে রইল। শেষে যখন বুঝতে পারলে, যত জলই দেওয়া যাক বৌ তার আর বেঁচে উঠবে না তখন হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠল। কান্নার শব্দ পেয়ে পাশের বাড়ির লোক ছুটে এল। তারা তাকে যা-তা ব'লতে লাগল। বৌয়ের মৃত্যুতে নাপিতের বন্ধু উন্মাদের মতো হ'য়ে গেল। আবাব ছুটল নাপিতকে মারতে।

বন্ধুর ছুটে আসা দেখেই নাপিত তার বৌকে ব'ললে, 'এবার কী হবে গো !'

নাপিত-বৌ ব'ললে, 'তুমি ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়। যা করবার আমি ক'রছি। শুধু যখন চোখে ইশারা ক'রবো তখন তুমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসবে।'

'বেশ, তাই হবে।'—ব'লে নাপিত ঘরের কোণে লুকিয়ে প'ড়ল। আর বৌ দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

নাপিতের বন্ধু চীৎকার ক'রতে ক'রতে ঘরে ঢুকল, 'কোথায় সে ? আমি তাকে আজ শেষ ক'রবোই ক'রবো।'

বন্ধু নাপিত-বৌয়ের পানে চাইতেই নাপিত-বৌ বাড়ির উঠোনের কোণে পাতকুয়োটা দেখিয়ে ব'ললে, 'তোমার বন্ধু ঐ পাতকুয়োর মধ্যে লুকিয়েছে। ওখানেই তাকে পাবে।'

কথাটা শুনেই বন্ধু ছুটল পাতকুয়োর কাছে। হেঁট হ'য়ে যেই সে পাতকুয়োর ভেতরটা দেখতে লেগেছে অমনি নাপিতবৌ স্বামীকে ইশারা ক'রলে। তারপর দু'জনে ছুটে এসে পেছন থেকে তাকে ঠেলে দিলে পাতকুয়োর ভেতর।

পাতকুয়োর মুখটায় এক ঝাড় শেয়াকুল কাঁটা দিয়ে তার ওপর পাথরের বড় একটা চ্যাং চাপা দিয়ে দিলে। বন্ধুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নাপিত বৌকে নিয়ে সুখে সংসার ক'রতে লাগল।

বোন বসমাতা

কোনো গাঁয়ে এক বাড়িতে সাত ভাই ছিল। তাদের একটি মাত্র ছোট বোন। নাম তার বসমাতা।

সাত ভাইয়ের বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ির সাত বৌ তাদের ননদ বসমাতাকে নিয়ে বেশ আমোদ-ফূর্তিতেই থাকে।

একদিন সাত ভাই তাদের নিজের নিজের বৌকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'তোমার কিরকম শাড়ী কাপড় চাই তা বল ?'

বৌয়েরা নিজেদের পছন্দমতো শাড়ীর রঙ্ ব'লে দিলে।

এবার দাদারা বোনকে ব'ললে, 'বসমাতা, তোর জন্যে কী শাড়ী আনতে হবে ?'

বসমাতা হেসে দাদাদিকে ব'ললে, 'আমি অমূল্য পটের শাড়ী নোব। আমার জন্যে অমূল্য-পটের শাড়ী এনো।'

দাদারা ব'ললে, 'বেশ, তোর জন্যে তা-ই আনবো।'

বৌয়েরা ননদের কথা শুনতে পেয়ে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লাগল।

সাত ভাই বিদেশে চ'লে গেল।

এবার বৌয়েরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ ক'রলে। এক বৌ অন্য বৌয়েদের ব'ললে, 'আমাদের শাড়ী ঠিক ভাল হবে না।'

অন্য এক বৌ ব'ললে, 'কেন ? ভাল হবে না কেন ?'

সে ব'ললে, 'আমরা তো শাড়ীর নাম ক'রে দিতে পারনু না। আমরা শুধু কাপড়ের রঙ্ ব'লে দিনু। বসমাতা কিন্তু তার দাদাদিকে অমূল্য-পটের শাড়ী আনতে ব'ললে। তাই ব'লছিনু, ওর শাড়ীটাই ভাল হবে। ওর দাদারা কি আমাদের জন্যে তেমন ভাল শাড়ী আনবে ভাই !'

এক বৌ ব'ললে, 'বসমাতা ভাল শাড়ী প'রে আমাদের সামনে ঘুরে বেড়াবে। আমাদিকে তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে।'

অন্য বৌ ব'ললে, 'ভাল শাড়ী পরাচ্ছি ওকে ! যেভাবেই হোক ওকে আমরা জব্দ ক'রবো।'

অনেক যুক্তি-যাক্তা করে বাড়ির সাতবৌ ঠিক ক'রলে বসমাতার দাদারা যতদিন না বাড়ি ফেরে ততদিন তারা তাদের ননদকে খুব খাটাবে। খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে।

একদিন বসমাতাকে বৌদিরা ডেকে ব'ললে, 'তোমার ব'সে ব'সে খাওয়া চ'লবে না। কাজ ক'রতে হবে তোমায়।'

বৌদিদের এরকম কথা শুনে বসমাতা একটু অবাক হ'ল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললে, 'বেশ, কী কাজ ক'রতে হবে বল।' মেজবৌ বল'লে, 'তোমায় বন থেকে জ্বালন ক'রে আনতে হবে।'

সে ব'ললে, 'আচ্ছা, আমি যাবো জ্বালন ক'রতে।'

সেজবৌ ব'ললে, 'বনে যে কাঠ-কুটো পাবে তা তোমাকে বিনা লতায় বেঁধে আনতে হবে। কোনো লতা বা ছোট্ দিয়ে বেঁধে আন্‌লে চলবে না।'

'আচ্ছা'—ব'লে বসমাতা বৌদিদের কাছ থেকে সরে গেল। বৌয়েরা চোখ টেপা-টিপি ক'রে হাসতে লাগল।

পরের দিন সকালেই বসমাতা বনে জ্বালন কুড়োতে চ'লে গেল।

বনে একটি একটি করে কাঠ-কুটো কুড়িয়ে-কাড়িয়ে এককাছে গাদা ক'রলে। এবার সে ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল, বিনা লতায় এত কাঠ এককাছে বাঁধবে কেমন ক'রে। ভাবতে ভাবতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'য়ে এল।

বসমাতা কাঠ-কুটো সামনে-রেখে, গালে হাত দিয়ে ভাবতেই লাগল। এমন সময় বনের ভেতর থেকে একটা বিরাট ঢেমনা সাপ বেরিয়ে এসে বসমাতার সামনে থামল। বসমাতা সাপ দেখে ভয় খেয়ে গেল। ঢেমনা সাপ বসমাতাকে ব'ললে, 'আমাকে দেখে ভয় খেও না। তুমি ব'সে ব'সে অত কী ভাবছো?'

বসমাতা ব'ললে, 'বিনা লতায় আমি কিভাবে কাঠকুটোর বোঝা বাঁধবো তাই ভাবছি।'

ঢেমনা সাপ ব'ললে, 'তোমায় ভাবতে হবে না। আমাকে নিয়ে তুমি তোমার কাঠের বোঝা বেঁধে বাড়ি নিয়ে চল।' বসমাতা তাই ক'রলে।

ঢেমনা সাপ দিয়ে কাঠের বোঝা বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এসে উঠোনে ফেললে। তখন প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। বৌদিরা ননদের কাণ্ড দেখে অবাক হ'য়ে গেল। কিন্তু মুখে কিছু ব'ললে না।

গোপনে বৌয়েরা যুক্তি ক'রতে লাগল।

মেজবৌ ব'ললে, 'বসমাতাকে তো জব্দ করা গেল না!'

সেজবৌ ব'ললে, 'দিদি, এবার এক কাজ করা যাক। একটা পলুই দিয়ে বসমাতাকে বলা যাক—এই পলুইয়ে ক'রে পুকুর থেকে জল এনে দিতে হবে।'

একজন ব'ললে, 'তা মন্দ বলনি। বেশ, তাই ওকে বল।'

বসমাতাকে কাছে ডেকে তার বৌদিরা তার হাতে একটা পলুই ধরিয়ে দিয়ে ব'ললে, 'এতে ক'রেই তোমায় পুকুর থেকে জল এনে দিতে হবে।

পলুই হাতে নিয়ে ভাবতে ভাবতে বসমাতা পুকুর-ঘাটে যেয়ে হাজির হ'ল। ঘাটে ব'সে ব'সে গালে হাত দিয়ে আবার ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একদল

ব্যাঙ্ বসমাতার কাছে এসে হাজির হ'ল। সব শুনে ব্যাঙেরা ব'ললে, 'আমরা তোমার পলুইয়ের ফাঁকে ফাঁকে ব'সে প'ড়ছি। তুমি তারপর জল নিয়ে বাড়ি চল।' তাই হ'ল। তেমনি ক'রেই বসমাতা বাড়িতে জল নিয়ে এল। বৌদিরা এবারও অবাক হ'ল।

আবার সাতবৌ এককাছে জড়ো হ'য়ে যুক্তি ক'রতে লাগল, কেমন ক'রে বসমাতাকে একেবারে মেরে শেষ ক'রে দেওয়া যায়। ফুল-বৌ বসমাতাকে ডেকে ব'ললে, 'এই বসমাতা, ঢেঁকিতে ধান ভাণতে হবে। আমরা ঢেঁকি পাড় দোব আর তুমি সেঁকে দেবে।'

বসমাতা মাথা নেড়ে ব'ললে, 'আচ্ছা।'

ধান ভাণা আরম্ভ হ'ল। বৌয়েরা পাড় দেয় আর বসমাতা গড়ে ধান ঠেলে ঠেলে সেঁকে দেয়। এমনি ক'রতে ক'রতে বসমাতার ডান হাতে ঢেঁকি প'ড়ে গেল। সে যন্ত্রনায় ছটফট ক'রতে লাগল। বৌয়েরা কিন্তু তাকে ছাড়লে না। ব'ললে, 'ডান হাতে ঢেঁকি প'ড়েছে তো কী হ'য়েছে? বাঁ-হাত দিয়ে সেঁকে দিতে হবে।'

বসমাতা তা-ই ক'রতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বৌয়েরা বসমাতার বাঁ-হাতেও ঢেঁকি ফেলে দিলে। তাতেও তা'রা বসমাতাকে ছাড়লে না। ব'ললে, 'তোমাকে আমরা ছাড়ছি না। দু'টো হাত গেছে তো কী হ'য়েছে? দু'টো পা তো আছে? ঐ দু'পায়েই সেকে' দিতে হবে। বৌদিদের চাপে পড়ে বসমাতা কাঁদতে কাঁদতে দু'পায়ে ধান ঠেলে ঠেলে ঢেঁকির গড়ে দিতে লাগল।

বৌয়েরা এবার ঢেঁকি ফেলে বসমাতার পা দু'টোও কেটে দিলে।

হাত পা কাটা যাবার পর বসমাতা যন্ত্রনায় লাফালাফি আর চীৎকার করতে লাগল।

সাতবৌ দেখলে, এভাবে তাদের ননদকে বাঁচিয়ে রাখা চ'লবে না। তাই দু'তিন জন মিলে বসমাতার মাথাটা ঢেঁকির গড়ে দিয়ে দু'চার ঘা পাড় দিতেই মাথাটা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। বসমাতাও মরে গেল।

মরা ননদকে চেঙ্-দোলা ক'রে তুলে নিয়ে উঠোনের একপাশে ছাঁচতলায় মাটিতে গর্ত কেটে পুঁতে দিলে।

যেখানে বসমাতাকে ছাঁচতলায় পোঁতা হ'য়েছিল কিছুদিন পরে সেখানে একটা লাউগাছ হ'ল। ঝাঁকড়ো-মুকড়ো লাউগাছ বাড়ির চাল ছেয়ে ফেললে।

একদিন পাড়ার একটি মেয়ে ঐ বাড়িতে লাউশাক চাইতে এল। বৌয়েরা তাকে ব'ললে, 'যত পারো লাউশাক কেটে নিয়ে যাও।'

মেয়েটি হাতে একটি কাস্তে নিয়ে লাউগাছের কাছে হাজির হ'তেই লাউগাছ থেকে শব্দ হ'তে লাগল,

'কেটোনা কেটোনা মাসি এ লাউয়ের পাতা।
অমূল্য পটের তরে ম'রেছে বসমাতা।'

এরকম শব্দ শুনে মেয়েটি লাউগাছকে আর ছুঁলে না। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে

সাত বৌকে লাউগাছের কথাটা শুনিয়ে দিলে। তারপর নিজের ঘরে চলে গেল।

বৌয়েরা বলা-কওয়া ক'রতে ক'রতে লাউগাছটার গোড়া উপুড়ে বাড়ির পাশে সারকুড়ে সারের মধ্যে পুঁতে দিলে।

কিছুদিন পরে সারকুড়ে খুব পুনকো শাক হ'লো। পাড়ার লোকের নজর প'ড়ল পুনকো শাকের ওপর।

একদিন আর একটি মেয়ে সাত বৌয়ের কাছে এসে ব'ললে, 'ও বৌ, তোরা দু'টি পুন্‌কো শাক দে'না, মা।'

বৌয়েরা ব'ললে 'সারকুড় থেকে কেটে নাওগে।'

মেয়েটি যেই শাক কাটতে সারকুড়ের ধারে গেল অমনি সারকুড়ের ভেতর থেকে শব্দ হ'ল,

'কেটোনা কেটোনা মাসি পুন্‌কোর পাতা।
অমুল্য পটের তরে ম'রেছে বসমাতা॥'

আচম্‌কা এরকম কথা শুনে মেয়েটি পুন্‌কো শাক কাটা ফেলে দৌড়ে বৌয়েদের কাছে এসে ব'ললে, 'ও বৌমা, সারকুড় থেকে ওকি শব্দ হ'চ্ছে গো! না বাছা, আমার আর শাকের দরকার নেই, আমি বাড়ি চলনু।' এই ব'লে মেয়েটি বাড়ি চ'লে গেল।

এবার সাতবৌ সন্ধ্যের পরে সব পুন্‌কো শাক উপড়ে অনেক দূরের মাঠে ফেলে দিয়ে এল।

যেখানে পুনকো শাক ফেলা হয়েছিল সেখানে কিছুদিনের মধ্যে প্রকাণ্ড এক শালগাছ হ'ল।

ওদিকে সাত ভাই বিদেশ থেকে কাপড় কিনে ফিরে আসছিল। পথে আলান্ত হ'য়ে তারা ঐ শালগাছের ছায়ায় ব'সল। তারপর রান্না চড়িয়ে দিলে। আলু-ভাতে ভাত হ'য়েও গেল। এবার ভাত খেতে হবে। তাই ছোটভাই শালপাতা পাড়বার জন্যে গাছে উঠে প'ড়ল। যেই শালপাতা ভাঙ্‌তে যাবে অমনি শালগাছটা ব'লে উঠল,

'ভেঙোনা ভেঙোনা এ শালের পাতা।
অমুল্য পটের তরে ম'রেছে বসমাতা॥'

শালগাছের কথা শুনে সাতভাই চমকে গেল। নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লাগল। তারপর একটা কুড়ুল দিয়ে শালগাছটাকে কেটে ফেললে। এমুড়ো ওমুড়ো গাছটাকে কুড়ুলের ঘায়ে ফেড়েও দিলে।

গাছটা ফারাই হ'য়ে যেতেই শালগাছের ভেতর থেকে বসমাতা হেসে বেরিয়ে এসে দাদাদের কাছে দাঁড়াল।

এক দাদা ব'ললে, 'কী ব্যাপার রে, বসমাতা ! তুই এখানে কী ক'রে এলি ?'

বসমাতা দাদাদের কাছে ব'সে ব'সে একটি একটি ক'রে সব ঘটনা ব'ললে।

দাদারা শুনে রেগে আগুন হ'য়ে গেল। তারপর বসমাতাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এল।

বাড়ি এসেই সাত ভাই মাটিতে বিরাট এক গর্ত করে সাত বৌকে সেই গর্তের মধ্যে জ্যান্ত পুঁতে ফেললে।

তারপর সাত ভাই তাদের বোন বসমাতাকে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগল।

লোভের মার

এক জমিদারের পুকুর পাড়ে বেশ সুন্দর একটা ফুল বাগান ছিল। সেই ফুল-বাগানে জমিদার একজন মালী রেখেছিল। বাগানের মধ্যে মালী তার বৌ আর একটি মাত্র ছেলে নিয়ে থাকত।

মালী বাগানের যত্ন ক'রত। ফুল তুলে কিছু ফুল জমিদার বাড়িতে দিত, বাকি বাজারে বিক্রী ক রে তার কিছু পয়সা হ'ত।

এদিকে মহাদেবের ষাঁড় স্বর্গ থেকে এসে প্রতিদিন রাতে ঐ বাগানের ফুলগাছ খেয়ে যায়। কিছু গাছ ভেঙেও দিয়ে যায়। মালী সকালে উঠে ফুল-বাগানের অবস্থা দেখে খুবই চিন্তিত হ'য়ে ওঠে। ভাবে, এরকম হ'লে কিছু দিনের মধ্যে বাগানের গাছ আর একটিও থাকবে না। কিসে এমন ক'রে বাগান নষ্ট ক'রছে?

মালী রাতে টিকেল দিতে লাগল। গভীর রাতে দেখলে, একটা মস্তবড় ষাঁড় বাগানের মধ্যে ঢুকে চড়্‌পড়্‌ ক'রে ফুলগাছ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর ভাঙ্‌ছেও অনেক গাছ। মালী বৌকে জাগালে না। একাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রলে। তারপর পা টিপে টিপে ষাঁড়ের কাছে যেয়ে ষাঁড়ের লেজটাকে ক'ষে মুটো ক'রে ধ'রলে।

লেজে হাত প'ড়তেই ষাঁড়টা প্রথমে চম্‌কে তড়াং ক'রে লাফিয়ে উঠল। তারপরেই আকাশে উড়ে প'ড়ল। শোঁ শোঁ ক'রে উড়ে উড়ে কত পাহাড়, কত সমুদ্র পেরিয়ে গেল। মালীও এমন ভাবে লেজটাকে ক'ষে ধ'রেছে যে, সেও ঝুলতে ঝুলতে উড়ে চ'লল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষাঁড় এসে পেঁাছে গেল স্বর্গে। সঙ্গে মালী। মহাদেব তাঁর ষাঁড়ের সঙ্গে মালীকে দেখে ষাঁড়কে জিজ্ঞেসা ক'রলেন, 'তুই আবার এই মানবটাকে কোথা থেকে নিয়ে এসে এই স্বর্গে হাজির ক'রলি?' ষাঁড় ব'ললে, 'আমি ওকে আনি নি। ও' নিজেই এসেছে আমার লেজ ধ'রে।'

মহাদেব একটু বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন, 'ও'সব মানব-টানবের ঝামেলা এখানে চ'লবে না। তুই কালই সন্ধ্যায় ওকে যেখান থেকে এনেছিস সেখানেই পেঁাছে দিয়ে আয়।'

মহাদেবের ষাঁড় ব'ললে, 'তাই হবে প্রভু।'

মালী সারাদিন স্বর্গে থেকে গেল। মহাদেবের কথামতো মালীকে খেতে দেওয়া হ'ল একখানা মস্তবড় পিটে। স্বর্গের পিটে দেখে মালী অবাক হ'ল। সারাদিন ধ'রে পিটেটা মালী খেতে লাগল। অমৃত দিয়ে তৈরী। সারাদিনে পিটেটার আধ খানা খেলে। তা'তেই তার পেট ভ'রে গেল। বাকি আধখানা মালী গামছায় বেঁধে ফেললে।

সন্ধ্যের একটু পরেই মালী ষাঁড়-এর লেজ ধ'রে আবার জমিদারের বাগানে এসে পেঁাছে গেল। ষাঁড়টা আজ মালীকে বাগানে নামিয়ে দিয়েই স্বর্গে ফিরে গেল।

সকালে মালীকে দেখে মালির বৌ ও ছেলে ছুটে তার কাছে এল। বৌ ব'ললে, 'হ্যাগা, তুমি কাল সারাদিন কোথায় ছিলে?' মালী হেসে ব'ললে, 'ছিনু যেখানে হোক। ঐ গামছাটায় কী বাঁধা আছে দেখ।'

বৌ ও ছেলে গামছাটা নিয়ে প্রথমে হাতে ক'রে তুললে। বৌ ব'ললে, 'এত ভারি, কী আছে এতে?'

মালী আবার হাসল। ব'ললে, 'গামছার গিটটা খোলই না? তারপর দেখতে পাবে।'

বৌ গামছার খুঁটের গিটটা খুলতেই আধখানা পিটে দেখতে পেলে। বৌ ব'ললে, 'কী এটা?'

মালী ব'ললে, 'ওটা স্বর্গের পিটে। আমি আধখানা খেয়েছি। বাকি আধখানা তোমাদের জন্যে বেঁধে এনেছি।' মালীর ছেলে হেসে হেসে বাবাকে ব'ললে, 'বাবা, আমি খাবো?' মালী ছেলেকে খেতে ব'ললে। ছেলে ও ছেলের মা দু'জনেই পিটে খেতে লাগল।

বৌ ও ছেলেকে মালী সব কথা ব'ললে।

পিটে খেতে খেতে ছেলেটা ব'ললে,

'বাবা, আধখানা পিটে এমন,
তবে একটা পিটে কেমন?'

মালী ছেলের কথায় বিশেষ কান দিলে না। মালীকে বৌ ব'ললে, 'দেখ, এবার যদি ষাঁড়টা বাগানে ফুলগাছ খেতে আসে তবে আমরা তিনজনেই ষাঁড়টার লেজ ধ'রবো। মালী ব'ললে, 'দূর খেপী, তিন জনে কি একটা লেজ ধরা যায়?' বৌ ব'ললে, 'কেন ধরা যাবে না? তুমি আগে লেজটা ধ'রবে, আমি তোমার কোমরটা

ধ'রবো আর তারপর ছেলেটা আমার কোমরটা ধ'রলেই তো হবে ?' মালী ব'ললে, 'সে এখন দেখা যাবে। ষাঁড়টা এলে তবে তো ?'

প্রতিদিন রাতে মালী লক্ষ্য রাখে, যদি ষাঁড়টা আর একবারও অন্ততঃ আসে।

দিন তিনেক পরে ষাঁড়টা আবার ফুল বাগানে এসেছে। মালী দেখতে পেয়ে বৌকে ঘুম থেকে ওঠালে। বৌ আবার ছেলেকে বিছানা থেকে তুললে। তিনজনেই দেখতে লাগল, ষাঁড়টা বাগানে মনের আনন্দে ফুলগাছ খাচ্ছে।

পা টিপে টিপে মালী তাঁর বৌ ও ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ষাঁড়ের পেছুতে যেয়ে হাজির হ'ল। তারপর মালী খপ্ ক'রে ষাঁড়ের লেজটা ধ'রলে ক'ষে। সঙ্গে সঙ্গে মালীর বৌ মালীর কোমরটা আঁকড়ে ধ'রলে আর ছেলে ধ'রলে তার মায়ের কোমর।

ষাঁড় উড়ল আকাশে। শোঁ শোঁ ক'রে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ষাঁড়ের লেজে ঝুলছে তিনজনে। ভয় আনন্দ দুই-ই হ'চ্ছে তাদের। উড়ে যেতে যেতে ছেলের বারবার মনে প'ড়ছে পিটের কথা। সে ব'লতে লাগল,

বাবা, আধখানা পিটে এমন,
তবে একটা পিটে কেমন।'

বার বার একই কথা ছেলেটার মুখ থেকে শুনতে শুনতে মালী হাত দু'টোকে দু'দিকে ছড়িয়ে ব'ললে, 'এই এমন!' সঙ্গে সঙ্গে লেজ ফস্‌কে গেল। নীচে ছিল বিশাল সমুদ্র। লেজ ছাড়া হ'য়ে মালী ও তার বৌ ছেলে তিনজনেই ঝপাং ক'রে এসে প'ড়ল সমুদ্রের অথৈ জলে। মহাদেবের ষাঁড় উড়ে চ'লে গেল স্বর্গে। আর মালী বৌ ছেলে নিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবে মরে শেষ হ'য়ে গেল।

———

চার বর এক কন্যা

কোনো দেশে এক তীরন্দাজ ছিল। সে খুব ভাল তীর ছুঁড়তে পারত। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে তার বৌকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দূর থেকে তীর ছুঁড়ত। আর সেই তীর তার বৌয়ের বেঁধা নাকের ফোঁকরের ভেতর দিয়ে শোঁ ক'রে চ'লে যেত।

একদিন তীরন্দাজ মনে মনে ভাবলে—তার মতো বীর জগতে আর আছে কিনা তা তাকে দেখতে হবে। একথা চিন্তা ক'রে একদিন সে বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে প'ড়ল। অনেক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বহুদিন পরে এক দেশে এসে হাজির হ'ল। সেই দেশের এক গ্রামে এসে সে দেখতে পেলে, একজন লোক তীর ছুঁড়ছে কিন্তু তার তীর কোথায় যেয়ে পৌঁচোচ্ছে তা' দেখা যাচ্ছে না। তাই দেখে তীরন্দাজ সেই লোকটিকে জিজ্ঞেসা ক'রলে, 'ও ভাই, তুমি তীর তো ছুঁড়ছো, কিন্তু তোমার তীর কোথায় যেয়ে প'ড়ছে?' লোকটি ব'ললে, 'আমার এক একটা তীর বারো বছরের পথ চ'লে যাচ্ছে।' একথা শুনে প্রথম ব্যক্তি মনে মনে ভাবলে, সর্বনাশ! এ-লোকটা দেখছি আমার চেয়েও বড় বীর। এই ভেবে সে তাকে ব'ললে. 'ভাই, তুমি এক বীর, আর আমিও এক বীর। কিন্তু আমাদের থেকে আর কেউ বড় বীর জগতে আছে কিনা তা' দেখতে হবে। চলো, দু' বন্ধুতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।'

প্রথম ব্যক্তির কথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়ল।

দু' বন্ধুতে বহু গ্রাম-নগর, বন-জঙ্গল, নদী-নালা পেরিয়ে অন্য এক দেশে এসে দেখতে পেলে, একটা লোক চোখে একটা লম্বা চোঙ্ লাগিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কী দেখছে। গুটিগুটি ক'রে যেয়ে দু'বন্ধু তার পাশে দাঁড়াল। তারা লোকটিকে ব'ললে, 'ও ভাই, চোখে চোঙ্ লাগিয়ে অমন ক'রে কী দেখছো?' তৃতীয় ব্যক্তি চোখ থেকে চোঙ্টা নামিয়ে তাদিকে ব'ললে, 'আমি বহু দূরের জিনিস এই চোঙের ভেতর দিয়ে দেখতে পাই। এমন কি স্বর্গে কী হ'চ্ছে তাও দেখতে আমার অসুবিধে হয় না।' একথা শুনে দু'বন্ধু অবাক হ'য়ে গেল। তারা তাকে ব'ললে, 'তুমিও দেখছি কম যাও না? আমরা ভেবেছিনু, আমাদের মতো বীর জগতে নেই। এখন বুঝতে পারছি, তুমি এক মস্ত বড় বীর। এক কাজ করি এস। তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।'

তৃতীয় ব্যক্তি ব'ললে, 'কোথায়?'

প্রথম ব্যক্তি ব'ললে, 'আমাদের চেয়ে বড় বীর আর কেউ আছে কিনা তাই দেখতে বেরিয়েছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো।'

তৃতীয় ব্যক্তি একটু চিন্তা ক'রে ব'ললে, 'বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।'

তারপর তিন বন্ধু নানা জায়গায় ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখছে, একজন লোক বিরাট লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তার এক একটা ছিয়া ষাট হাত ক'রে। তাই দেখে তিন বন্ধু থমকে দাঁড়াল। লোকটি ষাট হাত ছিয়া ফেলে ফেলে তাদের কাছে আসতেই তিন বন্ধুর একজন তা'কে ব'ললে, 'ও ভাই, তুমি তো দেখছি আমাদের চেয়েও বড় বীর। তুমি আমাদের বন্ধু হ'য়ে আমাদের সঙ্গে যাবে?'

সে ব'ললে, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছো?'

প্রথম ব্যক্তি ব'ললে, 'আমরা নানান দেশ ঘুরে ঘুরে দেখছি।'

সে ব'ললে, 'কী দেখছো?'

তারা ব'ললে, 'আমাদের চেয়ে আর কেউ বড় বীর আছে কিনা তা-ই দেখতে বেরিয়েছি।'

লোকটি ব'ললে, 'বেশ, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।'

তারপর চার বন্ধু একসঙ্গে পথ চ'লতে লাগল। কিছুদিন পরে এক দেশে এসে হাজির হ'ল। সেই দেশের রাজার একটি মাত্র মেয়ে ছিল। রাজকন্যা দিনের বেলায় ম'রে যায় আর রাতে বাঁচে। বহু কোবরেজ বোদ্যি ক'রেও কিছু হয়নি। এজন্যে রাজার মনে বড় কষ্ট। রাজার গণৎকার গুণে ব'লেছে, 'বহু দূরে একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরের জল এক রাতের মধ্যে এনে রাজকন্যাকে খাওয়াতে পারলে রাজকন্যা আর দিনের বেলায় ম'রবে না। তার রোগ সেরে যাবে।'

গণৎকারের কথা শুনে রাজা তার রাজ্যে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিতে ব'ললে। রাজার লোক চারদিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলে, 'যে এক রাতের মধ্যে বহুদূরের অমুক পুকুর থেকে জল এনে রাজকন্যাকে খাইয়ে রাজকন্যার অসুখ সারাতে পারবে সে অর্ধেক রাজত্ব পাবে আর রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।'

চার বন্ধু সেকথা শুনে রাজবাড়িতে উপস্থিত হ'য়ে রাজাকে জানালে, তারা ঐ পুকুর থেকে জল এনে রাজকন্যাকে খাওয়াবে।

রাজা খুশি হ'য়ে সম্মতি জানাতেই চার বন্ধু রাজবাড়ির পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় যেয়ে হাজির হ'ল। চার বন্ধুর মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তির ছিয়া ষাট হাত ক'রে। অপর তিন ব্যক্তি তাকেই ব'ললে, 'তুমিই একরাতের মধ্যে জল এনে দিতে পারবে। লম্বা লম্বা ছিয়া ফেলে তুমি চ'লে যাও।'

চতুর্থ ব্যক্তি রাজী হ'য়ে জল আনবার জন্যে বেরিয়ে প'ড়ল। আর অপর তিন বন্ধু অপেক্ষা ক'রতে লাগল। যাবার আগে তাকে তিন বন্ধু ব'লে দিলে, সন্ধ্যের পরে জল নিয়ে যেন রাতের মধ্যেই সে চ'লে আসে।

চতুর্থ ব্যক্তি ষাট হাত ছিয়া ফেলে সন্ধ্যের অনেক আগেই ঐ পুকুরের পাড়ে বেয়ে হাজির হ'ল। পুকুরের চার পাড়ে সুন্দর বাগান। চতুর্থ ব্যক্তি অনেক রাস্তা হেঁটে এসে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিল। তাই বাগানের একটা গাছের গোড়ায় ব'সে বিশ্রাম

ক'রতে ক'রতে ঘুমিয়ে প'ড়ল। এমন ঘুম ঘুমোল যে, অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম ভাঙল না।

এদিকে তিন বন্ধু ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। চাঁদনী রাত। তৃতীয় ব্যক্তি এবার চোখে চোঙ্ লাগিয়ে দেখলে, যে জল আনতে গেছে সে পুকুরের পাড়ে গাছতলায় ঘুমোচ্ছে। আর তার সামনে বিরাট এক অজগর ফণা তুলে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে তাকে ছোবল দেবে।

অবস্থাটা সে তার অপর দু'বন্ধুকে জানালে। সেকথা শুনেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ব'ললে, 'আমার এক একটা তীর বারো বছরের পথ যায়। আমি এখান থেকেই অজগরটাকে শেষ ক'রে দিচ্ছি।' এই ব'লে সে তীর হাঁকালে। শোঁ শোঁ ক'রে তীর যেয়ে বিঁধল অজগরের ফণায়। অজগরটা ছট্‌ফট্ ক'রতে ক'রতে চতুর্থ ব্যক্তির গায়ের ওপর প'ড়তেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়্‌মড়্ ক'রে উঠে পড়ল।

ভোর প্রায় হ'য়ে এল। চতুর্থ ব্যক্তি পুকুরের জল নিয়ে ঘাট হাত ছিয়া ফেলে রাত পোয়াবার আগেই রাজবাড়িতে ফিরে এল। রাজকন্যাকে সেই জল খাইয়ে দিলে।

পরের দিন সকালে দেখা গেল, রাজকন্যা আর মরেনি। দিনের বেলায় দিব্যি সে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লছে, হাসছে, খেলছে। তাই দেখে রাজা ও রাজবাড়ির সকলে খুব খুশি।

এবার রাজকন্যার বিয়ে হবে। রাজকন্যাকে বধূবেশে সাজানো হ'য়েছে। রাজবাড়িতে উৎসব চ'লছে। রাজা ব'ললে, 'কে পুকুরের জল এনে আমার মেয়ের অসুখ সারিয়েছে?'

চতুর্থ ব্যক্তি এগিয়ে এসে রাজাকে ব'ললে, 'আমি এনেছি, মহারাজ। আপনার কন্যাকে পাবার অধিকার আমারই।'

একথা শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি ব'ললে, 'না মহারাজ, তা হ'তে পারে না। ও' জল আনতে যেয়ে ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। ও'কে একটা অজগর সাপে খেতে যাচ্ছিল। আমি এখান থেকে এক তীরে অজগরটাকে মেরে না ফেল্‌লে ও' জল আনতে পারত না। অতএব আপনার কন্যাকে বিয়ে করবার অধিকার আমারই।'

তৃতীয় ব্যক্তি এবার রাজার সামনে এগিয়ে এল। রাজাকে ব'ললে, 'আমার সঙ্গেই আপনার কন্যার বিয়ে দিতে হবে।' রাজা ব'ললে, 'তুমি! তুমি আবার কী করেছো?'

সে ব'ললে, 'অজগরটাকে ও' মেরেছে ঠিকই। কিন্তু আমি এখান থেকে চোখে চোঙ্ লাগিয়ে অজগরটাকে না দেখলে ও'কে খেয়ে ফেলত। জল আর আনা হ'ত না।'

তিনজনের কথা শুনে রাজা চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগল।

সবার কথা শুনে রাজকন্যার খুব লজ্জা হ'ল। সে গোপনে বিষ পান ক'রে প্রাণ ত্যাগ ক'রলে।

চার বন্ধু রাজাকে অনুরোধ ক'রলে, তারা রাজকন্যার মৃতদেহ শ্মশানে সৎকার করবে। এতে রাজা কোনো রকম ওজর-আপত্তি করলে না।

রাজার অনুমতি পেয়ে চার বন্ধু রাজকন্যার মৃতদেহ কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে হাজির হ'ল এক শ্মশানে। মৃতদেহ শ্মশানে নামিয়ে চার বন্ধু যুক্তি ক'রলে, রাজ-কন্যাকে তারা বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রবে। অনেক যুক্তি-টুক্তি ক'রে শেষে ঠিক হ'ল, প্রথম ব্যক্তি রাজকন্যার মৃতদেহ পাহারা দেবে। আর বাকি তিনজন বিদেশে যাবে রাজকন্যাকে বাঁচানোর কিছু কিনারা করা যায় কিনা তারই সন্ধানে।

যুক্তিমতো প্রথম ব্যক্তি শ্মশানে রাজকন্যার মৃতদেহ আগলে ব'সে রইল। আর তিন বন্ধু বিদেশে চ'লে গেল।

বহুদূর যাবার পর চার বন্ধু কোনো গ্রামের এক বামুনের বাড়িতে সন্ধ্যের পরে হাজির হ'ল। বামুন তাদের খুব যত্ন ক'রে বাড়িতে থাকতে দিলে। রাতে অতিথিদের জন্যে রান্না করবার সময় বামুন কোনো জ্বালানি না পাওয়ায় তার ছেলেকে উনোনে পুরে দিয়ে রান্না করতে লাগল। বামুনের ছেলে দাউ দাউ ক'রে জ্বলতে লাগল। আর রান্নাও হ'তে লাগল। তাই দেখে তিন বন্ধু বামুনকে ব'ললে, 'আপনি একি করলেন! নিজের ছেলেকে উনোনে পুড়িয়ে রান্না করলেন!'

একথা শুনে বামুন হেসে হাতে একটু জল নিয়ে মন্ত্র প'ড়ে উনোনে ছিটিয়ে দিতেই বামুনের ছেলে হাসতে হাসতে উনোনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বাবার পাশে দাঁড়াল। তাই দেখে তিন বন্ধু অবাক হ'য়ে গেল।

এবার তিন বন্ধু বামুনের পায়ে ধ'রে ব'ললে, 'ঠাকুর, আপনার জল-পড়া আমাদিকে দিতে হবে।'

বামুন হেসে ব'ললে, 'কেন? জল-পড়া তোমরা কী করবে?' এবার তিন বন্ধু বামুনকে সব ঘটনা ব'ললে। সব শুনে রাজকন্যাকে বাঁচাবার জন্যে বামুন জল-পড়া দিলে। বামুনের পড়া জল নিয়ে তিন বন্ধু বামুনের ঘর ছেড়ে শ্মশানের দিকে রওনা হ'য়ে গেল।

শ্মশানে হাজির হ'য়ে তিন বন্ধু দেখলে, রাজকন্যার মৃতদেহকে আগলে তাদের বন্ধু চুপচাপ ব'সে আছে। বন্ধুদের দেখে প্রথম ব্যক্তি বন্ধুদিকে ব'ললে, 'কই, রাজকন্যাকে বাঁচাবার কোনো উপায় পেলে ভাই?'

তিন বন্ধু হেসে জবাব দিলে, 'পেয়েছি।'

প্রথম ব্যক্তি ব'ললে, 'কী পেয়েছো?'

তিন বন্ধুর মধ্যে একজন ব'ললে, 'এখনই দেখতে পাবে কী পেয়েছি।'

অল্পক্ষণ পরে তিন বন্ধুর একজন বামুনের পড়া জল কাপড়ে ঢাকা রাজকন্যার মৃতদেহের ওপর ছিটিয়ে দিলে। রাজকন্যা বেঁচে গেল। সে সোজা দাঁড়িয়ে চার বন্ধুকে ব'ললে, 'আমি কোথায়! এখানে কেন?' সেই চার বন্ধুর কাছে রাজকন্যা সব শুনলে।

এবার চার বন্ধু রাজকন্যাকে ব'ললে, 'তুমি কি আমাদের মধ্যে একজনকে বিয়ে ক'রতে চাও ?'

রাজকন্যা মাথা নেড়ে ব'ললে, 'হুঁ।'

তারা রাজকন্যাকে আবার ব'ললে, 'তুমি আমাদের চারজনের মধ্যে যে-কোনো একজনকে তোমার খুশিমতো বিয়ে করতে পার। এজন্যে আমরা আর ঝগড়া ক'রবো না।' রাজকন্যা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর যে তিন বন্ধু বিদেশ থেকে জল-পড়া এনে তাকে বাঁচালে তাদিকে ব'ললে, 'তোমরা আমাকে বাঁচাবার জন্যে অনেক কষ্ট ক'রলে। তোমরা দাদার মতো কাজ ক'রেছো। আজ থেকে তোমরা তিনজন আমার দাদা। আর তোমাদের যে-বন্ধু সব সময় আমার মৃতদেহকে পাহারা দিয়ে আমার মান-সম্মান রক্ষা ক'রেছে সে স্বামীর কাজ ক'রেছে। আমি তা'কেই স্বামীরূপে গ্রহণ করতে চাই।

রাজকন্যার কথায় চার বন্ধুর কেউ-ই আর কোনো রকম ওজর-আপত্তি ক'রলে না। তারা রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যার বাবার কাছে হাজির হ'ল। মেয়েকে দেখে রাজার খুবই আনন্দ। প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে বেশ ধুম-ধাম ক'রে রাজকন্যার বিয়ে হ'ল। তারপর চার বন্ধুই নিজের নিজের দেশে চ'লে গেল। রাজকন্যাও তার স্বামীর সঙ্গে গেল। সবাই সুখে বাস ক'রতে লাগল।